রাষ্ট্রসংঘ

রাষ্ট্রসংঘ

[The United Nations as a Political Institution]

(চতুর্থ সংস্করণ)

এইচ, জি, নিকোলাস্

(H. G. NICHOLAS)

ভাষান্তর : শেখর ঘোষ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

SEPTEMBER, 1977

Published by Shri Abani Mitra, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, Arya Mansion (Eighth floor), 6/A, Raja Subodh Mullick Square, Cal-700 013, under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi and printed by Sri Doorga Prosad Mitra, at the Elm Press, 63, Beadon Street, Cal-700006.

মুখবন্ধ

বিশ্বের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রসম্বলিত কোন সংগঠনের জন্মের দ্বিতীয় দশকে ঐ সংগঠন 'ভালো কি মন্দ' প্রশ্ন করা অবান্তর। রাষ্ট্রসংঘের 'স্বপক্ষে' বা 'বিপক্ষে' যুক্তির অবতারণা করা এগ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। এর প্রকৃতি ও কার্য্যপদ্ধতিই এপুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। বৃটিশ সংসদ বা মার্কিন কংগ্রেসের মত রাষ্ট্রসংঘও একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংগঠন। অতএব এর পদ্ধতি ও কাজের ফলাফলের ভিত্তিতেই এই সংগঠন সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হবে এবং রাষ্ট্রসংঘের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও চার্টার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ব্যতীত তা' সম্ভব নয়। এগ্রন্থের নানাস্থানে প্রশংসাসূচক বা নিন্দামূলক কিছু কিছু উক্তি থাকলেও প্রশংসা অথবা নিন্দা করা এর উদ্দেশ্য নয়। রাষ্ট্রসংঘকে বর্ণনা করাই এর লক্ষ্য।

মৌলিকতার দাবী না থাকলেও বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তর থেকে সঞ্চিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এগ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। সহজেই অনুমেয় যে, তা' সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের ভিতরের এবং বাইরের, নিউইয়র্কের অথবা অন্যস্থানের অনেকের সহযোগিতার ফলে। রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে এঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঞ্চয় আমার সামনে অকৃপণভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা অসম্ভব হলেও একথা অনস্বীকার্য্য যে, এগ্রন্থ যদি কিছুমাত্র সাফল্য অর্জন করে, তবে তা' সম্ভব হবে এঁদের ধৈর্য্য ও সহৃদয়তার কারণেই।

ফেব্রুয়ারী, 1959 খৃষ্টাব্দ। এইচ. জি. এস.

অনুবাদকের কথা

এ গ্রন্থের অনুবাদের দায়িত্ব যখন গ্রহণ করেছিলাম তখন মনে হয়েছিল ইংরেজী থেকে বাংলা করা তেমন কঠিন কাজ নয়। পরে অবশ্য বাধ্য হয়েই এ ধারণা পরিবর্তন করতে হয়েছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, অধ্যাপক নিকোলাসের বক্তব্য তাঁর মত আকর্ষণীয়ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা আমার সাধ্যাতীত। মূল লেখকের প্রকাশভঙ্গী অলঙ্কারসমৃদ্ধ এবং সেই প্রকাশভঙ্গীর ব্যঞ্জনা অনুবাদে ফুটিয়ে তোলা দুরূহ।

পরিভাষাগত অসুবিধার জন্য 'চার্টার' অনুবাদে বিস্তর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 'চার্টার' সর্বৈব আইনের বিষয় বলে অনুবাদে ভাষার চেয়ে মূল বক্তব্যের যথাযথ প্রকাশের প্রতিই অধিকতর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। উপযুক্ত প্রতিশব্দ না পেয়ে 'চার্টার' কথাটি বাংলায়ও ব্যবহার করেছি। 'চার্টার' অনুবাদে ইংরেজী বাক্যের গঠনশৈলী যথাসম্ভব অনুসৃত হয়েছে। তবুও এই 'চ্যালেঞ্জের' মোকাবিলায় ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনেই অগ্রসর হয়েছি। তুলনার সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি ধারার প্রথমে ইংরেজী ও পরে বাংলারূপ দেওয়া হলো।

কোন বাক্যের সমস্ত অংশ প্রকাশের জন্য, মূল লেখককর্তৃক ব্যবহৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজনে ও ব্যাকরণের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পছন্দমত প্রতিশব্দ পাওয়া যায়নি বলে বন্ধনীতে সংশ্লিষ্ট ইংরেজী শব্দও রেখেছি। তাছাড়াও, ব্যক্তি বা সংস্থা বা অনুরূপ কিছুর নামের ক্ষেত্রেও বাংলারূপের পাশে বন্ধনীতে সংশ্লিষ্ট ইংরেজীরূপ রাখা হয়েছে। পুস্তকের মূল ভাব প্রকাশের খাতিরে তথাকথিত 'হাল্কা' শব্দের প্রয়োগও দ্বিধাহীন চিত্তেই করেছি। আশা করি 'গুরুচণ্ডালী' দোষ পূর্বের মত এখন আর অমার্জনীয় নয়। সব মিলিয়ে মূল গ্রন্থের বক্তব্য মোটামুটিভাবে ভাষান্তরিত হয়েছে বলে বিবেচিত হলেই আমার প্রয়াস সার্থক হবে।

ডঃ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কোলকাতা), ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী (বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ব-

বিদ্যালয়), ডঃ জগদীশচন্দ্র দেবনাথ (অর্থনীতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়), অগ্রজপ্রতিম শ্রীরমেন্দ্রনাথ বসু, বন্ধুবর শ্রীদিলীপ কর এবং আমার স্ত্রী শ্রীমতি ভাস্বতী ঘোষ একাজে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের চীফ্ এক্জিকিউটিভ্ অফিসার শ্রীঅবনী মিত্র এবং অন্যান্য কর্মীদেরও তাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

শেখর ঘোষ

PLAN OF THE BOOK

Widely recognized as an outstanding book on the United Nations, the present volume by H. G. Nicholas (The United Nations as a Political Institution) attempts, within a very short compass, to present the reader with a live picture of the world body. With a fair sprinkling of thoughtful comments here and there about what the United Nations should be, the book is more concerned with describing what, in all essentials, it is. As the author mentions in the foreward of the book, he is more interested in how the United Nations works, that is, his primary concern is in the process of this Organization. But a meaningful idea of the process of the United Nations can be had only against the backdrop of ideas concerning its mission, its environment, its structural framework, its law, and finally, the orientation, attitude and patterns of response of its members.

Thus, the first chapter deals with the genesis of the United Nations as it was born out of war-time co-operation between the Allied Powers. In this chapter various stages through which efforts at building the Organization culminated at San-Francisco in 1945 are traced. It also contains an account, though brief, to show how certain International bodies, such as the International Labour Organization (ILO), predating the birth of the United Nations, were integrated with it.

The second chapter addresses itself to the task of comparing the United Nations with its predecessor.........The League. Though at San-Francisco the framers of the Charter took care not to talk the League of Nations as far as possible, for it symbolized failure and frustration, yet the answer to the question whether and how far the United Nations is an improvement upon the League unavoidably entails a comparison between the two. Thus, the Security Council is compared to the League Council, the General Assembly to its League counterpart, the Trusteeship Council

to the Mandate Commission and so on. Even if the new Organization is, in functional terms, more comprehensive than the old and is invested with wider powers, such as the principle of unanimity of the League Council (or Assembly) has been replaced by the system of majority decision, it is undeniable that the structural similarities between the two are more convincing than the dissimilarities.

Drafting and signing of the Charter on Iune 26, 1945 did not mean the beginning of the United Nations. The world body could start functioning only after various organs contemplated by the Charter were established. The third chapter makes a survey of the start of the journey of the United Nations since the days of the 'Preparatory Commission' as well as it contains an account of the role played by the United Nations during various crises, such as in Korea, the Middle-East and Congo.

The fourth chapter is concerned with the description and analysis of the composition, functions, powers and modus operandi of the Security Council which is the centrally important organ of the United Nations entrusted with the primary responsibility of maintaining international peace and security. This chapter dwells on the unfortunate gap between the promise and performance of the Security Council, and on how it was paralyzed by the Cold War rivalry and plagued by veto.

The next chapter, longest in the book, is devoted to the General Assembly. As the General Assembly is entitled to discuss anything within the Charter (and at that virtually anything under the sun), it is pertinent to discuss how this large body, where all the Members are represented and which is the meeting place of virtually all the peoples of the world, works. Hence this chapter contains a description of how the agenda is drawn, how the General Assembly is Organized into a number of committees, how debates proceed and so on. More important is the fact that the General Assembly is the most relevant forum for airing grievances of the Member-States. When we remember that the overwhelming majority of the Members

are those earstwhile colonized countries of Asia and Africa which are incredibly poor and disgruntled and that these areas are undergoing a ferment as a result of the 'revolution of rising expectatations', the ulility of the General Assembly as a political forum is self-evident. This chapter dwells on this process of political pulls and pressures and shows how the General Assembly is divided into a number of blocs, such as the Afro-Asian, the West European, the Socialist, and how they interact with each other.

Everybody, it is believed, would agree that success of the political organs of the United Nations is a very qualified success. But in the present era commendable advancement in international organization is reflected in excellent service rendered by various specialized agencies either within the framework of the United Nations or related to it. But these agencies rarely come to the lime-light. In addition to a discussion of the Economic and Social Council, the Trusteeship Council and the International Court of Justice the sixth chapter of the present volume encompasses a brief survey of the most important ones of the specialized agencies, such as the World Health Organization, Food and Agricultural Organization, the International Monetory Fund, the International Civil Aviation Organization, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization etc.

The seventh chapter is concerncd with the office of the Seretary-General and his Secretariat. Much of the success and that of the projection of the image of the United Nations depend on this vital official. Multifarious functions of organizing sessions, communication, co-ordination, reporting etc. are to be performed by the Secretary-General. It is the Secretariat that is entrusted with the duty to implement United Nations decisions or communicate them to Members. When the Security Council is deadloked and the General Assembly takes the initiative, the Secretary-General has to come to the forefront and assume responsibility on behalf of the world community, as Dag Hammarskjoeld did during the Suez and the Congo crises. This chapter deals with all this and related controversies.

As nationalism is still a dominant force and the United Nations is based on the principle of 'sovreign equality' of its Members, what goes on in the United Nations substantially depends on the decisions arrived at and commitments made in various state capitals. Thus, attitudes and responses of the Members to the world body are not only vital for it, but an understanding of them is instrumental to the understanding of the process of the United Nations itself. Thus the last chapter of this present volume says a few words about the expectations and reactions of a few states vis-a-vis the United Nations. And primarily for the reason of space discussion of the same is confined to the U. S. A,, the U. S. S. R., Britain and the Afro-Asian bloc.

সূচীপত্র

রাষ্ট্রসংঘ

প্রথম অধ্যায়

গোড়ার কথা

রাষ্ট্রসংঘের উৎস সন্ধান করতে গেলে অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। বাস্তবপক্ষে, আচায়েন লীগ (Achaean League) থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি সংস্থার মাধ্যমে এমন একটি সংগঠন সৃষ্টি করার প্রয়াস হয়েছে যার দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায় এবং সমদৃষ্টিভঙ্গী আনা যায়। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী থেকেই রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা আসে। যেমনটি হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে, তেমন রাষ্ট্রসংঘের ক্ষেত্রেও যুদ্ধই আর একটি শান্তিসংস্থা স্থাপনের প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। নিন্দুকের কাছে এই সাদৃশ্য উপহাসের সামগ্রী হলেও এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই যে, যুদ্ধের বীভৎসতার বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের "আর যুদ্ধ নয়" সোচ্চার ধ্বনিকে একটা শান্তি-সংস্থা উপস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তব রূপদেয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে। মানুষের যা কিছু প্রিয়, তার ধারক হিসাবে এতদিন ছিল সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু একটা বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের করাল রূপের মাঝেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, মানুষের প্রিয়তম বস্তুগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার ভার সার্বভৌম রাষ্ট্র আর একা বইতে পারবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল সার্বভৌম রাষ্ট্রকে দেবত্বের স্তরে উন্নীত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে, তাই স্বাভাবিক কারণেই বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির মোর্চার মাঝেই রাষ্ট্রসংঘের সূত্রপাত হয়। 1941 খৃষ্টাব্দের জুন মাসের 12 তারিখে 'লণ্ডন ঘোষণার' (London Declaration) মাধ্যমে হিট্‌লারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলি পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির সাথে একযোগে কাজ করে "আক্রমণমুক্ত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা সমন্বিত" এক বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। 1942 খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী অক্ষশক্তি বিরোধী জোটের (তখন) 26টি রাষ্ট্র ওয়াশিংটন শহরে রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে পূর্বোক্ত ঘোষণার বিষয়-বস্তুকে আরও জোরদার করে। আসলে এটাই ছিল 1941 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের 14 তারিখের 'আটলাণ্টিক

চার্টারের' (Atlantic Charter) দ্বিতীয় পর্য্যায়। আটলাণ্টিক চার্টারে মোটামুটিভাবে এমন এক শান্তি স্থাপনের আশা পোষণ করা হয়, যার ফলে 'প্রত্যেক জাতি তার নিজের সীমানার মধ্যে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারবে', যার ফলে সম্ভব হবে 'ভয় থেকে মুক্তি', 'অভাব থেকে মুক্তি,' যার ফলে সম্ভব হবে আক্রমণকারীর নিরস্ত্রীকরণ এবং সর্বোপরি আরও ব্যাপক এবং স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে 'ওয়াশিংটন ঘোষণার' (Washington Declaration) প্রধান উদ্দেশ্য শান্তি ছিল না, ছিল যুদ্ধ। এতে ছিল মিত্রশক্তির মধ্যে সার্বিক বোঝাপড়ার কথা, ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে যৌথভাবে মরণপণ সংগ্রাম করার কথা এবং জার্মাণীর সঙ্গে আলাদাভাবে শান্তিচুক্তি না করার কথা। "ইউনাইটেড নেশানস" কথাটি বেরিয়েছিল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মুখ থেকে এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যের উপর জোর দেওয়াই এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য একটা স্থায়ী সংগঠনের নামকরণ হিসাবে "ইউনাইটেড নেশনস" কথাটির বিরুদ্ধে তর্কবিদরা আপত্তি তুলতে পারেন, কারণ ঐক্যের মধ্যেই এর সূত্রপাত আবার ঐক্যকেই এর ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণিত করা হয়েছে। অন্যকথায়, চার্টারের (Charter) মুখবন্ধে যখন বলা হয়েছে যে "ঐক্যবদ্ধ দেশগুলি তাদের শক্তিকে ঐক্যের মধ্যদিয়ে সংহত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ....," তখন হয় পুনরুক্তির নয় অন্তর্নিহিতদ্বন্দ্বের প্রশ্ন আসে, অবশ্য একথাও বলা যেতে পারে যে, মানুষের অনেক প্রচেষ্টার মধ্যেই এ ধরনের দ্বন্দ্ব থাকে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খানিকটা ধ্যান-ধারণা গোড়া থেকেই না থাকলে কোন প্রচেষ্টাই আরম্ভ করা যায় না, আবার খানিকটা অগ্রগতি না হলে প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা অনেক সময়ই স্পষ্ট হয় না।

অবশ্য 1942 খৃষ্টাব্দের মধ্যেই শান্তির জন্য এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্যের পথ অনেকটা প্রসারিত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন জোট ছাড়াও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব ছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে যে মিত্রশক্তির নেতৃবর্গ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকেই তাহলে আরও শক্তিশালী করে তুললেন না কেন? কর্ডেল হাল (Cordell Hull) তাঁর 'স্মৃতিকথায়' (Memoir) বলেছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে পুনরুজ্জীবিত করার চেয়ে বরং একটা নূতন আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলাকেই অধিকতর বিবেচনাসঙ্গত মনে হয়েছিল। চার্চিলের কোন স্পষ্টোক্তি এ ব্যাপারে না থাকলেও যতদূর জানা যায় তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চেয়েও অধিকতর আঞ্চলিক (Regional) ভিত্তি সম্পন্ন একটি সংগঠনের

পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে 1942 খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিফলতার প্রতিমূর্তি হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল; রাশো-ফিনিশীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সোভিয়েৎ রাশিয়াকে দোষারোপ করায় সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ক্ষুন্ন হয়েছিল। ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিত্তি আরও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি, মার্কিন নেতৃবৃন্দের ধারণা হয়েছিল যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মার্কিন সভ্যপদ সম্পর্কিত পুরোনো এবং তিক্ত প্রশ্ন না তুলে বরং নতুন একটা সংগঠনের অনুকূলে আমেরিকার জনমত গড়ে তোলা অনেক সহজ এবং যুক্তিযুক্ত হবে।

সব মিলিয়ে একটা নতুন সংস্থার অনুকূলে ঐক্যমত গড়ে উঠলো এবং এও ঠিক হলো যে অক্ষশক্তি বিরোধী জোটের ভিত্তির উপরই প্রস্তাবিত সংস্থা গড়ে উঠবে। এই যৌথ প্রচেষ্টার পরবর্ত্তী ধাপ হলো 1943 খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের 30 তারিখের সাধারণ নিরাপত্তা সম্পর্কিত মস্কো ঘোষণা (Moscow Declaration of the Four Nations on General Security), এতে অংশ গ্রহণকারী দেশ চতুষ্টয় (বৃটেন, চীন, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া) ঘোষণা করলো যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা একমত এবং এই সংস্থা সমস্ত শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সাম্যের ভিত্তিতেই হবে। এতে আরও বলা হলো যে ছোট বড় প্রত্যেকটি শান্তিপ্রিয় দেশ এই সংস্থার সভ্য হতে পারবে। এর পরেই তেহেরান ঘোষণায় (পয়লা ডিসেম্বর, 1943) রুজভেল্ট, স্টালিন ও চার্চিল পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাপ্রেমী, স্বৈরাচার-দাসত্ব-উৎপীড়ন-অসহনশীলতার মূলোৎপাটনে আত্মনিয়োজিত দেশগুলিকে উদাত্তস্বরে আহ্বান জানালেন সহযোগিতার জন্য, আহ্বান জানালেন সেই সমস্ত দেশকে যেগুলি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসম্বলিত এক বিশ্বব্যাপী পরিবারের মধ্যে থেকে একযোগে কাজ করবে।

ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত বিশ্ব-সংস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা নিয়ে ওয়াশিংটন ও লণ্ডনে (এবং সম্ভবতঃ মস্কোতেও) তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের মতিগতি খুববেশী জানা যায় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের সময় বৃটিশরা তাঁদের ভূমিকা যেমন লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তেমনটি রাষ্ট্রসংঘ গঠনের ক্ষেত্রে হয়নি। অথচ মার্কিন সরকার স্বীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে সবকিছু খোলাখুলিভাবেই করেছে। অবশ্য তার কারণও ছিল। মার্কিন কংগ্রেসের সহযোগিতা পেতে গেলে অথবা

রিপাবলিকান দলের বিরোধিতা এড়াতে গেলে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় মার্কিন সরকারের ছিল না। ফলে একদিকে আমেরিকার পররাষ্ট্র বিভাগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সর্বদা যোগাযোগ রাখতে হয়েছে এবং অন্যদিকে সরকারকে রিপাবলিকান দলের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী গর্ভণর ডিইউর (Dewey) বৈদেশিক নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা জন ফোষ্টার ডালেসের (John Foster Dulles) সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে হয়েছে। যেহেতু বিশ্বের অনেক দেশের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরে কোন বিশ্ব-সংস্থা আমেরিকাকে বাদ দিয়ে গঠন করা সম্ভব নয়, সেইহেতু কংগ্রেস এবং রিপাবলিকান দলের সহযোগিতার ব্যাপারে মার্কিন সরকারের এই প্রচেষ্টার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছিল। এর উপর নির্ভর করছিল অক্ষশক্তি বিরোধী জোটের আরও বোঝাপড়া, নির্ভর করছিল প্রস্তাবিত বিশ্বসংস্থার ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি। 1944 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রস্তাবিত সংস্থার ব্যাপারে মতামত এবং পরিকল্পনার খসড়া বিনিময়ের সময় হয়েছে বলে মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর বৃটিশ ও সোভিয়েৎ সরকারের কাছে প্রস্তাব করে। এইভাবে আগামী দিনের বিশ্বসংস্থা সম্পর্কিত মূল প্রশ্নসমূহের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছনোর জন্য ওয়াশিংটনে বৃহৎশক্তিবর্গের এক ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন চলতে থাকে। গ্রীষ্মকালে ওয়াশিংটনের ঈষদুষ্ণ আবহাওয়া আর ইংলণ্ডের 'কাণ্ট্রি হাউসের' (English Country House) পরিসর আর শ্যামলিমার পটভূমিকায় 21শে আগষ্ট ডাম্বারটন ওক্সে (Dumberton Oaks) বৈঠক শুরু হয়। আলোচনা হয় দুই পর্য্যায়ে। প্রথম পর্য্যায়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের মধ্যে 21শে আগষ্ট থেকে 28শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে 29শে সেপ্টেম্বর থেকে 7-ই অক্টোবর পর্য্যন্ত রাশিয়ার পরিবর্তে চীন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। দূর-প্রাচ্যের যুদ্ধে রাশিয়ার নিরপেক্ষ ভূমিকার জন্যই এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আলোচনার এই ধরণ থেকেই স্পষ্ট হয়েছিল আর একটা ব্যাপার, সেটা হলো বৃহৎশক্তিবর্গের সদস্য হিসাবে চীনের ত্রিশঙ্কু অবস্থা। ডাম্বারটন ওক্সের বৈঠক গোপনে হয়েছিল এবং এতে বৃটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যাডোগান (Sir Alexander Cadogan), আমেরিকার প্রতিনিধিত্বে ছিলেন মিঃ ষ্টেটিনিয়াস্ (Mr. Stettinius), রাশিয়ার পক্ষে ছিলেন ওয়াশিংটনে রাশিয়ার দূত মিঃ গ্রোমিকো (Mr. Gromyko) এবং চীনের প্রতিনিধি ছিলেন ডঃ ওয়েলিংটন কু (Dr. Wellington Koo)।

যথেষ্ট পরিমাণে হৃদ্যতা ও সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক হয় এবং প্রস্তাবিত সংস্থার মূল কাঠামো নিয়ে মতৈক্য প্রায় সাথে সাথেই হয়ে যায়। মতৈক্য হয় একটা সাধারণ সভা (Assembly) সম্পর্কে (যেখানে সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ থাকবেন) এবং একটা পরিষদ (Council) সম্পর্কে। উক্ত পরিষদে থাকবে বৃহৎশক্তিবর্গ যাদের উপর ন্যস্ত থাকবে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব। যদিও ডাম্বারটন ওক্সের আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু প্রকাশ করা হয়নি (বিশেষ করে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে), তবুও উক্ত বৈঠকে অংশগ্রহণকারী শক্তিসমূহ তাদের নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার নানা প্রশ্ন নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে এবং যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তি-তর্কের অবতারণা হয়। 1944 খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের 9 তারিখের ইস্তাহারে 'একটা ব্যাপক আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা' সম্পর্কে মতৈক্যের কথাই কেবল প্রকাশ করা হয় তা নয়, বরং প্রস্তাবিত সংস্থা সম্পর্কে মূলনীতি এবং বেশ কিছু খুঁটিনাটির ব্যাপারেও মতৈক্যের কথা বলা হয়। আজকের "রাষ্ট্রসংঘ" (U. N.) বলতে যা বোঝায়, তার রূপরেখা তখনই জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছিল। অবশ্য অছি ব্যবস্থার অন্তর্গত এলাকার প্রশ্নে এবং উপনিবেশের প্রশ্নে আলোচনা তখন খুব একটা অগ্রসর হতে পারেনি। তার কারণ হিসাবে ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের স্পর্শকাতরতা এবং জাপানী উপনিবেশ-সমূহের ভবিষৎ উত্তরাধিকার হিসাবে আমেরিকার স্বার্থের প্রশ্ন। এছাড়াও মতানৈক্যের কারণে কিছু কিছু ব্যাপারে নীরবতাই শ্রেয়: মনে হয়েছিল। মতানৈক্য ছিল নিরাপত্তা পরিষদে (Security Council) ভোট দেওয়ার রীতির প্রশ্নে (রাশিয়া বৃহৎশক্তির ভেটো দেওয়ার ব্যাপারে বিধি নিষেধমুক্ত ক্ষমতার পক্ষপাতী ছিল) ; মতানৈক্য ছিল সদস্যপদের প্রশ্নে। পূর্বেই ঠিক হয়েছিল যে প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রই প্রস্তাবিত সংস্থার সদস্য হতে পারবে। প্রশ্ন উঠলো 'শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র' (Peace loving state) বলতে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের ষোলটি প্রজাতন্ত্রকেও (Republics) বোঝায় কিনা (সোভিয়েৎ ইউনিয়ন এই প্রজাতন্ত্রগুলিকে আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে দাবী করেছিল) এবং শান্তিপ্রিয় (Peace loving) বলতে শুধু 1942 খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারীর ইউ. এন. ঘোষণায় (U. N. Declaration) স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকেই বোঝায় কিনা। এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা যাতে সর্বোচ্চ পর্য্যায়ে হতে পারে সে জন্য সেগুলিকে বৃহৎ শক্তিত্রয়ের আসন্ন বৈঠকের জন্য রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

অতএব ডাম্বরটন ওক্সের আলোচনায় যে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হয়নি সে সমস্ত প্রশ্নের জন্য ইয়াল্টায় বৈঠকের (Yalta Conference) ঠাসা কার্য্যসূচীর মধ্যেও স্থান সংকুলান করা ব্যতিরেকে উপায় ছিল না। ইয়াল্টা বৈঠকে স্থিরীকৃত অন্যান্য বস্তুর মত রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কিত নানা সিদ্ধান্তের মধ্যেও পাওয়া যায় অবহেলা ও ভাবালুতার ছাপ। এই বৈঠকে অংশ গ্রহণকারীরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে এমন সমস্ত সূত্র মতৈক্যের খাতিরে আমদানী করেছিলেন যার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘের সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব বলে মনে হয়নি। নিরাপত্তা পরিষদে ভোট দেওয়ার রীতি সম্পর্কে আমেরিকা ও বৃটেনের প্রস্তাবে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন রাজী হয়। উক্ত প্রস্তাব অনুসারে স্থির হয় যে "প্রণালীগত প্রশ্ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে" (Decisions on procedural matters) ভেটো দেওয়া চলবে না; নিরাপত্তা পরিষদে কোন বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে কোন সদস্যরাষ্ট্র ভোট দিতে পারবেনা যদি সেই সদস্যরাষ্ট্র উক্ত বিবাদে পক্ষ হিসাবে জড়িত থাকে। অবশ্য যদি কোন বিবাদের ব্যাপারে সামরিক শক্তি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তবে নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক স্থায়ী সদস্যের সম্মতিক্রমেই তা হতে পারবে। এমনকি নিরাপত্তা পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্যের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্তেও উক্ত সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হবে। রাষ্ট্রসংঘে সদস্যপদের প্রশ্নে ঠিক হয় যে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে 1945 খৃষ্টাব্দের পয়লা মার্চের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণাকারী প্রত্যেকটি রাষ্ট্র সদস্য হতে পারবে। স্টালিন সোভিয়েৎ ইউনিয়নের ষোলটি প্রজাতন্ত্রকেই সদস্যপদ দেওয়ার দাবীকে কমিয়ে শুধু ইউক্রাইন ও বাইলোরাশিয়াকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য করার দাবী জানান। চার্চিল স্টালিনের এই দাবীকে সমর্থন করেন কারণ ভারতের সদস্যপদ প্রাপ্তি (কমনওয়েল্থের কাঠামোর মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বেই) তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। রুজভেল্ট বলেন যে, রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠাকল্পে আসন্ন সম্মেলনেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে। তবে তিনি কথা দেন যে উক্ত সম্মেলনে আমেরিকা স্টালিনের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে। আরও ঠিক হয় যে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তা দেশগুলির মধ্যে বৃহৎশক্তিত্রয় (আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেন) ছাড়াও ফ্রান্স এবং চীন থাকবে এবং 1945 খৃষ্টাব্দের 25শে এপ্রিল থেকে আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো (Sanfrancisco) শহরে উক্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে আনুষ্ঠানিক সম্মেলন শুরু হবে।

রাষ্ট্রসংঘের মূল কাঠামো পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠায় আগেই কিছু কিছু বিশেষ ধরণের এবং আপেক্ষিকভাবে ছোট ছোট আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। বিশেষ ধরণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এগুলির দরকার হয়ে পড়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ 1943 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সম্মিলিত জাতিসমূহের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের' (The United Nations Relief and Rehabilitation Administration) কথা বলা যেতে পারে। এই দপ্তরের দরকার হয়ে পড়েছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণরত অক্ষশক্তির সেনাবাহিনীসমূহের বিধ্বংসী কার্য্যকলাপের ফলে। তাছাড়াও, এই বিশেষ ধরণের সংস্থাগুলির উৎপত্তির মূলে ছিল "অরাজনৈতিক এবং কার্য্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা" (Functional International Organisation) গঠনের পক্ষপাতী কিছু উদ্যোগী পুরুষের (বৃটেন ও আমেরিকার) প্রচেষ্টা। "অরাজনৈতিক এবং কার্য্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থার" স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে এঁরা "আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের" (I. L. O.) কথা তুলেছিলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও এই সংগঠনের অস্তিত্ব ও কার্য্যকারিতা প্রশংসমানভাবেই বজায় ছিল। "অরাজনৈতিক এবং কার্য্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থার" অনুকূলে দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের স্ফূরণ তেমন সমস্ত সংগঠনের মধ্যেই সম্ভব যে সংগঠনগুলি রাজনৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধে থেকে মানুষের বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন মিটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এঁদের মতে, আন্তর্জাতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এ ধরনের একাধিক সংগঠন স্থাপন করা উচিত। যার ফলে দেখা যাবে যে, আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে জন-জীবনের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই সংগঠনগুলির মাধ্যমে এবং এই সংগঠনগুলিই ধাপে ধাপে সার্বভৌম রাষ্ট্র নামক বিধ্বংসী রাজনৈতিক দানবকে তার আচ্ছন্নতার সুযোগে বেঁধে ফেলে (যেমন লিলিপুটের লোকেরা গালিভারকে বেঁধেছিল) বিশ্বের কল্যাণ সাধন করবে। অরাজনৈতিক ও কার্য্যভিত্তিক সংগঠনের পক্ষপাতী খুব আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে খুব বেশী লোক না থাকলেও বিভিন্ন প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন খুব কম ছিল না। এর জন্যই সম্ভব হয়েছিল 1943 খৃষ্টাব্দের মে ও জুন মাসে ভার্জিনিয়ার 'হট্ স্প্রিংসে' অনুষ্ঠিত 'অক্ষশক্তি বিরোধী রাষ্ট্রসমূহের' (United Nations) সম্মেলনের ভিত্তিতে "খাদ্য ও কৃষি সংস্থার"

(FAO) উদ্ভব। এর পরই 1944 খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে নিউ হ্যাম্প্‌শায়ারের ব্রেটন উড্‌সে (Bretton Woods, New Hampeshire) অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে উক্ত দেশগুলির মধ্যে বৈঠক হয়। এই বৈঠকের ফল স্বরূপ উৎপত্তি হয় দুটি আন্তর্জাতিক ঋণদান সংস্থার। তার একটি হলো "আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক" (International Bank for Reconstruction and Development), এবং আর একটি হলো "আন্তর্জাতিক অর্থকোষ" (International Monetary Fund)। মোটামুটি একইভাবে 1944 খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত অসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফলস্বরূপ "আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার" (International Civil Aviation Organization) জন্ম হয়। অবশ্য এই সংস্থার পূর্ণাঙ্গ গঠন হয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত 1947 সালে। উল্লেখিত সবগুলি সংস্থাই স্বকীয় সাংবিধানিক কাঠামোর ভিত্তিতে কাজ করতো এবং প্রত্যেকটি সংস্থা কেবল সদস্য-রাষ্ট্রগুলির কাছে তার কার্য্য-কলাপের জন্য দায়ী থাকতো। এই সংস্থা-গুলির সদস্যপদ কোনক্রমেই ছকে বাঁধা ছিল না। অন্য কথায়, কোন এক সংস্থার সব সদস্যই যে অন্য একটি সংস্থার সদস্য থাকবে এমন কোন ব্যাপার ছিল না। একদিক থেকে দেখতে গেলে এই সংস্থাগুলির উদ্দেশ্যের সাথে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যের কোন বিভেদ ছিল না; আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে এই সব সংস্থার সবগুলিরই নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গী ও প্রেরণা ছিল, সবগুলি সংস্থারই স্বকীয় সত্ত্বা ছিল।

ইয়াল্টা থেকে ফিরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক ভাষণে মার্কিণ কংগ্রেসকে বলেন, "এবার আমরা যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার পুরোণো ভুল আর করবো না। আমরা একই সাথে যুদ্ধের আশু সমাপ্তির জন্য এবং স্থায়ী শান্তির জন্য সংগ্রাম করে যাবো।" এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই চার্টারের (Charter) খসড়া চূড়ান্ত পর্য্যায়ে করে ফেলার জন্য প্রস্তাবিত সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা পুরোদমে চলতে লাগলো। এমনকি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুতেও তা বিঘ্নিত হলো না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রুম্যান (Truman) তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করলেন যে সম্মেলনের প্রস্তুতি পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী চলবে। 25 শে এপ্রিল সান্‌ফ্রানসিস্কো শহরে আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ষ্টেটিনিয়াসের সভাপতিত্বে "রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক

সংগঠন সম্পর্কিত সম্মেলন" (U. N. Conference on International Organisation) শুরু হয়।

সান্‌ফ্রানসিস্কো সম্মেলনের কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। কেইন্‌জ (Keynes) বা হ্যারল্ড নিকল্‌সন্‌ (Harold Nicolson) ভার্সাই সম্মেলনের (Versailles Conference) যত জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন, সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে অংশগ্রহণকারী কেউই তা করেন নি। ডেভিড হান্টার মিলারের 'প্যারিস সম্মেলনের ডায়ারীতে' (David Hunter Miller's Diary at the Conference at Paris) প্যারিস সম্মেলনের যে বাস্তবানুগ খতিয়ান আছে, তেমন কিছুও সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলন সম্পর্কে পাওয়া যায় না। তার অবশ্য কারণও আছে। প্রথমতঃ আমেরিকা, ইংলণ্ড ও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের মধ্যে আগেই বোঝাপড়া ছিল যে শান্তিচুক্তি ও চার্টার পৃথক পৃথক ভাবে হবে, ফলে ভার্সাই সম্মেলনের নাটকীয়তা সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে সম্ভব ছিল না। এছাড়াও, 1946 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'শান্তি সম্মেলনে' (Peace Conference of World War II) দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের যবনিকাপাত সন্তোষজনকভাবেই হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ শান্তিচুক্তি ছাড়াও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের কাজ পুরোপুরিই ভার্সাইতে করতে হয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ গঠনের সব কাজই সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে করার দরকার হয়নি কারণ রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তিপ্রস্তরের অনেকখানিই ডাম্বারটন ওক্সেই গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও আরও কিছু ভাবার আছে। বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপে যুদ্ধ চলেছিল 1945 খৃষ্টাব্দের মে মাসের 8 তারিখ পর্য্যন্ত এবং ঐ সময়ে এশিয়ায় যুদ্ধ পুরোদমে চলছিল। ফলে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের নেতারা জড়ো হতে পারেন নি বলে (যেমন হয়েছিল ভার্সাইর ক্ষেত্রে) সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনের চটক ভার্সাইর মত হয়নি। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে দ্বিতীয় সারির নেতারা (অংশগ্রহণকারী দেশগুলির বৈদেশিক মন্ত্রীগণ) গিয়েছিলেন। উইলসনের ভার্সাই যাওয়ার মত ট্রুম্যান সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোয় যেতে পারেন নি। তাঁকে ওয়াশিংটনেই থাকতে হয়েছিল। অন্য কথায় অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র সমূহের কর্ণধারগণ সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে তাঁদের নিজ নিজ রাজধানীতে থেকে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বসেই তাঁরা টেলিফোনে বা বেতারে খবর পেতেন এবং খবর পেয়ে যখন যেরকম বুঝতেন নির্দেশ পাঠাতেন। কখনও রাশ একটু ছাড়তেন, কখন বা একটু শক্ত করে ধরতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ব্যাপারেই তাঁরা

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে প্রেরিত তাঁদের অধীনস্থ প্রতিনিধিদের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে, সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর কার্য্যকলাপ পুরোণো বলে মনে হয়েছিল। ইদানীং-কালে সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশ্ব-ব্যাপী সংগঠন গড়ার কাজ সর্বপ্রথম হয় ভার্সাই সম্মেলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের মাধ্যমে। তখন যে আশা-নিরাশা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা ছিল, সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে, অর্থাৎ বিশ্ব-সংস্থা গঠনের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার প্রাক্কালে, তা সম্ভব ছিল না (যদিও অনেকে আশা করেছিলেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণ রাষ্ট্রসংঘের নায়কেরা দূরীভূত করবেন)। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে কোন নতুন ইতিহাস লেখা হয়নি, বরং পুরোণো ইতিহাসকেই ঘষা-মাজা করা হয়েছিল। বিশ্বসংস্থা গঠনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা বলেই এতে জাঁকজমক ভার্সাই সম্মেলনের মত ছিল না।

প্রেসিডেণ্ট উইলসনের "প্রকাশ্য সভায় গৃহীত খোলাখুলি চুক্তি-পত্রের" (Open Covenants, openly arrived at) নীতি সর্বান্তঃকরণে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে অনুসৃত হয়েছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সম্মেলন হয়েছে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। বলা যেতে পারে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলন ছিল সাংবাদিকদের স্বর্গ। তার কারণও ছিল। শিকাগোর ভৌগোলিক ও সামাজিক আবহাওয়া, মার্কিণ সাংবাদিকতার ঐতিহ্য, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে খবরের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মার্কিণ জনসমর্থনের মাধ্যমে সিনেটের সমর্থন লাভের জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ব্যগ্রতা—প্রভৃতি কারণে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মধ্যে সবচেয়ে প্রকাশ্য বলে স্বীকৃত। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে 2636 জন সাংবাদিক জড়ো হয়েছিলেন এবং অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদলসমূহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সাংবাদিকদের সম্মেলনের খবরাখবর সরবরাহ করতেন। মাঝে মাঝে অবশ্য পঞ্চশক্তির বা বৃহৎশক্তিত্রয়ের গোপন বৈঠক হতো, তবে সে শুধু নামে মাত্রেই। এমনকি সাংবাদিকরা যখন ধারেকাছে থাকতেন না তখন উদ্যোক্তারাই আগ্রহভরে সাংবাদিকদের কি হচ্ছে না হচ্ছে জানাতেন। শান্তি সংস্থার জন্মভূমি হিসাবে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো আরও একদিক দিয়ে ভার্সাই থেকে স্বতন্ত্র। চার্টার সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হয় এবং বিভিন্ন উপধারা একে একে (Clause by clause) ভোটে দেওয়া হয় এবং গৃহীত হয়। রাষ্ট্র-

সংঘের ব্যাপারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যথেষ্ট পরিমাণে মতৈক্য আগে থেকেই ডাম্বারটন ওক্সে না হয়ে থাকলে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে এ ধরনের কার্য্য-প্রণালী কিছুতেই সম্ভব হতো না। স্যার চার্ল্‌স্ ওয়েব্‌ষ্টার (Sir Charles Webster) বলেন যে, বৃহত্তর সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎশক্তিগুলির ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে বোঝাপড়া না থাকলে এবং তাদের মতামতের উপর ক্ষুদ্র শক্তিগুলির আস্থা না থাকলে এই সম্মেলন সফল হতো কিনা সন্দেহ আছে। ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থার ফলে এই সম্মেলনের কার্য্যপ্রণালী গণতন্ত্র-সম্মত হয়েছিল এবং বাস্তবের দিক থেকে দেখতে গেলে এর মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

সোভিয়েৎ সৈন্যবাহিনী যেদিন বার্লিন পরিবেষ্টন করেছে বলে ঘোষণা করলো সেদিনই সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনের সূচনা হয়। তারপর নয় সপ্তাহ ধরে সম্মেলন চলেছিল, কিন্তু চলমান যুদ্ধের প্রভাব সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলন কখনই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে মিঃ ষ্টেট্টিনিয়াস্ সবার মনের কথাটি বললেন, "বিলম্বে সমূহ ক্ষতিই হবে।" সবারই ধারণা হয়েছিল যে, শান্তি (অন্ততপক্ষে যুদ্ধ-বিরতি) যতই এগিয়ে আসছে, বৃহৎশক্তিত্রয়ের মধ্যে যুদ্ধকালীন একতা ততই কমে আসছে, অথচ সবার এ ধারণাও ছিল যে বৃহৎ-শক্তিত্রয়ের মধ্যে ঐক্য ছাড়া বিশ্বসংগঠনের মাধ্যমে শান্তির ব্যবস্থা অসম্ভব। কিন্তু দিন দিন সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে বিভেদ বেড়েই চলেছিল। ইউরোপে যেদিন "বিজয়" ঘোষণা করা হয় তার দুদিন আগে লণ্ডনে অবস্থিত পোলিশ (Polish) সরকারের প্রতিনিধিগণ মস্কোতে গ্রেপ্তার হন। আন্তর্জাতিক সৌজন্যবোধ সম্পর্কে সোভিয়েৎ সরকারের ধারণা যে পাশ্চাত্যের ধারণা থেকে কত ভিন্ন ধরনের, তা এই ঘটনা থেকে প্রতিভাত হয়েছিল। একথা সত্য যে, বৃহৎশক্তিবর্গের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বিভেদের ফলেই শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত পোলিশ সরকারের কোন মুখপাত্র সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। এরজন্য এবং সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে উপস্থিত নেতৃবর্গের অনেককেই তাঁদের ঘরোয়া সমস্যার দিকে মনোনিবেশ করতে হয়েছে বলে সম্মেলনের অগ্রগতি কখনও ব্যাহত হয়েছে, আবার কখনওবা যথেষ্ট পরিমাণে বিচার-বিবেচনা ছাড়াই কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর ফলেই চার্টারের অনেক জায়গায় নানা ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেছে। অবশ্য এও বলা যায় না যে,

আরও মন্থর গতিতে এগুলে আরও ভাল হত। সেক্ষেত্রে হয়তো বিঘ্নকারীরা এবং ভাবুকেরা পেয়ে বসতো এবং চার্টারকে নিখুঁত করতে গিয়ে খুঁটি-নাটি সম্পর্কে বেশী সচেনতার ফলে হয়তো মূল ঐক্য মাঠে মারা যেতো।

মিঃ ষ্টেট্টিনিয়াস্ আমেরিকার (যে দেশে সম্মেলন হয়েছিল) প্রতিনিধি হলেও সম্মেলনের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সভাপতি থাকার পক্ষপাতী মিঃ মলোটভ (Mr. Molotov) ছিলেন না এবং সে কথা তিনি শুরুতেই বলেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল যে উদ্যোক্তাদেশগুলির সবাই ঘুরে ফিরে সভাপতিত্ব করুক। তাছাড়া সোভিয়েৎ ইউনিয়নের আপত্তি ছিল আর্জেণ্টিনার সম্মেলনে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে (যদিও লাটিন আমেরিকার দেশগুলি আর্জেণ্টিনা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করছিল)। আর্জেণ্টিনার অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে ভোট হওয়ার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠলো রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যৎ কার্য্যধারার রূপ, এতে দেখা গেল যে রাষ্ট্রসংঘ দুই শিবিরে বিভক্ত—সোভিয়েট শিবির এবং লাটিন আমেরিকা। সোভিয়েৎ রাশিয়ার সমর্থনে ছিল যুগোশ্লাভিয়া এবং গ্রীস (ইউক্রাইন ও বাইলোরাশিয়ার সভ্যপদ তখনও স্বীকৃত হয়নি) এবং অন্য সমস্ত দেশগুলি হয় ভোটদান থেকে বিরত থেকেছে, নয় লাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে সমর্থন করেছে। রাষ্ট্রসংঘের চার্টারের খসড়া তৈরী করতে গিয়ে সবচেয়ে মারাত্মক মতবিভেদ হয় নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আঞ্চলিক সংস্থাগুলির কি ধরণের সম্পর্ক থাকবে তা নিয়ে। তখন পর্য্যন্ত এটাও লাটিন আমেরিকার সমস্যাই ছিল। এ সমস্যার স্থষ্টি হয়েছিল মেক্সিকো সিটিতে (Mexico city) আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনের (Inter-American Conference) ফলে। উক্ত সম্মেলনে দাবী করা হয়েছিল যে লাটিন আমেরিকার দেশ-গুলির মধ্যের বিভেদ তারা নিজেরাই মীমাংসা করবে। ভিতরে ভিতরে অবশ্য অনেকেরই ধারণা ছিল যে রাষ্ট্রসংঘ আশানুরূপভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে না। তাই বিভিন্ন আঞ্চলিক ব্যবস্থার মধ্যে নিরাপত্তার খোঁজ তখন থেকেই অনেকে করছিলেন। কিন্তু এ ভয়ও মোটামুটি ব্যাপকভাবেই ছিল যে সব দেশই যদি আঞ্চলিক ব্যবস্থায় মেতে উঠে তবে নিরাপত্তা পরিষদের হাতে কোন ক্ষমতা না থাকাই স্বাভাবিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিরাপত্তা পরিষদের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কিছু করার থাকবে না। যাই হোক্, এ ব্যাপারে আলোচনা দীর্ঘ হলেও খুব তিক্ত হয়নি এবং যে সূত্রের (formula) ভিত্তিতে মতৈক্য হয় সে সূত্রই হলো চার্টারের 51 নম্বর ধারা (Article 51)।

আমরা আগেই দেখেছি যে অছি অন্তর্গত এলাকাসমূহ ও উপনিবেশের প্রশ্নে ডাম্বারটন ওক্সে কিছু হয়নি এবং সে ঘাটতি পূরণ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের ছিল। ইয়াল্টা বৈঠকে শুধু ঠিক হয়েছিল যে, রাষ্ট্রসংঘের অছি-ব্যবস্থা (Trusteeship System) প্রযোজ্য হবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছিভুক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে (League Mandates), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের উপনিবেশসমূহের ক্ষেত্রে এবং সেই সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে যারা স্বেচ্ছায় অছি-ব্যবস্থার আওতায় আসবে। কথা ছিল যে, সম্মেলনের পূর্বেই বৃহৎ পাঁচটি শক্তি (Big Five) এ ব্যাপারে আলোচনা করে যা' হয় ঠিক করবে। কিন্তু তেমন কোন আলোচনা না হওয়ায় সানফ্রানসিস্কো সম্মেলনেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করা ছাড়া উপায় ছিল না। এ নিয়ে আলোচনা মাঝে মাঝে খুব তিক্ত আকার ধারণ করেছিল। বিভেদ হয়েছিল ঔপনিবেশিক, ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এবং সোভিয়েৎ ইউনিয়ন যথারীতি শেষোক্ত দলে ছিল। এ প্রশ্ন মীমাংসার জন্য সম্মেলনের সময়ের অনেকখানিই খরচ করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত যে মতৈক্য হয় তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই চার্টারের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। সবচেয়ে মারাত্মক মতবিভেদ অবশ্য হয়েছিল ভেটো (Veto) নিয়ে। যখন অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র শক্তিবর্গ আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ক্ষেত্রে (ইয়াল্টা সূত্র অনুসারে) ভেটো প্রয়োগের প্রস্তাবিত ক্ষমতাকে সমালোচনা করতে শুরু করলো, তখন দেখা গেল যে, 'ইয়াল্টা সূত্রের' (Yalta Formula) তাৎপর্য্য সম্পর্কে বৃহৎশক্তিত্রয়ের ধ্যান-ধারণায় বিস্তর প্রভেদ ছিল। 'ইয়াল্টা সূত্রের' তাৎপর্য্য পরিস্কার-ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য মে মাসের 22 তারিখে 23টি প্রশ্ন সম্বলিত এক তালিকা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাছে পেশ করলেন। উক্ত প্রশ্নাদির উত্তর দেওয়ার সময় দেখা গেল যে, একমাত্র সোভিয়েৎ ইউনিয়নই সম্পূর্ণরূপে প্রতিবন্ধকহীন ভেটো ক্ষমতার (100 per-cent Veto Power) পক্ষপাতী ছিল এবং সোভিয়েৎ প্রতিনিধিদের মতে শুধু 'প্রণালীগত' প্রশ্নেই (Procedural matter) নয়, কোন বিষয়কে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনাসূচীতে স্থান দেওয়া হবে কিনা সে ধরণের প্রশ্নেও ভেটো দেওয়া চলবে। ভেটোর প্রশ্নে জল এত ঘোলা হলো যে পুরো সম্মেলনই বানচাল হতে বসেছিল এবং সপ্তাহ খানেকের জন্য মোটামুটি অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এই কঠিন সংকটের মুখে বৃহৎশক্তিত্রয়

তাদের বাক-বিতণ্ডা সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো থেকে নিজ নিজ রাজধানীতে সরিয়ে নিয়ে গেল। অবশ্য ভেটো নিয়ে তর্ক-বিতর্ক সবচেয়ে বেশী হয় মস্কোতে। তখন হ্যারি হপ্‌কিন্‌স্ (Harry Hopkins) সোভিয়েৎ সরকারের সাথে আমেরিকার বিভেদ দূর করার এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মস্কোতে উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েৎ নেতাদের সাথে আলোচনা করে তিনি যখন পোল্যাণ্ডের প্রশ্নে একটা মীমাংসায় পেঁাছেছেন তখন ভেটোর ব্যাপার নিয়ে সরাসরি স্টালিনের সাথে আলোচনা করার জন্য তাঁর কাছে নির্দেশ পাঠানো হলো। আলোচনা শুরু করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি স্টালিনকে রাজী করাতে পেরেছিলেন এবং 7-ই জুন সান্‌ফ্রানসিস্কোতে যখন বৃহৎশক্তিগুলির মধ্যে ভেটো নিয়ে মতৈক্য হওয়ার খবর পেঁাছলো, তখন সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। নতুন মতৈক্য অবশ্য পুরনো ভিত্তিতেই হয়েছিল, অর্থাৎ, 'ইয়াল্টা সূত্রের' একটা শব্দও হেরফের না করে এবং সেটাই হচ্ছে চার্টারের 27 নম্বর ধারা। উদ্যোক্তা শক্তিবর্গ সেই প্রশ্ন তেইশটিরও কোন যথার্থ উত্তর দেয়নি। 'ইয়াল্টা সূত্রের' তাৎপর্য্য সম্পর্কে তাদের ভাষ্য দিয়ে তারা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলো। সেই বিজ্ঞপ্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি নীচে দেওয়া হলো :

"নিরাপত্তা পরিষদের সামনে আনীত কোন বিবাদ বা পরিস্থিতির পরিষদকর্তৃক বিবেচনা বা আলোচনা পরিষদের কোন সদস্য একক-ভাবে রোধ করতে পারবে না ...... এ ধরনের কোন বিবাদের কোন পক্ষ পরিষদের সামনে কোন বক্তব্য রাখতে গেলেও তা উক্ত উপায়ে রোধ করা যাবে না ......

কিন্তু এও ঠিক যে নিরাপত্তা পরিষদের কোন সিদ্ধান্তের বা কাজের এমন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব যার ফলে এমন সমস্ত ঘটনাবলীর উদ্ভব হতে পারে যেগুলির মোকাবিলা করতে গেলে স্বকীয় দায়িত্ব পালন করার খাতিরে পরিষদকে সামরিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতে পারে। এমন সমস্ত ঘটনাবলীর উদ্ভব হতে পারে তখনই যখন পরিষদকে কোন বিষয়ে তদন্ত (investigation) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, অথবা বিবাদমান রাষ্ট্রগুলিকে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতে হয়, অথবা বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য কোন সুপারিশ (recommendation) করতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন কোন বিবাদে যদি কোন পরিষদ-সদস্য পক্ষ হিসাবে থাকে,

তবে উক্ত বিষয়ে সেই সদস্য ভোট-দান থেকে বিরত থাকবে, অন্যথায় উপরে উল্লিখিত ধরনের সিদ্ধান্ত বা কাজের ক্ষেত্রে পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে।”

এ ধরণের সাফাই যদিও অনেক প্রতিনিধির পক্ষে, বিশেষ করে অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি এভাটের (Evatt) পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়েছিল, তবুও বৃহৎশক্তিবর্গের মধ্যে মতৈক্যের খাতিরে তা মেনে নিতে হয়েছিল। ভেটোর এই ধরনের অর্থ নিয়ে যে দেশগুলি নিরাশ হয়েছিল, তাদের খানিকটা খুশী করার জন্য অন্য একটা রাস্তা একটু খুলে রাখা হলো। অর্থাৎ ঠিক হলো যে, রাষ্ট্রসংঘ কাজ শুরু করার দশ বৎসর পরেও সাধারণ প্রণালীতে চার্টারের সংশোধন না হয়, তবে সাধারণ সভা (General Assembly) সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এবং তার সাথে নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে (এবং সে ব্যাপারে ভেটো দেওয়া চলবে না) গৃহীত সিদ্ধান্তের বলে চার্টারের পর্য্যালোচনা করার জন্য সম্মেলন (Charter review conference) ডাকা হবে।

ভেটো সম্পর্কিত বাধা অপসারণের ফলে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর আকাশ থেকে দুর্যোগের কালো মেঘ কেটে গিয়েছিল। সাধারণ সভার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে নাকচ করার জন্য এবং ডাম্বারটন্ ওক্সের পরিকল্পনা অনুসারে সাধারণ সভার ক্ষমতার উপর শক্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করার দাবী তুলে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন শেষ মুহূর্তে খানিকটা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। যাই হোক্, এ ব্যাপারেও মীমাংসা হয়েছিল (মীমাংসার সূত্র হচ্ছে চার্টারের 10, 11 এবং 13 নম্বর ধারা) এবং এর ফলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ সারা সম্মেলনে যেটুকু সুবিধা আদায় করতে পেরেছিল তা অক্ষত থেকে যায়।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে যখন চার্টারের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হলো, তখন দেখা গেল যে ডাম্বারটন ওক্স পরিকল্পনার অনেক অপ্রিয় অংশই উক্ত পরিকল্পনার সমালোচকরা পাল্‌টে ফেল্‌তে সমর্থ হয়েছে। এতে মাঝারি শক্তিবর্গের বিশেষ করে ক্যানাডার অবদান ছিল অনেক। উদাহরণ স্বরূপ 44 নম্বর ধারার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধারায় বলা হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের সভ্য নয় এমন কোন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে শান্তি-রক্ষার কাজে নিয়োগ করার প্রশ্ন উঠলে উক্ত রাষ্ট্র পরিষদের আলোচনায় যোগ দিতে পারবে এবং স্বকীয় সেনাবাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্তে উক্ত রাষ্ট্র পরিষদে ভোটও দিতে পারবে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ শুধু

ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নেই সোচ্চার ছিল না, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের উপর অধিকতর দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ব্যাপারেও তারা যথেষ্ট পরিমাণে চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এদের প্রচেষ্টার ফলেই অছি পরিষদ (Trusteeship Council) এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) 'মুখ্য অঙ্গের' (Principal Organ) পর্য্যায়ে উন্নীত হয় এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সংঘের দায়িত্ব ও কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কিত বিষয়াদি চার্টারে স্থান পায়।

অবশেষে স্বাক্ষরের জন্য চার্টারের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়। অবশ্য এটা মোটেই সাধারণ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না। পাঁচ প্রস্থ দলিলে নাম সই করতে অংশগ্রহণকারী পঞ্চাশটি দেশের দুশো প্রতিনিধির পুরোপরি আট ঘণ্টা সময় লেগেছিল। সমবেত প্রতিনিধিদের বিদায় জানানোর প্রাক্কালে 26শে জুন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কণ্ঠে যে হতাশার সুর বেজে উঠেছিল, তাতেই সান্‌ফ্রান্সসিস্কোতে সমবেত প্রতিনিধিদের অনেকের মনোভাবের প্রতিফলন হয়েছিল। তার ছ'দিন পরে অনুমোদনের জন্য মার্কিন সিনেটের সামনে চার্টার পেশ করা হয় এবং 28শে জুলাই সিনেট 89—2 ভোটে চার্টার অনুমোদন করাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকাকৃত ভুলের সংশোধন হলো। উইল্‌সনের উদ্ভাবনী শক্তির ফল হিসাবে হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, অথচ আমেরিকাই উক্ত সংস্থার বাইরে ছিল। কিন্তু ট্রুম্যানের সময় আর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো না। এবারে আমেরিকা তার সামর্থ্য এবং জগৎসভায় তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে নতুন বিশ্বসংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং অন্য রাষ্ট্রসমূহও আমেরিকার অনুসরণ করে। চার্টারের 110 নম্বর ধারা অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা-গরিষ্ঠের (বৃহৎ পাঁচটি শক্তিসহ) অনুমোদনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসংঘের কার্য্য আরম্ভ হওয়ার কথা। 1945 খৃষ্টাব্দের 24শে অক্টোবর তা' হয় এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মের 26 বৎসর পর একটা ব্যাপক বিশ্বসংস্থার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বিশ্বমানবের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা শুরু হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতিপুঞ্জ ও রাষ্ট্রসংঘ

নতুন বিশ্বসংস্থা প্রতিষ্ঠার উত্তেজনার কলরোলে পুরাতনের বিদায়ের শোক অনেকটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের অভিনবত্বে গুরুত্ব আরোপের মার্কিন কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতিপুঞ্জকে প্রকৃতপক্ষে সানফ্রান্স্‌সিস্কো বৈঠকে বিস্মৃতির মধ্যে রাখা হয়েছিল। এর প্রতিনিধিত্ব সেখানে ছিল 'বেসরকারী' এবং 'দুই তিন জন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ।' সেখানে ছিলেন কার্য্যকরী সেক্রেটারী জেনারেল সিন লেষ্টার (Mr. Sean Lester), কোষাধ্যক্ষ জ্যাক্‌লিন (Mr. Jacklin) এবং প্রধান পরিচালক (Senior Director) লাভ্‌ডে (Mr. Loveday)। মিঃ স্টেট্টিনিয়াস্‌ (Mr. Stettinius) প্রতিনিধিবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে ইচ্ছে করেই জাতি-পুঞ্জের নাম উল্লেখ করেননি, পাছে জাতিপুঞ্জের পরোক্ষ উল্লেখও উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) ব্যর্থতার ভূত সান্‌ফ্রান্সসিস্কোর অপেরা গৃহের মঞ্চে আবির্ভূত হয়। এমনকি চার্টারের মধ্যে পরিভাষাগত সাদৃশ্যের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা করেই পুরোনো নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ 'ম্যানডেটের' (Mandate) পরিবর্তে 'অছি ব্যবস্থা' (Trusteeship) অথবা "স্থায়ী বিচারালয়ের" (The Parmanent Court of Justice) পরিবর্তে "আন্তর্জাতিক বিচারালয়র" (International Court of Justice) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, ডাম্বারটন ওক্স-এর (Dumbarton Oaks) মত সান্‌ফ্রান্সসিস্কোতেও উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে আনুষ্ঠা-নিকভাবে প্রশংসা না করলেও অধিকতর মূল্য দিয়েছিলেন। বস্তুত জাতি-পুঞ্জের কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ ও জাতি-পুঞ্জের মধ্যে উদ্দেশ্যগত, কাঠামোগত এবং প্রণালীগত সাদৃশ্য এত বেশী এবং এত বাস্তব বলেই এই দুটি সংস্থার বৈসাদৃশ্যের উপরই আলোকপাত করা বিধেয় মনে হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের বিষয়টি যতই মূল্যবান এবং আকাঙ্খিত হোক, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিছু স্বীকৃত ব্যবহারিক প্রণালী সম্বলিত

স্বেচ্ছাকৃত সংগঠনই নতুন সংস্থার কার্য্যধারার ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়। কারণ প্রত্যেক সভ্যই সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে যোগদান করেছে। পূর্বের মত একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং একই ধরণের কাঠামো সম্বলিত একটি সংগঠন করা হয়েছে যার চারিটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে সাধারণ সভা—প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রই এতে থাকবে, নিরাপত্তা পরিষদ—বৃহৎশক্তিবর্গকে কেন্দ্রবিন্দু করেই গঠিত, একজন নির্বাচিত মহাসচিবের অধীনে স্থায়ী, ও আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে একটি সচিবালয়, এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়, যাকে রাষ্ট্রসংঘের মূল অঙ্গ না বলে সংযোজিত অংশ বলা যেতে পারে।

লীগ সভার (League Assembly) মতই সাধারণ সভারও ভিত্তি হলো সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের বক্তব্য পেশ ও ভোটদানের ক্ষেত্রে সমান অধিকার। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বৈঠকের পরই প্রথম ব্যাপকভাবে এই ধারণা প্রকাশ করা হয়েছিল যে নিরাপত্তা পরিষদকে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মোটামুটি সার্বিক দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে একটি পরিস্কার সীমারেখা টানা হয়েছে যা' সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে ছিল না। সনদ (Covenant) যখন বিশ্বের শান্তি বিঘ্নের প্রশ্নে লীগসভা (League Assembly) ও লীগ পরিষদ (League Council) উভয়কেই ক্ষমতা অর্পণ করেছে তখন চার্টারে (Charter) শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র তখনই সাধারণ সভা কোন বিষয়ে তার সুপারিশ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে রাখতে পারে যখন নিরাপত্তা পরিষদের কর্মসূচীতে উক্ত বিষয় উহ্য থাকে অথবা নিরাপত্তা পরিষদ উদ্যোগী হয়ে সাধারণ সভাকে কোন ব্যাপারে সুপারিশ রাখতে বলে। বাস্তবের দিক থেকে দেখতে গেলে এই বিভাজন অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্যকরী হয়নি।

একদিক থেকে দেখতে গেলে চার্টার সাধারণ সভাকে অধিকতর ক্ষমতা দিয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অছি সম্পর্কিত (Mandate) প্রশ্নে আসল ক্ষমতা লীগ পরিষদের ছিল। জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থার ও জাতিপুঞ্জের অছি কমিশনের কাজ দেখাশুনা করার এবং উক্ত সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা মূলত লীগ পরিষদেরই ছিল। কিন্তু চার্টার নিরাপত্তা পরিষদকে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নির্দিষ্ট রেখে আর সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষমতা সাধারণ

সভাকে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ রাষ্ট্রসংঘের আওতায় দুটি বিশেষ ধরনের সংস্থা গঠন করা হয়েছে। তার একটি হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC), অন্যটি হলো অছি পরিষদ (Trusteeship Council) এবং উভয় সংস্থাকেই নিজস্ব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কার্য্যকলাপ এত ব্যাপক এবং এত বিচিত্র ধরণের যে সেগুলিকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি। তাই রাষ্ট্রসংঘের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষ ধরনের সংস্থা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রণালীগত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের একটি অভিনব অবদান রয়েছে। লীগ সভা ও লীগ পরিষদ উভয় ক্ষেত্রেই একটিমাত্র বিরোধী ভোটই কোন সিদ্ধান্তকে গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারতো। (যদিও একথা সত্য যে এর থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার পথও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যেই ছিল)। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতা শুধুমাত্র স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কোন স্থায়ী সদস্য ভেটো প্রয়োগ না করলে পনেরটির মধ্যে নয়টি ভোট কোন প্রস্তাবের স্বপক্ষে পড়লেই যথেষ্ট।

গঠনশৈলীর দিক থেকে নিরাপত্তা পরিষদ তার পূর্বসূরী লীগ পরিষদকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছে। লীগ পরিষদের মতই বৃহৎশক্তিবর্গ স্থায়ী সদস্যপদে সমাসীন এবং অন্যান্যদের থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত সদস্যের ব্যবস্থা আছে। লীগ পরিষদের গঠন ব্যবস্থা অবশ্য অধিকতর নমনীয় ছিল। এখানে স্থায়ীসদস্য (বৃহৎশক্তিবর্গ) পরিবর্তনের ব্যবস্থা ছিল, অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা পরিবর্তনের ব্যবস্থা ছিল, এমনকি আধাস্থায়ী সদস্যপদেরও ব্যবস্থা ছিল। এ ধরনের সাংগঠনিক নমনীয়তা রাখা সম্ভব হয়েছিল, কারণ লীগ পরিষদ গঠনের দায়িত্ব লীগ সভার হাতে ছিল। নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালী চার্টারেই স্পষ্ট করে লেখা আছে। চার্টার সংশোধন না করে এর পরিবর্তন সম্ভব নয়। 1965 খৃষ্টাব্দে চার্টারের 23 নম্বর ধারা পরিবর্তন করেই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা এগার থেকে বাড়িয়ে পনের করা সম্ভব হয়েছিল।

বিশেষ ধরনের কার্যক্রমের দায়িত্ব সহ নিরাপত্তা পরিষদের অধিকতর কর্মক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামো করা হয়েছে। কোথাও শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে কিনা এবং তার জন্য শান্তি রক্ষার্থে শক্তিপ্রয়োগ প্রয়োজন কিনা এটা রাষ্ট্রসংঘের হয়ে নির্ধারণ করার পূর্ণ দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের এবং নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র মানতে বাধ্য। এইজন্য নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলির সামরিক প্রধানদের নিয়ে গঠিত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী নামে একটি বিশেষ সংস্থা আছে। এই সংস্থা পূর্বের থেকেই সৈন্যবাহিনী গঠন এবং নিয়োগ সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করবে এবং নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগের পথে অগ্রসর হলে তখন এই সংস্থা রণকৌশল সম্পর্কে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করবে। সনদের তুলনায় চার্টারে ব্যাপকতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে 1939 খৃষ্টাব্দ নাগাদ এসবক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের কাজের এত ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল যে এসব বিষয়ে জাতিপুঞ্জের কাজকর্ম তত্বাবধান করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee for Economic and Social Questions) গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সাধারণ সভার অধীনস্থ এবং সাধারণ সভার কাছে প্রতিবেদন পেশ করার দায়িত্বসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) নামে যে পৃথক সংস্থার জন্ম হয় তার বীজ এই প্রস্তাবেই নিহিত ছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদির ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি হিসাবে কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপর ন্যস্ত, যদিও এরজন্য এই পরিষদের হাতে কোন বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। শুরুতে এর সদস্যসংখ্যা ছিল আঠারো এবং তত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে বৃহৎশক্তিবর্গের জন্য কোন স্থায়ী সদস্যপদ ছিল না। 1965 খৃষ্টাব্দে চার্টার সংশোধন করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা যখন বাড়ানো হয়, তখন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা আঠারো থেকে সাতাশ করা হয়েছে।

ম্যানডেটধারী রাষ্ট্র (Mandatories) জাতিপুঞ্জের ম্যানডেটের দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য গঠিত কমিশনের

সদস্য সংখ্যা ছিল নয় এবং পরবর্তীকালে তা বাড়িয়ে দশ করা হয়। এই সদস্যগণ নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের সরকারী মুখপত্র হিসাবে নয়। চারজন সদস্য ম্যানডেটধারী রাষ্ট্রগুলির থেকে নিযুক্ত হতেন। চূড়ান্ত দায়িত্ববহনকারী লীগ পরিষদে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করত স্থায়ী ম্যানডেট কমিশন, যদিও লীগ সভা ম্যানডেটের প্রশ্নে সবসময় তার মতামত প্রকাশ করত। রাষ্ট্রসংঘ চূড়ান্ত দায়িত্ব সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত করলেও ম্যানডেট কমিশনের স্থানে অছি পরিষদ নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা স্থাপন করেছে। লীগ পরিষদের মতই নিরাপত্তা পরিষদেরও কোন অছিধারী রাষ্ট্র নির্দেশাদি ঠিকমত পালন না করলে অছি ক্ষমতা এবং মানবিকতার চাপ সৃষ্টিই ছিল একমাত্র অস্ত্র। অছি পরিষদের অবশ্য একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে যা ম্যানডেট কমিশনের ছিল না, তা হল অছিভুক্ত অঞ্চলগুলিতে (Trust Territories) যাওয়ার অধিকার। তাছাড়া চার্টারের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, অন্যদেশ নিয়ন্ত্রাধীনে রাখে এমন সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র প্রশাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য। অছি পরিষদ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত নয়। এর সদস্য বৃহৎপঞ্চশক্তি ও সাধারণ সভাকর্তৃক নির্ধারিত সদস্য নিয়ে গঠিত এবং সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতাও এর উপর ন্যস্ত। অছিভুক্ত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে এমন সদস্য এবং নিয়ন্ত্রণ করে না এমন সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা সমান রাখার জন্য যে কজন সদস্য নির্বাচন করা প্রয়োজন সাধারণ সভা সে কজন সদস্য নির্বাচন করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সচিবালয়ের ব্যবস্থাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সচিবালয়ের ব্যবস্থাও চার্টারে আছে। একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য হলো এই যে, (99 ধারা অনুসারে) মহাসচিব যদি মনে করেন যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে তা হলে তিনি নিজ প্রচেষ্টায় এ সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

জাতিপুঞ্জের নিয়ম অনুযায়ী 1921 খৃষ্টাব্দে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপিত হয়েছিল, এর সদর দপ্তর হেগে (The Hague) অবস্থিত ছিল। যেহেতু এটা সম্পূর্ণ জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রনাধীন সংস্থা নয় তাই এর সদস্যসংখ্যা জাতিপুঞ্জের সদস্যসংখ্যার সাথে সমান নয়। এর পনেরজন বিচারককে লীগ সভা ও লীগ পরিষদ যৌথভাবে নির্ধারিত

করতো এবং জাতিপুঞ্জ এই বিচারালয়ের সামগ্রিক ব্যায়ভার বহন করতো। সানফ্রান্সসিস্কোর প্রতিনিধিবৃন্দ রাষ্ট্রসংঘের অধীন একটি নতুন সংস্থা গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য এই সম্মেলন পুরাতন স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের যে গঠনতন্ত্র ছিল তার উপর নতুন কিছুই তেমন সুপারিশ করতে পারেন নি। ফলে নতুন আন্তর্জাতিক বিচারালয় পুরাতনেরই অনুকরণে গঠিত হয়েছিল। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলো এটা রাষ্ট্রসংঘেরই একটি অঙ্গ এবং রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্যই এর সদস্য। অবশ্য রাষ্ট্রসংঘের সদস্য ছাড়াও এর সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের গঠনশৈলী যেমন জাতিপুঞ্জের অনুকরণে করা হয়েছে তেমনি ধ্যানধারণার দিক থেকেও রাষ্ট্রসংঘের উপর জাতিপুঞ্জের প্রভাব অনেকখানি পড়েছে। স্যার আলফ্রেড জিমার্ণ তার "দি লীগ অব্ নেশনস্ অ্যাণ্ড দি রুল ল" পুস্তকে বলেছেন যে তিনি লীগ সনদের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রথমদিককার ইতিহাসের মধ্যে। চার্টারকেও বিশ্লেষন করতে হবে একইভাবে। কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা চার্টারে জড়ো হয়েছে এবং জাতিপুঞ্জের কার্য্যপদ্ধতি ও সনদের বিষয়বস্তু কতটা গ্রহণ করা হয়েছে তাও দেখতে হবে।

জিমার্ণের মতে বৃহৎশক্তিজোটের (Concert of the Great Powers) প্রভাব সনদের উপর পড়েছে এবং এর মূল নূন্যপক্ষে ক্যাস্‌লরিগের (Castlereagh) "কংগ্রেস সিসটেম" (Congress System) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এমন সমস্ত বৃহৎশক্তিগুলির নিয়মিত বৈঠকই এ ব্যবস্থার মূল কথা। লীগ পরিষদের মধ্যে স্থায়ী সদস্যদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তি ও তাদের নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই উপরিউক্ত ব্যবস্থা পরিপূর্ণ হয়।

শুরু থেকেই রাষ্ট্রসংঘের স্থপতিদের চিন্তাধারা এই ধারণাকেই কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হয়েছে। চার্চিলের ভাষায় "গ্রাণ্ড অ্যালায়েন্স" (Grand Alliance) 1940-45 সালের যে ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সেই ঘটনাবলীই চার্টার রচনার প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত করা এবং শান্তি রক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার পূর্বশর্ত হিসাবে কাজ করেছে বৃহৎ শক্তিবর্গের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে এবং সামরিক

প্রধানদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক এবং সেই সমস্ত বৈঠক-প্রসূত পারস্পরিক বোঝাপড়া। অনেক সময় বোঝাপড়া নিখুঁত না হলেও মিলিতভাবে কাজ করার প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিল, এবং তা না হলে এমনকি রাশিয়াতেও জয় সম্ভব হতো না। সুতরাং শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে এটাই যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপীয় কনসার্টের ধারণা চার্টারের ভিতরে নিহিত ছিল। লীগ পরিষদের মতই নিরাপত্তা পরিষদের গঠনতন্ত্রে বৃহৎশক্তিবর্গকে স্থায়ী আসন দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে পাঁচটি বৃহৎ শক্তির কথা সাংবিধানিক নথির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে (Article 23)। ভেটো ক্ষমতা তাদের সুবিধাজনক অবস্থার নজির এবং নিজেদের যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার সাংবিধানিক অস্ত্র। অন্যান্য সদস্য তাদের বিশেষ ক্ষমতাকে পরিস্কারভাবে স্বীকার করে। তারা 'শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর অর্পণ করেছে এবং এই দায়িত্ব যথাযোগ্যাভাবে পালন করবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ তাদের হয়ে কাজ করে' (Article 24)। তাছাড়াও, 'চার্টার অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের সদ্যরাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলবে' (Article 25)। এমনকি এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সদস্যদের কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ও আছে (সপ্তম ধারা)। বাস্তবিকপক্ষে চার্টার ইউরোপীয় কনসার্ট সম্পর্কে ক্যাস্‌লরিগের ধারণাকে এবং ক্ষমতা ও দায়িত্বের দিক থেকে লীগ পরিষদকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্থা বিশ্বের অন্য সমস্ত জায়গায় শান্তি রক্ষার দায়িত্বের দিক থেকে এবং সাংগঠনিক দিক থেকে অনেকটা চতুঃশক্তিজোটের অনুকরণে হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর জন্ম এবং বিশ্বের পুলিশ বাহিনী হিসাবে কাজ কারর জন্য নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত এই ক্ষমতা।

লীগ সভা আসলে ক্ষমতা প্রদানকারী অথচ বিশেষ সুবিধা বা ক্ষমতাহীন রাষ্ট্রসমূহের একটি বহিঃবৃত্ত হিসাবে ছিল (বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরও তাই ভেবেছিল) এবং এর বৈঠক ঘন ঘন না হওয়া এমনকি চার বৎসর পরে পরে হওয়াটাই সাব্যস্ত ছিল। আসলে সনদ পুরোপুরি রূপ নেওয়ার পরে এবং বিশেষ করে জাতিপুঞ্জের কাজ শুরু হওয়ার পরে দেখা

গেল যে লীগ সভার ক্ষমতা এতটা অকিঞ্চিৎকর ছিল না। লীগ পরিষদকে মন্ত্রীসভা বলে ধরলে লীগ সভাকে (অনেকের মনঃপূতঃ না হলেও) সংসদ (Parliament) অর্থাৎ আলোচনা ও নালিশ করার স্থান হিসাবে ধরা যেতে পারতো। বস্তুতঃপক্ষে লীগ সভার মূল্যায়ন এ ধরণের বিবরণের মাধ্যমে সম্ভব নয়। লীগ সভা ছিল অনন্য, এটা ছিল জাতিপুঞ্জের এক ধরণের রাজনৈতিক আবিষ্কার।

চার্টার গঠনকারীগণ এই বিভাগে হাত দেওয়ার সময় উইলসনীয় (Wilsonian) ধারণার বাইরে কোন পরিস্কার পথ খুঁজে পাননি। এ বিষয়ে তাঁদের কোন সন্দেহই ছিল না যে (এমনকি আপতঃদৃষ্টিতে রাশিয়ারও নয়) একটি 'সভা' (Assembly) অবশ্যই থাকবে, এবং কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ লীগ সভার অনুকরণেই হবে। সাধারণ সভার প্রকৃত ক্ষমতা এবং কার্য্যক্রম কোন নির্দিষ্ট সূত্র অনুসারে করা না হলেও এটা ঠিক হয়েছে বৃহৎশক্তিবর্গ ও অবশিষ্টের মধ্যে টানাপোড়েনের ফলশ্রুতি হিসাবে। নিরাপত্তা পরিষদে তাদের বিশেষ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে বৃহৎশক্তিবর্গ সাধারণ সভায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অছি বিষয়ক ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রকে কিছু কিছু সুবিধা দিতে রাজী ছিল। অন্যান্য শক্তিগুলি সাধারণ সভাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতদুর সম্ভব ব্যাপক অংশ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। এ নিয়ে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনে যথেষ্ট মতবিরোধ ঘটেছিল। চার্টারে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতিতে এই মতপার্থক্যের প্রতিফলন দেখা যায়।

জিমার্ণ ও আরো অনেক লেখক 1874 খৃষ্টাব্দে বিশ্ব ডাক যোগাযোগ সংস্থা (Universal Postal Union) গঠনকে আন্তর্জাতিক অরাজনৈতিক সংস্থা গঠনের ও 'বিশ্ব সেবার' (World Services) সূত্রপাত বলে অভিহিত করেছেন। লীগ সনদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কাজ করার ভূমিকা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গ্রহণ করেছিল। তার স্বাক্ষর ছিল একটি স্থায়ী সচিবালয়ে (যার দায়িত্ব ছিল খবরাখবর সংগ্রহ এবং প্রদান করা) এবং 24 নং ধারা অনুসারে জাতিপুঞ্জকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যমণি হিসাবে স্বীকৃতিতে। ডাম্বারটন ওকস্ এবং সানফ্রানসিস্কো এই উভয় স্থানেই চার্টার রচয়িতারা এই চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং 'বিশ্বসেবার', ধারণা চার্টারের মধ্যে অনেক বেশী পরিমাণে পরিস্ফুট। গঠনশৈলীর দিক থেকে দেখতে

গেলে এর প্রকাশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে এবং প্রশাসনিক দিক থেকে এটা পরিস্ফুট হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার যে ভূমিকা রাষ্ট্রসংঘ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে (Article 63 & 64)। প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত ধারণার এত ব্যাপ্তি ঘটেছে যে সেটাকে আর প্রায় চেনাই যায় না। যেমন জাতীয় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র পথ ও ডাক ব্যবস্থা ছাড়িয়ে স্বাস্থ্য, চাকুরী ও উচ্চ উৎপাদনশীলতা প্রভৃতিতে ব্যাপ্ত হয়েছে বলে আমরা একে "জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র" বলি, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'বিশ্বসেবার' ধারণা 1945 খৃষ্টাব্দে বিশ্বসংস্থা গঠনকালে অনেক ব্যাপক হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ গঠনের সময় "আন্তর্জাতিক কল্যাণের" দাবী সোচ্চার হয়েছিল, যার ভিত্তি সেবা (নিয়ন্ত্রণ নয়) ও উন্নততর বণ্টন-ব্যবস্থা। দাবী উঠেছিল বিশ্বস্বাস্থ্য, শিক্ষা, উৎপাদন এবং সার্বিক কর্মসংস্থানের উন্নতির জন্য কাজ করার, কাঁচামাল, কারিগরী দক্ষতা এবং এমনকি মূলধন ভাগ করে বিশ্বের সার্বিক কল্যাণ সাধনের। কোন আন্তর্জাতিক কর্মসূচী বা সংগঠন হিসাবে "জনকল্যাণমূলক আন্তর্জাতিকতাবাদ" তখনও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি, এবং এর মধ্যে আশা ও হতাশার একটি খাপছাড়া প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু কল্যাণমূলক আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রভাব তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিতে এত বেশী পড়েছিল যে অন্যান্য দেশগুলির পক্ষে একেবারে চোখ বন্ধ করে থাকা সম্ভব হয়নি। এজন্যই চার্টার ঈস্পিত ফল লাভ করেছিল। বলা যেতে পারে প্রতিশ্রুতি ও সদিচ্ছার ছড়াছড়ি সনদ অপেক্ষা চার্টারে অনেক বেশী হয়েছে। ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথার কোন উল্লেখ সনদে কোথাও নেই। কিন্তু প্রস্তাবনায় রয়েছে 'সামাজিক উন্নতি ও উন্নততর জীবনের' কথা, সমস্ত জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির কথা। চার্টারের প্রথম ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে আছে 'অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবিক বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতা' ইত্যাদি ; রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন উদ্দেশ্য হিসাবে আছে উন্নততর জীবন মানের কথা, পূর্ণ কর্মসংস্থানের কথা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কথা। কিন্তু এও বলা যায় যে জনকল্যাণমূলক আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে চার্টারে সবকিছু বলা হয়নি, চার্টারে রাজনৈতিক বিষয়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে যত নিখুঁতভাবে, কল্যাণমূলক আন্তর্জাতিকতাবাদের উপস্থাপনা সে তুলনায়

অসচ্ছ। চার্টারে কোথাও স্পষ্ট করে বলা নেই কিভাবে আন্তর্জাতিক কল্যাণের পথে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যেতে পারে। এর কারণও আছে। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠন রাষ্ট্রসংঘের আওতার বাইরে কাজ করছিল। কিন্তু সবথেকে বড় কারণ হলো যে চার্টার রচয়িতারা রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে অন্যান্য বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে উঠতে পারেননি। কল্যাণমূলক আন্তর্জাতিকতাবাদের (Welfare Internationalism) অভিনবত্ব অবশ্য তাঁদের খানিকটা বিচলিত করেছিল যার জন্য গালভরা কথার সাথে কোন কার্য্যকরী কর্মসূচীর সংযোজন সম্ভব হয়ে উঠেনি। বৃহৎশক্তিগুলির মধ্যে সমঝোতা এবং তাদের মধ্যে বিশ্ব-সেবার ধারণা অস্পষ্টভাবে হলেও চার্টারের কাঠামোর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের কর্মপ্রণালীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতই অন্যান্য বিষয়ও প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষতঃ উভয় সংস্থারই প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা। জিমার্ণ এগুলির মধ্য থেকে একটি ধারণাকে উইলসোনীয় ধারণা হিসাবে আলাদা করে দেখেছেন এবং "মনরো নীতি ব্যবস্থা" (Monroe Doctrine System) নামে অভিহিত করেছেন, যার বর্তমান স্বরূপ উৎপত্তির ইতিহাসের মত যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট নয়। এই ধারাটাই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে সনদের X নম্বর ধারায়, সেটাকে বলা হয় পারস্পারিক অঙ্গীকারের ধারা এবং এতে সদস্যরাষ্ট্রসমূহ বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পরের আঞ্চলিক সংহতি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পারস্পারিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছিল। এর ভিতর দিয়েই সনদ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পুরাতন পদ্ধতিকে অতিক্রম করে বিশ্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটাই হল 'একের জন্যে সকলে এবং সকলের জন্যে একের' তত্ত্ব, যেটা পরবর্তীকালে 'যৌথ নিরাপত্তা' (Collective Security) নামে অভিহিত হয়েছে।

চার্টারের 2 নম্বর ধারার 4 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সমস্ত সভ্যরাষ্ট্র তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করা বা শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেওয়া থেকে বিরত থাকবে যা কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত সংহতি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিপন্থী। এই অঙ্গীকারের দ্বারা সনদের X ধারার অর্ধেক গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে কোন দেশের অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করার দায় চার্টারে প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত হয়নি। অন্য কথায়, চার্টার প্রস্তুতকারকগণ এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন এমন হলো? ডাম্বারটন ওক্স প্রস্তাব সম্পর্কে বৃটিশ সরকার যে সরকারী ব্যাখ্যা দিয়েছে তা হলো সনদের X নম্বর ধারা বর্ণে বর্ণে গ্রহণ করলে কোন দেশের সীমানাগত স্থিতাবস্থা 'চিরকালের' জন্যে মেনে নিতে হয়। অন্যত্র 2 নম্বর ধারার 1 নম্বর অনুচ্ছেদে সার্বভৌমত্বগত সাম্যের নীতি (Sovereign Equality) রক্ষার সাধারণ নীতির জন্য কোন দেশ অপর দেশের উপর হামলা করতে পারবে না এবং তাছাড়াও চার্টারের অন্যত্র যুদ্ধ নিবারণ সম্পর্কিত 'সুনিশ্চিত' অঙ্গীকারের সাথে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের উপর আরোপ করা সুনির্দিষ্ট দায়ের উল্লেখ আছে। এই যুক্তির সাথে চার্টারের 39, 41 এবং 42 ধারা বলে নিরাপত্তা পরিষদের শান্তিভঙ্গের অথবা শান্তিভঙ্গের হুমকির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং সে বিষয়ে সভ্যরাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে সহায়তার ব্যবস্থা করার ক্ষমতার যোগসূত্র আছে। অন্যভাবে বলতে গেলে সনদে উল্লিখিত পারস্পরিক সহযোগিতা কথাটি কিছুটা অসম্পূর্ণ রয়েছে। কারণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে বৃহৎ-শক্তিগুলির অঙ্গীকারকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চার্টার রচয়িতাদের বিশেষ করে বৃহৎশক্তিবর্গের চিন্তাধারায় এটাই ছিল। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী থেকে দেখা গেছে যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র-সমূহ মতৈক্যে পৌঁছতে না পারার ফলে উপরি-উল্লিখিত চিন্তাধারা অচল হয়ে গেছে এবং এর ফলস্বরূপ সনদ প্রবর্তিত পারস্পরিক অঙ্গীকারের তত্ত্বের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

"পারস্পরিক অঙ্গীকারের" (Mutual Guarantee) ধারণার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে আর একটি নীতি জাতিপুঞ্জের সনদ প্রনয়ণের সময়ে কাজ করেছে, যাকে 1918 সালে বৃটিশ বিচারপতি লর্ড পার্কার "শোরগোল" (Hue and cry) নীতি বলে অভিহিত করেছেন এবং যেটা মিষ্টার এলিহু রুটের (Elihu Root) স্মারকলিপিতে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সনদের এই নীতির মূলকথা হলো যুদ্ধ বিশ্বের যে প্রান্তেই হোক না কেন তা হলো বিশ্বের সামগ্রিক ব্যাপার এবং বিশ্বমানবের বিরুদ্ধে অপরাধ। সুতরাং বিশ্বসংস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সকল সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে একটি যৌথ ও পারস্পরিক অঙ্গীকারে ব্যবস্থা করা। সেটা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষা বা স্বাধীনতা রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যার মূল উদ্দেশ্য হবে যে কোন যুদ্ধ পরিস্থিতিকে নিবৃত্ত করা। উপরিউক্ত চিন্তা-ধারার আংশিক প্রকাশ আমরা সনদের XI নম্বর ধারার মধ্যে দেখতে পাই।

সেখানে বলা হয়েছে 'যে কোন যুদ্ধ বা যুদ্ধের হুমকি তা তখনই কোন সদস্য রাষ্ট্রকে স্পর্শ করুক বা নাই করুক সমস্ত জাতিপুঞ্জের উদ্বেগের কারণ হবে।' অবশ্য উপযুক্ত প্রয়োগ পদ্ধতির অভাবহেতু এই নীতির শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। এককভাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যোগ দেওয়া না দেওয়ার স্বাধীনতা ছিল এবং সনদের XII নম্বর ধারার কল্যাণে কিছু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার সুযোগ ছিল। 1928 খ্রীষ্টাব্দে 'প্যারিস্ চুক্তি' অথবা 'কেলগ-ব্রায়াণ্ড চুক্তি' যুদ্ধকে বে-আইনী করার ব্যাপারে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিল। উপরিউক্ত চুক্তিকে শেষ পর্যন্ত 65 টি রাষ্ট্র স্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং তারা ঘোষণা করেছিল যে 'তারা যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে নিন্দা করে—জাতীয় নীতির অঙ্গ হিসাব যুদ্ধকে বর্জন করে' এবং সমস্ত বিরোধকে 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটিয়ে নেওয়ার দায় গ্রহণ করছে'। সদিচ্ছা হিসাবে এই চুক্তি অবশ্যই অভূতপূর্ব, কিন্তু এই চুক্তি যুদ্ধকে বে-আইনী করেছে এতটা দাবী করা ঠিক হয়নি। যুদ্ধকে কেবলমাত্র নিন্দাই করা হয়েছে এবং 'অঙ্গীকার' করতে চাওয়া হয়েছে, কিন্তু এই নীতিকে বাস্তবায়িত করার উপযুক্ত সাংগঠনিক বন্দোবস্ত কিছুই করা হয়নি। সর্বোপরি, স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ পরিস্কারভাবে প্রকাশ করেছিল যে এই নীতি স্বীকার করার অর্থ 'আত্মরক্ষার' অধিকারকে বিসর্জন দেওয়া নয় এবং তাতে তথাকথিত আত্মরক্ষার অধিকারের ব্যাপক অর্থ করার সুযোগ ছিল।

'শোরগোল' সূত্র সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে এ সূত্রের মধ্যে বিশ্ব-গোষ্ঠীর (World Community) তত্ত্বের অঙ্কুর নিহিত ছিল। অবশ্য মাঞ্চুরিয়া ও ইথিওপিয়ার ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার দ্বারা উপরিউক্ত ধারণা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেছে বলে পরবর্তীকালে সমালোচকেরা মত প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রসংঘ গঠনের সময় কিছুটা পরিবর্তিত ধারণা পোষণ করা হতো, তা হলো বিশ্বগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাক আর নাই থাক সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত পঞ্চশক্তির অস্তিত্ব ছিল। এই অনুমানের যুক্তি গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত হলো 'সোরগোল' নীতিকে সংগঠিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব বৃহৎ পঞ্চশক্তির উপর অর্পিত হওয়া উচিত, অন্যকথায় সেটা হলো নিরাপত্তা পরিষদ—বৃহৎশক্তি সমঝোতার পরিবর্তিত এবং আরও শক্তিশালী রূপ যেটা কাজ করবে সব সময় এবং যার অধীনে সামরিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকবে। সুতরাং একদিক থেকে দেখতে গেলে যুদ্ধ বন্ধ করার বিশ্বের সার্বিক দায়িত্বকে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি রাষ্ট্রের উপর

চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 39 নম্বর ধারা অনুসারে শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা আছে কিনা এবং সেক্ষেত্রে 'কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে' তা ঠিক করবে নিরাপত্তা পরিষদ। অন্যদিকে 41 নম্বর ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ অন্যান্য সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রকে বলতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহ নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রশ্নে 25 নম্বর এবং 49 নম্বর ধারাবলে অঙ্গীকার-বদ্ধ। তাই চার্টারের বক্তব্য সনদের XI নম্বর ধারার খানিকটা অনুসারী। অর্থাৎ 'যে কোন যুদ্ধই জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের উদ্বেগের বিষয়', এই ধারণা কার্যক্ষেত্রে চার্টারের ব্যবস্থাপনায়ও স্থান পেয়েছে। তাছাড়াও, রাষ্ট্রসংঘ সংগঠকরা দাবী করেন যে উপরিউক্ত নীতির বাস্তবায়নের প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যবস্থাপনার দিক থেকে দেখতে গেলে চার্টার প্যারিস চুক্তি ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ছাড়িয়ে গেছে। ডাম্বারটন ওক্স প্রস্তাব সম্পর্কে বৃটিশ সরকারী ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, যখন সনদ ব্যবস্থায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুদ্ধ বৈধ বলেই স্বীকৃত হয়েছিল....নতুন সংস্থা (U.N.) শুধুমাত্র সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ব্যবস্থার অবলুপ্তির চেষ্টা করবে তাই নয়, যে কোন শান্তি বিঘ্নের হুমকিকেও মোকাবিলা করবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠকগণ 'সমঝোতা' (কনসার্ট) বব্যস্থার থেকে ব্যাপক এবং 'শোরগোল' সূত্র থেকে দুর্বল 1918 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বিরাজমান কিছু কিছু ধারণা এবং তার প্রয়োগ কৌশল পেয়েছিলেন। সেগুলি হলো হেগ্ সম্মেলনের বিধি ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার মূলমন্ত্র ছিল মধ্যস্থতা, অনুরঞ্জন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদের সমাধান, এবং সেই ব্যবস্থার অবদান ছিল কিছু কার্য্যকরী নিয়ম-কানুন, একটি স্থায়ী সচিবালয় এবং সালিশীর জন্য উপযুক্ত কিছু লোকের বন্দোবস্ত। আক্রমণ বন্ধ করা এই ব্যবস্থার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবে সংশ্লিষ্ট বিবদ-মান পক্ষ সমূহ চাইলে আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যবস্থা করা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ না চাইলেও শান্তিপূর্ণ সমাধানের অনুকূলে জনমত গঠন করার কাজ এই ব্যবস্থার চাবিকাঠি ছিল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থা সার্বিকভাবে গ্রহণ করেছিল। সনদের XII নম্বর ধারা থেকে XV নম্বর ধারার মধ্যেই তা আছে। এখানে আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির পদ্ধতি হিসাবে সালিশী অথবা স্থায়ী বিচারালয়ের মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি করা, নয় লীগ পরিষদ

এবং সর্বোপরি লীগ সভার কাছে সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক বিবাদ পেশ করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। উপরিউক্ত পদ্ধতিকে জোরদার করার ব্যবস্থা সনদে XVI নম্বর ধারায় করা হয়েছিল। তাতে ছিল আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ অবজ্ঞা করে যুদ্ধে লিপ্ত দেশের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত অর্থনৈতিক এবং শর্তাধীনভাবে সামরিক ব্যবস্থার কথা। ('শোরগোল' সূত্রের মত এ ব্যবস্থায়ও ফাঁক ছিল। কোন দেশের আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় নিয়ে বিরোধের প্রশ্নে জাতিপুঞ্জের কিছু করার ছিল না)।

হেগ্ সম্মেলনের বিধি-ব্যবস্থার যা কিছু জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মোটামুটি সবটাই রাষ্ট্রসংঘ গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চার্টারের 1 নম্বর ধারার প্রথম উপধারায় বলা হয়েছে, "ন্যায় বিচারের নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে শান্তি-ভঙ্গের কারণ হতে পারে এমন সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের অথবা পরিস্থিতির ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান ও নিষ্পত্তি সাধন করা।" "আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির পন্থা" শীর্ষক চার্টারের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপরিউক্ত পদ্ধতিকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং XIV নম্বর অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কর্ম-পদ্ধতির বিবরণ আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তির বিভিন্ন পন্থা হিসাবে বিরোধকারী পক্ষগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনাভিত্তিক মীমাংসা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, অনুরঞ্জন, সালিশী, বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণ এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ—প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে কোন বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে এবং সেই বিরোধ শান্তির প্রতি হুমকি স্বরূপ দেখা দিলে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে কঠোরতর পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা রয়ে গেছে এবং তা আছে চার্টারের সপ্তম অধ্যায়ে। যদিও চার্টারের 35 নম্বর ধারা বলে কোন আন্তর্জাতিক বিরোধকে সাধারণ সভার কাছে পেশ করা যেতে পারে, তবুও নিরাপত্তা পরিষদের ব্যবস্থা গ্রহণের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রেও, যেমন শান্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের প্রশ্নে, চার্টার প্রস্তুতকারকগণ নিরাপত্তা পরিষদকেই কার্য্যকরী অঙ্গ হিসাবে মুখ্য ভূমিকায় আশা করেছিলেন। অবশ্য একথা সত্য যে চার্টারবলে, যেমন ছিল সনদের ক্ষেত্রে, বিরোধকারী সদস্যরাষ্ট্রদের উপর বিরোধ নিষ্পত্তির কোন সমাধান জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রসংঘের নেই। চার্টারে

আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিরোধকারী রাষ্ট্রসমূহের অবলম্বনের জন্য বিশদ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের কোন সংস্থাই, এমনকি নিরাপত্তা পরিষদও কোন সিদ্ধান্ত সরাসরি চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারী নয়। কোন আন্তর্জাতিক বিরোধের ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নের আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রসংঘ নিশ্চয়ই শান্তিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিরোধের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত কলহকারী রাষ্ট্রসমূহের উপর তাদের অমতে চাপিয়ে দিতে পারে না। কারণ, আর যাই হোক্ না কেন, রাষ্ট্রসংঘকে সারা বিশ্বের সরকার বলা যেতে পারে না।

উপরিউক্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ধ্যান-ধারণাই হয়েছে চার্টারের মূল উপকরণ। কিন্তু এগুলো ছাড়াও আরও কিছু অনুপূরক অথচ গুরুত্বপূর্ণ ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন পর্য্যায়ে চার্টারের অঙ্গীভূত হয়েছে, যেমন হয়েছিল সনদের ক্ষেত্রে। সেগুলোর একটি হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণ। প্রথম হেগ্ সম্মেলনে যে চিন্তাধারার সূচনা হয়েছিল তা' জেনেভাতেও বহাল ছিল এবং তা' হলো অস্ত্রশস্ত্র শুধু যুদ্ধের অস্ত্রই নয়, যুদ্ধের কারণও ; অতএব যে কোন বিশ্বসংগঠনের অন্যতম বক্তব্য হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণের পথে অগ্রসর হওয়া। সনদের VIII নম্বর ধারায় এই ধারণারই প্রতিফলন হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে জাতীয় নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার্থে যৌথ শক্তি প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক দায় পালনের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্র-সম্ভার আন্তর্জাতিক শান্তির খাতিরে ন্যূনতম পর্য্যায়ে নামিয়ে আনা দরকার। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতা লীগ পরিষদের ছিল এবং সেই পরিকল্পনা বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের সরকারসমূহ গ্রহণ করলে সেই দেশগুলির সৈন্যসংখ্যার উচ্চসীমা নির্ধরিত হতে পারতো। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের ঘটনাবলীর কারণে নিরস্ত্রীকরণের উৎসাহে ভাটা পড়েছিল ; এবং ত্রিশের দশকের ঘটনাবলী থেকে এটা বোঝা গিয়েছিল যে অস্ত্রশক্তিতে শক্তিশালী হওয়াই শান্তি বিঘ্নের কারণ নয়, অযোগ্য হাতে অস্ত্রশক্তি বাড়লেও অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাই 'শান্তিপ্রিয়' রাষ্ট্রগুলিকে আক্রমণ পর্যুদস্ত করার জন্য অস্ত্রশক্তিতে শক্তিশালী হতে হবে। শুধু নিরস্ত্রীকরণের খাতিরেই নিরস্ত্রীকরণের উপর জোর দেওয়ার কোন পরিকল্পনা ঠিক সেভাবে চার্টারে স্থান পায়নি। এই মতের সমর্থনে 11 নম্বর ও 26 নম্বর ধারার কিছু কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা

যেতে পারে। 11 নম্বর ধারাবলে সাধারণ সভা নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের নীতির ব্যাপারে বিবেচনা ও সুপারিশ করার অধিকারী এবং 26 নম্বর ধারাবলে পৃথিবীর মানবিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের নূন্যতম অংশ যাতে অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য ব্যায়িত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উন্নয়ন ও রক্ষণের জন্য 47 নম্বর ধারায় উল্লিলিত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর সাহায্যে অস্ত্রাদি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে পরিকল্পনাদি প্রস্তুত করার এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্য রাষ্ট্র-সমূহের নিকট পেশ করার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। শান্তির জন্য অস্ত্রশস্ত্র কমানো প্রয়োজন একথা মনে করা হয়নি। অস্ত্রশস্ত্রের নিয়ন্ত্রণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্রাদি সম্পর্কিত খবরাখবর আদান-প্রদানের কোন ব্যবস্থা সনদের মত চার্টারে করা হয়নি। সনদের এই ব্যবস্থাপনা অবশ্য কার্য্যকরী হয়নি। বস্তুতঃ সামরিক শক্তি প্রয়োগের দায়িত্বসহ নিরাপত্তা পরিষদের যে ভূমিকা (সে ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য করার জন্য সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী) তাতে রাষ্ট্রসংঘের অনুকূলে যথেষ্ট পরিমাণে সামরিক শক্তি প্রাপ্তি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। চার্চিল ও রুজভেল্টের প্রত্যয়েরই এখানে প্রতিফলন ঘটেছে। সে প্রত্যয় হলো গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির দুর্বলতা এবং অক্ষশক্তিগুলির আক্রমণমুখী মনোভাবের কারণে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের সামরিক শক্তি হ্রাস করার মারাত্মক ভুলের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। অবশ্য এও মনে করা যেতে পারে যে হিরোসীমায় আনবিক বোমা বিস্ফোরণের পরে সানফ্রানসিস্কো সম্মেলন হলে এ বিষয়ে চার্টার প্রস্তুতকারকগণের চিন্তাধারা অন্যরকম হতে পারতো।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, জাতিপুঞ্জের ম্যাণ্ডেট কমিশনের কাঠামোকে সমপ্রসারিত ও শক্তিশালী করেই সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের অছি-পরিষদ। অছি সম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে কার্য্যক্রম সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা ভার্সাই ও সানফ্রানসিস্কো সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে মোটামুটি একই ধারায় এগিয়েছিল। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ম্যানডেট ব্যবস্থার পিছনে তিন ধরনের ধ্যান ধারণা কাজ করেছে। বিতর্কিত অঞ্চল সমূহের উপর একাধিক রাষ্ট্রের যৌথ-নিয়ন্ত্রণ (Con-dominium), (যেমন কঙ্গোতে হয়েছে); নির্ভরশীল জাতিসমূহের উপর কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশকর্তৃক ব্যবহৃত অছি ক্ষমতা (বৃটেন

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এবং ফ্রান্স আফ্রিকার ক্ষেত্রে যা করেছে); নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এলাকার সম্পর্কে যৌথ দায়িত্ব পালনের বৃহৎশক্তিবর্গের জোটবদ্ধ কার্যক্রমের তত্ত্ব; উদাহরণস্বরূপ অটোমান সাম্রাজ্য বা কঙ্গো-ভুক্ত স্থায়িত্বহীন অথবা অনুন্নত এলাকার কথা বলা যেতে পারে। জাতিপুঞ্জের ম্যানডেট ব্যবস্থায় ম্যানডেটধারী রাষ্ট্রসমূহের কিছু বিশেষ সুবিধা ছিল, আবার সেই সমস্ত সুবিধার যাতে অপব্যবহার না হয় সেই ব্যবস্থাও ছিল। তবে ম্যানডেট-ব্যবস্থার অধীন জ্যাতিসমূহের দিক থেকে দেখতে গেলে সেই রক্ষা কবচের ব্যবস্থা ছিল অর্থহীন। যাইহোক, ম্যানডেট-ব্যবস্থায় উপরিউক্ত তিন ধরনের ধ্যান-ধারণার সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল বিভিন্ন জাতির 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' (Self-Determination) ব্যপক দাবী। অধিকাংশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের অধীন দেশগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারদান করাকেই মোটামুটিভাবে তাদের লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন এবং ফিলিপাইনে মার্কিণ শাসনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থেই উপনিবেশ থাকবে, এই তত্ত্বের অবসান ভার্সাই চুক্তির পরেই ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি কিভাবে এবং কতটা নিষ্ঠার সাথে পরাধীন জাতিসমূহের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করবে সেটাই মুখ্য আলোচ্য বস্তু ছিল। উপরন্তু, যুদ্ধ একদিকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির পূর্বগৌরব, বিশেষ করে দূর-প্রাচ্যে, অনেকাংশে খর্ব করেছিল, এবং অপরদিকে পরাধীন জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে জোরদার করেছিল। সর্বোপরি, বৃহত্তম শক্তিদ্বয় সানফ্রানসিস্কোতে প্রচণ্ডভাবে ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা করেছিল—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা করেছিল 1776 খৃষ্টাব্দে তাদের ছিনিয়ে নেওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের চিন্তাধারা ও রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সোভিয়েৎ রাশিয়া করেছিল মার্ক্সীয়-লেনিনীয় দর্শন এবং স্টালিনকৃত তার ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হয়ে।

এই সমস্ত কারণেই চার্টারের মধ্যে অছি পরিষদ একটি পৃথক এবং প্রধান অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রসংঘের ক্রিয়া-কলাপকে অছিভুক্ত দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে তার বাইরেও প্রসারিত করা হয়েছে। সনদের XXIII (b) ধারায় জাতিপুঞ্জের সভ্য রাষ্ট্রগুলিকে তাদের অধীন দেশের অধিবাসীদের উপর শাসন ক্ষমতা

অপপ্রয়োগ না করতে বলা হয়েছে, কিন্তু পরাধীন জাতিসমূহ সম্পর্কে কেবলমাত্র এই অন্তঃসারশূন্য সদিচ্ছার কথাই বলা হয়েছে, তাছাড়া আর কোন কিছুই হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত শক্তিসমূহের উপনিবেশগুলিকে ম্যানডেট ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল। পক্ষান্তরে চার্টারে "স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলসমূহ সম্পর্কিত ঘোষণা" (একাদশ অধ্যায়) বলে একটি সুদীর্ঘ ঘোষণা রাখা হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য্য যে, এই ঘোষণার বিষয়বস্তু প্রয়োগের দিক থেকে সনদের ধারার মতই কার্য্যকারিতাহীন। অবশ্য এর ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মতার ফলে রাষ্ট্রসংঘের সভ্যরাষ্ট্রগুলির উপর নৈতিক চাপ পড়েছে এবং এর থেকেই বোঝা যায় যে জেনেভা সম্মেলনের সময় থেকে পরাধীন দেশের মানুষের প্রতি আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তাধারা কিভাবে এগিয়েছে। সনদের ব্যাখ্যাতীত "যোগ্য ব্যবহারের" (Just Treatment) পরিবর্তে অধীন দেশীয় মানুষের স্বার্থরক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া, তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত প্রগতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, "আত্মনিয়ন্ত্রণ" ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির বন্দোবস্ত করা, উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, গবেষণায় উৎসাহদান প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি, উপনিবেশিক শক্তিগুলি "যে সমস্ত অঞ্চলের জন্য তারা যথাক্রমে দায়ী সেই সমস্ত অঞ্চলে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত অবস্থাদি সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত এবং কারিগরী ধরনের অন্যান্য খবর মহাসচিবকে নিরাপত্তাজনিত ও সাংবিধানিক বিধিনিষেধ সাপেক্ষে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে।" উপরিউক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে চার্টারের সতর্ক শব্দচয়ন থেকে এটা বোঝা যায় যে নিজেদের উপনিবেশের প্রশ্নে ঔপনিবেশিক দেশগুলি সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের প্রশাসনিক যন্ত্র হিসাবে কাজ করার কোন ভূমিকা স্বীকার করেনি (যেমন তাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ রাখেনি)। এসব সত্বেও এই ধারাগুলির মধ্য দিয়ে এক নতুন তত্বের স্বীকৃতি মিলেছে—তাহলো প্রশাসনিক দিক থেকে নির্ভরশীল জাতিসমূহের (আন্তর্জাতিক সংগঠনের অছি-ব্যবস্থার আওতায় নয় সেই সমস্ত জাতিসহ) বিষয়ের সাথে আন্তর্জাতিক সংগঠনের নীতিগতভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়া।

উপরিউক্ত ভাবধারার প্রতিফলন হয়েছে 'মানবিক অধিকার' সম্পর্কে—যেটাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে আন্তর্জাতিক সংগঠনের আওতাভুক্ত বিষয় বলে

মনে করা হয় (চার্টারের বক্তব্যে)। XXIII নম্বর ধারায় এই সমস্ত বিষয়ে সনদের প্রান্তিক স্বার্থের উল্লেখ ছিল। শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয় (আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার মাধ্যমে এর পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল) এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের প্রতি অবৈধ ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ের সাথেই উল্লিখিত প্রান্তিক স্বার্থ জড়িত ছিল। পক্ষান্তরে, শুধু চার্টারের প্রস্তাবনার বক্তব্য "মানুষের মৌলিক অধিকারে, ব্যক্তির মর্য্যাদা ও যোগ্যতার উপরে, স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারে এবং ছোটবড় নির্বিশেষে সমস্ত জাতির অধিকারে বিশ্বাস অটুট রাখার প্রতিজ্ঞা" এবং চার্টারের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে বর্ণিত (1 নম্বর ধারার 3 নম্বর অনুচ্ছেদ).... বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, ভাষা এবং ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন ও উৎসাহদানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করার কথাই শুধু নয়,—55 নম্বর ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদের বক্তব্য অনুসারে 'মানবিক অধিকার' ও 'মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বজনীন সম্মান প্রদর্শন এবং সেগুলি পালনের' কথা ইত্যাদিও আছে। 62 নম্বর ধারায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে বলা হয়েছে এবং সর্বশেষে 68 নম্বর ধারায় মানবিক অধিকার উন্নয়নের জন্য পৃথক কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।

মানবিক অধিকার নিয়ে চার্টারের ভাষা গালভরা হলেও তার বাস্তবায়ণের অনুকূলে কোন কার্যসূচী আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে গ্রহণ করা সহজসাধ্য নয়। তার কারণ যাদের অধিকার দেওয়ার অথবা রক্ষা করার কথা তারা কোন না কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সার্বভৌম বলে স্বীকৃত হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ব্যাপারে কিছু করার সামর্থ প্রায় নেই বললেই চলে। এছাড়াও, চার্টারে কোথাও বলা নেই কিভাবে 2 নম্বর ধারার সপ্তম অনুচ্ছেদের বক্তব্য (যেখানে কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে) লঙ্ঘন না করে রাষ্ট্রসংঘ মানবিক অধিকারের প্রশ্নে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তবুও ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে চার্টারের এই নীতি গ্রহণের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। মানবতার বিরুদ্ধে নাৎসী ও জাপানী শাসক-গোষ্ঠীর ঘৃণ্য অপরাধ সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। (রাশিয়ার অভ্যন্তরে কি ঘটেছিল তা অবশ্য সবটা প্রকাশ পায়নি)। ন্যুরেমবার্গ বিচারের সময়ই এমন একটি বিশ্বসংস্থার

স্বপক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছিল, যে সংস্থা যেকোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থের গণ্ডীকে অতিক্রম করে তার পাশবিক আচরণের প্রতিবিধান করতে পারবে। চার্টারের মানবিক অধিকারসংক্রান্ত ধারাগুলি আরও অনেক ধারার মতই অতীতের দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত হয়েছিল, এর প্রেরণা হিসাবে অতীতের বেদনাময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের তাগিদ যতখানি কাজ করেছে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ঠিক ততখানি কাজ করেনি। চার্টার রচয়িতাগণ মার্কিণ মনোভাবের থেকেও যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। মার্কিণ সংবিধানের মৌলিক অধিকারের কিছু কিছু চার্টারে স্থান পাক এটা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল। সেনেটর ভ্যানডেনবার্গ ও মিষ্টার জন ফষ্টার ডালেস্ চার্টারে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলি সংযোজনের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন রিপাবলিকান দলের প্রভাবশালী সদস্য এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর এই রিপাবলিকান দল মানবিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আমেরিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব (1798 খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান অনুযায়ী মানবিক অধিকার পুরোপুরিই রাজ্য সরকারের আওতায় ছিল) বাড়ানোর ব্যাপারে অগ্রণী ভুমিকা গ্রহণ করেছিল। চার্টারে মানবিক অধিকার-সংক্রান্ত ধারাগুলিতে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রাখা হয়েছিল, এবং এই অস্পষ্টতার জন্যই যে সমস্ত রাষ্ট্রে মানবিক অধিকার ঠিকমত রক্ষিত হয়নি তারাও চার্টারকে সমর্থন করেছিল। সন্দেহপ্রবণ দেশগুলিও চার্টারে সম্মতি দিয়েছিল, কারণ তারা মনে করেছিল যে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের সুপারিশ করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা নেই।

কব্‌ডেনীয় মতবাদ (Cobdenism) যখন স্বীকৃতির উচ্চশিখরে, তখন অবাধ বাণিজ্যকে যুদ্ধ নিবারণ এবং শান্তিরক্ষার অন্যতম পন্থা বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। 1919 খ্রীষ্টাব্দেও ভিক্টোরীয় যুগের এই ধারণার গৌরব ম্লান হয়ে যায়নি। তাই কোন না কোন ভাবে সনদে এর অন্তর্ভুক্তির পিছনে সমর্থন ছিল। উড্‌রো উইল্‌সনের (Woodrow Wilson) "চতুর্দশ সূত্রের" তৃতীয় সূত্রে ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক বাধা অপসারণ এবং তাদের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাম্য আনয়নের কথা বলা হয়েছিল। সনদের XXIII নম্বর ধারার পঞ্চম অনুচ্ছেদে সেকথাই খানিকটা পরিবর্তিত রূপে গৃহীত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল—'জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলি তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কব্‌ডেনীয় মতবাদের প্রধান ধারক ও বাহক ছিলেন মিঃ কর্ডেল হাল্‌ (Cordell Hull)। ঐতিহ্যগতভাবে যে দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 'সংরক্ষণের' নীতিতে বিশ্বাসী, সেই আমেরিকার বৈদেশিক সচিব অবাধ বাণিজ্যের নীতির অনুকূলে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার কারণ মিঃ হাল্‌ উইল্‌সনের মতই ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য এবং দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। উভয়েই তাঁদের দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে পক্ষপাতহীনতার স্বপক্ষে টানতে চেয়েছিলেন। উপরিউক্ত ভাবধারার প্রভাবেই আমেরিকা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে 'লেণ্ডলীজ' (Lend Lease) কর্মসূচীর মাধ্যমে মিত্র দেশগুলিকে এর উদার কর্মসূচীতে আস্থাশীল করতে চেয়েছিল। প্রতিটি 'লেণ্ডলীজ' চুক্তিতে একটি করে ধারা ছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, "সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ উৎপাদন, কর্ম-সংস্থান, বিনিময় এবং পণ্যের ভোগ বাড়াতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সকলপ্রকার অসাম্য বর্জন করতে এবং বাণিজ্য শুল্ক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক দূর করতে সচেষ্ট হবে"। অবশ্য চার্টার প্রণয়নের সময় দেখা গেল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'লেণ্ডলীজের' ক্ষেত্রে মিত্র দেশগুলিকে যা' বলেছিল তা' সে নিজেই পুরাপুরি গ্রহণ করতে সম্মত ছিল না। ঘোর রক্ষণশীল ও সংরক্ষণবাদী শক্তি প্রথমে ওয়াশিংটনে এবং পরে সানফ্রান্সিস্কোতে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। কব্‌ডেনীয় মতবাদের জন্মভূমি বৃটেনও অবাধ বিশ্ব-বাণিজ্যের অনিশ্চিয়তার পরিবর্তে 'কমনওয়েল্‌থ'-এর বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার পক্ষপাতী ছিল। যাই হোক্‌, দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে অবাধ অর্থনীতির প্রতি বিশ্বব্যাপী অনীহার ফলে আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন মানুষও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সকলপ্রকার বাধা-নিষেধ দূর করার স্বপক্ষে চেষ্টা চালানোর চেয়ে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের সামগ্রিক উন্নতির জন্য যোগ্য কর্মসূচী গ্রহণের অনুকূলে বেশী তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। ফলতঃ চার্টারে অবাধ বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে আদৌ কোন কথার উল্লেখ নেই। চার্টারের প্রস্তাবনায়, উদ্দেশ্যসমূহে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়সংক্রান্ত ধারাগুলিতে ভাষাগত উৎকর্ষতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে চার্টারের বক্তব্য সনদের XXIII নম্বর ধারার বক্তব্যের কাছে সম্পূর্ণ নিস্প্রভ। তার পরিবর্তে অবশ্য আন্তর্জাতিক কল্যাণ সম্পর্কে 'উন্নততর জীবনমান, পূর্ণ কর্মসংস্থান' ইত্যাদির উল্লেখ রয়ে গেছে। তাছাড়াও চার্টারের 1 নম্বর ধারায় 'আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে

অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার' কথা অথবা 'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নয়নের' কথা অথবা 'অর্থনৈতিক প্রগতি ও উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশের' কথার (55 নম্বর ধারার প্রথম উপধারা) উল্লেখ আছে। এগুলি অবশ্য খুবই ব্যাপক অর্থবহ, যার কোন ধরাবাঁধা ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রসংঘের সভ্যরাষ্ট্রগুলি যদি ইচ্ছা করে তা' হলে অবশ্য তারা এগুলি উদারনৈতিক বাণিজ্য-নীতির অনুসমর্থন হিসাবে ধরতে পারে। (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থা ও 'বাণিজ্য ও শুল্ক সম্পর্কে সাধারণ চুক্তির' উদ্যোক্তারা যে রকমভাবে এগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন)। তবে উপরিউক্ত সমস্ত উল্লেখের মধ্যে কব্‌ডেনের স্বপ্নের পৃথিবীর (যে পৃথিবী যুদ্ধমুক্ত এবং যেখানে বাণিজ্য অবাধ) আভাষমাত্র আছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আটলাণ্টিকের দুই তীরের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিকে মধ্যমণি হিসাবে রেখে একটি বিশ্বজনীন সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও সনদে আঞ্চলিকতার স্বীকৃতি ছিল। যদিও প্রথমে মন্‌রো ডক্ট্রিন সম্পর্কে আমেরিকার দুর্বলতা এর পিছনে কাজ করেছিল তবুও চূড়ান্ত পর্য্যায়ে অন্যান্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার বৈধতার স্বীকৃতিই ছিল সব চেয়ে বড় কারণ। সেই স্বীকৃতিই লিপিবদ্ধ হয়েছিল সনদের XXI নম্বর ধারায়। এতে বলা হয়েছিল: শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি যথা, সালিশী সংক্রান্ত চুক্তি, অথবা 'মন্‌রো ডক্ট্রিনের' মত আঞ্চলিক বোঝাপড়া প্রভৃতি সনদের কোন কিছু বলেই ব্যহত হবে না। এই ধারার বলেই 'লিট্‌ল আঁতাত' (Little Entente), 'বলকান আঁতাত' (Balkan Entente) এবং লোকার্নোর মত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা আইনানুগ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। কিছু কিছু সমালোচকের মতে সনদের এই ধারা যুদ্ধপূর্ব জোটগুলির পুনরুজ্জীবনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, অথচ উইল্‌সনের মত নেতৃবর্গ মনে করতেন যে ওই ধরণের জোট-গুলিকে সমাধিস্থ করাই জাতিপুঞ্জের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল। ফলতঃ জাতিপুঞ্জ গঠনের পরও জাতিপুঞ্জপূর্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দেশের নির্ভরতা টিঁকে ছিল এবং এই সত্য মূর্ত হয়েছিল সনদের XXI নম্বর ধারায়।

বিশ্বসংস্থা হিসাবে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতায় জনৈক অভিজ্ঞ চিন্তাবিদ্ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে জাতি-

পুঞ্জের উত্তরসূরী সংস্থাকে এমনভাবে গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যে সংস্থায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তুতিপর্বে মিঃ চার্চিল এক সময়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কমানোর ভিত্তিতে বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিলেন। চার্চিলের উপরিউক্ত মত শুধুমাত্র রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বৃহৎশক্তিবর্গই প্রত্যাখ্যান করেছিল তাই নয়, চার্চিলের মন্ত্রিসভার সদস্যরাও এর বিরোধিতা করেছিলেন। তার পরিবর্তে নিরাপত্তাকে বিশ্বব্যাপী করে সংগঠিত করার জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার অনুকূলে সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রস্তাবিত সংস্থার মধ্যেই নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্বসহ একটি কেন্দ্রমূলের প্রস্তাবও হয়। একথা অনস্বীকার্য্য যে পৃথিবীর অনেক অংশে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা হয় তখনই সংগঠিত হয়ে গিয়েছিল নয় সংগঠনের প্রস্তাব হয়ে গিয়েছিল। যে ধরণের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ স্বার্থ ও চিন্তাধারার একাত্মতা বোধ করতে পারতো এবং নিরাপত্তার যে আশ্বাস অনুভব করত তা' দেওয়া একটা সদ্যজাত বিশ্বজনীন সংস্থার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ডাম্বারটন ওক্সেই এই ধরণের আঞ্চলিক সংস্থার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি নিয়েই তারা তাদের বলবৎমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। ডাম্বারটন ওক্স সম্মেলনের তুলনায় সানফ্রান্সিস্কোতে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার স্বীকৃতির অনুকূলে অধিকতর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এতে যে শুধু বৃহৎশক্তিবর্গেরই স্বার্থ ছিল তাই নয়, চাপ সৃষ্টি হয়েছিল কিছু কিছু ছোট ছোট রাষ্ট্রের তরফ থেকে যারা অস্তিত্বমান অথবা প্রস্তাবিত আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার, যেমন আন্তঃ-আমেরিকান ব্যবস্থা, বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ অথবা আরব জোটের (Arab League) সভ্য ছিল। উপরিউক্ত মতের সমর্থকরা শঙ্কিত বোধ করেছিলেন যে নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎশক্তির ভেটো ক্ষমতার ফলে এই সমস্ত আঞ্চলিক সংগঠনের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। সেই জন্যই ডাম্বারটন ওক্সের প্রস্তাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক রাখা হয়েছিল, যার কল্যাণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রু ছিল এমন কোন দেশের বিরুদ্ধে কোন বলবৎ-মূলক পদক্ষেপ গ্রহণে নিরাপত্তা পরিষদের অগ্রিম অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না (53 নম্বর ধারা)। সম্পূর্ণভাবে একটি অভিনব ধারার (51 নম্বর ধারা), যাতে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ নেই, সংযোজনের

ফলে অবস্থা আরও মারাত্মক হয়েছে। এই ধারায় 'আত্মরক্ষার সহজাত অধিকারের' স্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এও স্বীকার করা হয়েছে যে আত্মরক্ষা 'একক'ও হতে পারে 'সমষ্টিগত'ও হতে পারে এবং এর ফলে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা ও কাজ করার পথ সম্পূর্ণভাবে বাধামুক্ত হয়েছে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রসংঘের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কিনা তা যতটা এই দুই ধারণার মধ্যে সঙ্গতি অথবা অসঙ্গতির উপর নির্ভর করে তার চেয়ে বেশী নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলির কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগপদ্ধতির উপর।

অন্য একটি বিষয় সম্পর্কে একই কথা বলা যায়, সনদ ও চার্টারের মধ্যে যেটা প্রথমে পরোক্ষ এবং পরে প্রত্যক্ষভাব প্রকাশ পেয়েছে। চার্টারের 2 নম্বর ধারার 1 নম্বর উপধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, "রাষ্ট্র সংঘ এর সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বগত সাম্যের নীতির উপর ভিত্তিশীল"। 1914 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এটাই ছিল কেন্দ্রীয় ও মৌলিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য সমস্ত নীতির উৎস। অথচ সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মৌলিক নীতিকে যখন রাষ্ট্রসংঘের সংবিধানে স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলো তখন অনেকেই অবাক হয়েছিলেন কারণ ইউরোপের সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যবনিকাপাতই রাষ্ট্রসংঘের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। জঙ্গল ক্ষুদ্র চারণক্ষেত্রকে আচ্ছাদিত করছে কিনা এবং নৈরাজ্য বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার নিয়ম নির্ধারক হবে কিনা রাষ্ট্রসংঘের শত্রু-মিত্র সকলেই নানাভাবে এই প্রশ্ন তুলেছে, কিন্তু সকলেই এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেনি। উত্তর কি হবে বা কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে দ্রুত ও বিবেচনাশূন্য মতবাদই রাষ্ট্রসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ। 'সার্বভৌমত্বগত সাম্যের' নীতিকেই যে জাতিপুঞ্জের ভিত্তি হিসাবে সনদের রচয়িতারা স্বীকার করেছিলেন, সনদের উক্ত নীতির অনুল্লেখই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। পূর্ববর্তী যে কোন জোট থেকে জাতিপুঞ্জ সংস্থা হিসাবে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপকতর ছিল তা সত্ত্বেও তাতে যোগদান করার এবং সদস্যপদ ত্যাগ করার অধিকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের ছিল এবং তারা কখনই মনে করতো না যে সভ্যরাষ্ট্রসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত মত ছাড়া উক্ত সংস্থার কিছু করার ক্ষমতা ছিল। সনদের প্রস্তাবনার একটি বাক্যাংশে এই ধারণাকে নিবন্ধকৃত করা হয়েছিল। তাতে ছিল, 'চুক্তিকারী রাষ্ট্রসমূহ সনদে স্বীকৃতি জানাচ্ছে।' জিমার্ন তাঁর 'লীগ অফ্ নেশান্ অ্যাণ্ড

দি রুল অফ্ ল' পুস্তকে (270 পৃষ্ঠা) অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এর থেকে বোঝা যায় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত, যারা স্বেচ্ছায় এতে স্বাক্ষর করেছে। সর্বোপরি, এটা একটা নৈতিক এবং প্রায় ধর্মীয় চুক্তি। এর দ্বারা তারা কোন নতুন রাষ্ট্র বা সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা গঠন করেনি, একটি নতুন রাজনৈতিক জীবনধারার উদ্দেশ্যে নিজেদের আলাদা আলাদা কর্মক্ষমতাকে পরিচালিত করার পথেই শুধু অগ্রসর হয়েছে।' তিনি আবারও বলেছেন (পৃষ্ঠা 283), 'সহযোগিতার চেতনায় অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রসমূহের একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রে সুবিধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই জাতিপুঞ্জ।' এবং একথা ঠিকই যে সহযোগিতা সমান সমানের মধ্যেই হয়। তাই লীগ পরিষদে এবং লীগসভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল। অন্যকথায় নিজের মতের বিরুদ্ধে কোন সভ্যরাষ্ট্রের উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যেতো না। জাতিপুঞ্জের কর্মপদ্ধতির এই নীতি সার্বভৌমত্বগত সাম্যের উপরে ভিত্তিশীল পুরানো রাষ্ট্র-ব্যবস্থা থেকেই এসেছ।

প্রকৃতপক্ষে, সনদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করায় তারা নিজেদের কাজের স্বাধীনতার উপর সনদজাত বিধিনিষেধ গ্রহণ করেছিল। আনুগত্য গ্রহণ করা অবশ্য স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। তবু এও বলা যায় যে, স্বতঃস্ফূর্ততা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বাধা-নিষেধ মিথ্যা ছিল না। একইভাবে সাম্যের নীতিকেও গোড়া থেকেই খর্ব করা হয়েছিল যাতে (আইনপ্রণেতাদের বক্তব্য যাই ছিল না কেন) ক্ষমতা, জনসংখ্যা ও দায়িত্বের দিক থেকে অসম রাষ্ট্রবহুল বিশ্বে কাজ করতে জাতিপুঞ্জ সমর্থ হয়। সনদে বিশেষ ক্ষমতাসহ বৃহৎ-শক্তিবর্গকে নিয়ে পরিষদ গঠনের মাধ্যমে বাস্তবক্ষেত্রে অসাম্যকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে লীগ সভাতেও উক্ত অসাম্য স্বীকৃতি পেয়েছিল। প্রথম অধিবেশনেই লীগসভা এই রীতি প্রবর্তন করেছিল যে, কোন 'সিদ্ধান্ত'কে 'ইচ্ছা' নামে অভিহিত করলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই তা গ্রহণ করা যাবে এবং বিরোধী সংখ্যালঘিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহকেও তা' মেনে নিতে হবে।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় রাষ্ট্রসংঘ এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ব্যবস্থা বৃহৎশক্তিবর্গের রক্ষা-কবচ, কিন্তু এই কারণেই শুধুমাত্র সাধারণ সভায়ই নয় নিরাপত্তা পরিষদেও বৃহৎশক্তিবর্গ ও অন্যদের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেছে। বৃহৎশক্তিবর্গ

একমত হলে নিরাপত্তা পরিষদ 15 জন সদস্যের মধ্যে 9 জনের সমর্থনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে (আগে ছিল 11 জনের মধ্যে 7 জন)। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়ে উপস্থিত এবং ভোটদানরত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা-গরিষ্ঠের ভোটই যথেষ্ট। তার চেয়েও বড় কথা এই যে, নিরাপত্তা পরিষদকে রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সদস্যদের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দিয়ে পুরাতন ধারণা অনুযায়ী সার্বভৌমত্বকে অনেকটা খর্ব করা হয়েছে, এবং চার্টারের সপ্তম অধ্যায়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্ত সদস্য এই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবে। এই সমস্ত কিছু তখনও পর্য্যন্ত যুদ্ধের বিভীষিকায় আচ্ছন্ন বিশ্ববাসীর সচেতন চিন্তার প্রতিফলন, যাঁরা মনে করেন অস্টিনীয় (Austinian) ধারণায় সার্বভৌমত্ব বলতে আমরা যা' বুঝি তা' অধিকাংশ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই অলীক এবং এখন এও স্পষ্ট হয়েছে যে, সাম্যের নীতি সকল রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য হলেও কিছু কিছু রাষ্ট্রের ব্যাপারে তা' বেশী প্রযোজ্য যা' অন্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না।

এই উক্তি সত্য হলেও চার্টারের 2 নম্বর ধারার প্রথম উপধারায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রসংঘ-এর সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বগত সাম্যের নীতির উপর ভিত্তিশীল।' তাছাড়াও ওই ধারারই সপ্তম অনুচ্ছেদবলে রাষ্ট্রসংঘের উপরে কার্য্যকরী বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে 'কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে' রাষ্ট্রসংঘ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞগণের উদ্ভাবনী শক্তি ও চিন্তার প্রসারতা এই সমস্ত উপাধারার ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়েছে। যেমন তাঁরা বলে থাকেন যে, আন্তর্জাতিক দায় স্বীকার করে কোন রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতাকে খর্ব করে না বরং ওই ধরণের দায় স্বীকার করার মাধ্যমে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের পরিচয়ই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ভাষ্যকারগণ অবশ্য মনে করেন যে এই সমস্ত উপধারার মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন দেখা যায়। এই ধারাগুলি থেকেই বোঝা যায় যে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রসংঘের অস্তিত্বের সাথে নামমাত্র সঙ্গতি রেখে যতদূর সম্ভব বৈদেশিক ক্ষেত্রে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিল। এই সমস্ত উপধারা এবং ঐগুলির মধ্যে মূর্ত্ত চিন্তাধারা রাষ্ট্রসংঘের গতিরোধক যন্ত্র হিসাবে রাখা হয়েছে। ফলে সদস্যরাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রসংঘের কাজকর্ম সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে তার কাজে উল্লেখযোগ্য বাধার সৃষ্টি করে না এবং সন্তুষ্ট না হলে সেই গতিরোধক যন্ত্রকে কড়াকড়িভাবে

প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে না। এই ধরণের উপধারা ও তৎসংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসমূহকে কমবেশী স্বীকার করলেও রাষ্ট্র সংঘকে কিছুতেই গতানুগতিক অর্থে সরকারী ক্ষমতাসম্বলিত সংস্থা হিসাবে স্বীকার করে না।

রাষ্ট্রসংঘের প্রকৃত স্বরূপ তা'হলে কি, এই অধ্যায়ের গোড়ার বক্তব্য থেকে খানিকটা বোঝা যাওয়ার কথা। এটা ঠিক যে রাষ্ট্রসংঘ খানিকটা ক্লাবের মত এবং খানিকটা সরকারের মত হলেও সংগঠন হিসাবে একে বাধাধরা ছকের মধ্যে ফেলা মোটামুটি অসম্ভব। চার্টারে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে এমন একটি কথা থেকে খানিকটা তাৎপর্য্যপূর্ণ হদিস মেলে। সে কথাটি হলো 'সংগঠন' (Organisation)। চার্টারের প্রস্তাবনার উপসংহারে বলা হয়েছে '.... রাষ্ট্রসংঘ নামক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হলো,' এবং মূল চার্টারে এ কথাটিকে আরও চব্বিশবার ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সনদে প্রস্তাবনার উপসংহারে বলা হয়েছিল, '.... সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে স্বীকৃতি জানাচ্ছে' এবং সনদ দৈবাৎ যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যৌথ আইনানুগ ক্ষমতার (Corporate Capacity) উল্লেখ করেছিল তখন একে 'লীগ' (The League) বলেই উল্লেখ করেছিল। যেমন সনদের 7 নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল 'জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর জেনেভায় হবে।' তাছাড়াও, জাতিপুঞ্জের ক্ষমতার উপরে আরোপিত বিধি-নিষেধের দিক থেকে দেখতে গেলে আরও একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রকাশ হয়েছিল 'লীগের সভ্যসমূহ' কথাটি যে বাক্যাংশে ছিল তাতে এই সমস্তের তাৎপর্য্য হলো সনদ ব্যবস্থায় সৃষ্ট সংস্থার উপরে নয়, সৃষ্টিকারী সভ্যরাষ্ট্রসমূহের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। চার্টারের সুর অবশ্য ভিন্ন। যেমন 2 নম্বর ধারার প্রকাশভঙ্গী। এতে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রসংঘ ও এর সভ্যরাষ্ট্রসমূহ যারা 'নিম্নোক্ত নীতিসমূহ অনুসারে কাজ করবে' এবং 'রাষ্ট্রসংঘ' যার কর্তব্য হবে সভ্য নয় এমন সমস্ত রাষ্ট্রও যাতে এই সংগঠনের নীতিসমূহ অনুসারে কাজ করে তার ব্যবস্থা করা।' 4 নম্বর ধারায় যেখানে সভ্যপদের শর্তাবলীর কথা আছে সেখানে 'রাষ্ট্রসংঘের বিবেচনার' কথা আছে। 56 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে চার্টারে বর্ণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য সভ্যরাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রসংঘের সাথে সহযোগিতা করবে বলে অঙ্গীকার করছে, এবং 58 নম্বর ও 59 নম্বর ধারার বক্তব্য অনুসারে 'রাষ্ট্রসংঘ বিশেষজ্ঞ সংস্থা সমূহের কার্য্যাবলীর সমন্বয় সাধনের জন্য এবং নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ সংস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে আলোচনার

উদ্যোগের জন্য সুপারিশ করবে'। 98 নম্বর ধারা অনুসারে মহাসচিব 'রাষ্ট্রসংঘের কাজকর্ম সম্পর্কে' বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং 100 নম্বর ধারা অনুসারে তিনি এবং তাঁর অধস্তন কর্মচারীবৃন্দ 'শুধু রাষ্ট্র সংঘের কাছেই দায়ী থাকবেন।' পরিশেষে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে 105 নম্বর ধারার বক্তব্য অনুসারে রাষ্ট্রসংঘ 'নিজের উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য' 'প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ও দায়মুক্ততা ভোগ করবে।' (সনদে এই ধরণের সুবিধা ও দায়মুক্ততা কেবলমাত্র 'লীগের কর্মচারীগণ' এবং লীগ অথবা তার কর্মচারীবৃন্দের দখলে বাড়ী এবং অন্যান্য সম্পত্তির প্রতিই প্রযোজ্য ছিল)।

চার্টারের ভাষার খুঁটিনাটির উপরে অত্যধিক জোর দেওয়া ঠিক হবে না তার কারণ অত্যন্ত যত্ন সহকারের চার্টারের খসড়া করা হয়েছে বলে শোনা যায় নি। উপরিউক্ত উদাহরণগুলির তাৎপর্য্য যাই হোক্ একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, 'রাষ্ট্রসংঘ' ('The Oganisation') কথাটির মাধ্যমে চার্টার প্রণেতাগণ সুচিন্তিতভাবে বিশেষ কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন। আসলে 'রাষ্ট্রসংঘ' কথাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে গেছে। তবুও একথা সত্য যে, ডাম্বারটন ওক্স ও সানফ্রান্সিস্কোতে প্রতিনিধিবর্গ বর্তমান পৃথিবী সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতা নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন (একথা কিন্তু সনদ রচয়িতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না) যার ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। জাতিপুঞ্জ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হলেও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে নিঃসন্দেহ করে তুলেছিল। সনদভুক্ত সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা সত্বেও জেনেভাতে যে সংস্থা গড়ে উঠেছিল তা' সভ্যরাষ্ট্রগুলির যোগফলের মত অকিঞ্চিৎকর ছিল না, সেটা আরও কিছু বেশী ছিল। একথার সমর্থনে জাতিপুঞ্জের সচিবা-লয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির (যা' সনদের কমসংখ্যক রচয়িতাই ভাবতে পেরেছিলেন) বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণও যে জাতি-পুঞ্জের সচিবালয়ের অগ্রণী ভূমিকার প্রয়োজন সম্পর্কে দ্বিমত ছিলেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে চার্টারের পঞ্চদশ অধ্যায়ে যেখানে রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ের ক্ষমতা ও কার্য্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জাতিপুঞ্জের সচিবালয়ের এই অগ্রগতিকে কেবলমাত্র রক্ষা করাই হয়নি, অন্ততঃ একটি বিষয়ে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে 99 নম্বর ধারার কথা, যেখানে মহাসচিবকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই ধারার বলে মহাসচিব যে কোন বিষয়ের প্রতি—যা তাঁর মতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকে বিঘ্নিত করতে পারে—নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন।' যদিও এই তত্ত্বকে খুব স্ফীত করা ঠিক হবে না তবু এও সত্য যে চার্টারের বলে জন্ম হয়েছে একটি কার্যকরী সংগঠন যেটা সভ্যরাষ্ট্র সমূহের সমষ্টির চেয়ে আরও বেশী অর্থবহ, যেটা কোন নিষ্প্রাণ দেবতা নয় বরং যার নিজস্ব অভিমত আছে, নিজস্ব মানসিকতা আছে এবং নিজস্ব চেতনা আছে।

সংবিধানের বাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে নেপোলীয়ন স্বল্প পরিসরতা এবং দ্ব্যর্থকতার কথা বলেছিলেন। চার্টারের পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে এতে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের অন্ততঃ একটি বেশ ভাল ভাবেই আছে। বৈচিত্র্যময় ও বিপরীতমুখী স্বার্থ, ভয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থান সঙ্কুলান করতে গিয়ে চার্টারের প্রকৃতি যে দ্বার্থক হয়েছে তা স্পষ্ট। মোটের উপর চার্টার একটি বিশ্বসংস্থার দলিল। তাই এর মধ্যে মূর্ত হয়েছে মানবজাতির বিভেদ ও ঐক্য। যদি নৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবধারার দিক থেকে আমেরিকাকে ইউরোপীয় সভ্যতার ধারক হিসাবে ধরা যায় (আসলে তাই ধরা যায়) তবে সনদ বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও মূলতঃ ছিল ইউরোপীয় সৃষ্টি। কিন্তু চার্টার রচনায় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র অংশ নিয়েছিল, বরং একথা বলা যেতে পারে যে এতে ইউরোপের ভূমিকা কমই ছিল কারণ সানফ্রান্সিস্কোতে মোট দশটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র (তখন ইউরোপে চব্বিশটি রাষ্ট্র ছিল) উপস্থিত ছিল, অথচ জাতিপুঞ্জের আদি সভ্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কুড়িটিই ছিই ইউরোপীয়। এমতাবস্থায় যে বিষয়গুলিতে তারা একমত হতে পেরেছিল সেই বিষয় সম্পর্কিত নথিপত্র স্বল্প পরিসর হবে একথা আশা করা যায় না। আসলে অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ করার ছিল। তাই আইনজ্ঞেরা প্রয়োজনানুগ করার জন্যে চার্টারের পরিসর বড় করার দরকার বোধ করেছিলেন। কূটনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদগণ লম্বা একটি চার্টারের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন ভিন্ন কারণে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন একটি ধারায় স্বীকার করা সুযোগ-সুবিধা ক্ষতিকারক হতে পারে একথা মনে করে সেই সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি বন্ধ করার পন্থা হিসাবে আর একটি ধারা যোগ করার প্রয়োজন তাঁদের কেউ কেউ অনুভব করেছিলেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং চাটুকারেরা ভবিষ্যতের জন্য পথ উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। এই ধরণের বিভিন্ন চিন্তাধারার

সমাবেশ অনেক ক্ষেত্রে একই প্রতিনিধির মধ্যে ঘটেছিল। তাই চার্টারের মধ্যে সেই বিভিন্ন চিন্তাধারার স্ফূরণ রোধ করা সম্ভব হয় নি। চার্টারের মধ্যে যে শুধু বিভিন্ন জাতির বিপরীতমুখী আশা-আকাঙ্ক্ষা স্থান পেয়েছে শুধু তাই নয় এর মধ্যে প্রত্যেক আলাদা ব্যক্তি মানসের ভিতরের বিপরীতধর্মী ধ্যান-ধারণার স্থান সঙ্কুলান করতে হয়েছে। ফলে চার্টার দীর্ঘই হয়েছে। তাতে আছে উনিশটি অধ্যায়, 111 টি ধারা এবং 8000-এরও বেশী শব্দ। মার্কিন সংবিধানের পুরোটা পড়তে লর্ড ব্রাইসের 23 মিনিট সময় লেগেছিল। সনদ পড়ে ফেলতে ওই রকমই সময় লাগতো, কিন্তু চার্টার পড়তে গেলে এক ঘণ্টার কমে হবে না। চার্টার সনদের থেকে তিন গুণ বেশী লম্বা হতে পারে তবে পরিসরের ব্যাপকতা উৎকর্ষতার পরিচায়ক হতে পারে না। বরং এর ফলে ভাষাগত অসৌন্দর্য্য, দ্বার্থকতা ও পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাই বেশী থাকে। প্রকৃতপক্ষে, চার্টার ত্রুটি-বিচ্যুতিযুক্ত একটি সংগঠনের খুঁতযুক্ত দলিল। সুতরাং এখানে সমালোচনার সুযোগ ও প্রয়োজন রয়ে গেছে। তবে সর্বাগ্রে রাষ্ট্রসংঘের প্রকৃতি হৃদয়াঙ্গম করার দায়িত্ব আমাদের থেকেই যাচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবর্তনের পথে

চার্টারের অনুসমর্থনের মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘের মূল কাঠামো প্রস্তুতের কাজ সমাধা হলেও সেই কাঠামোতে রক্ত-মাংস লাগানোর কাজ অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছিল। চার্টার-প্রণেতাগণ সেই কাজের ভার 'প্রস্তুতি কমিশনের' (Preparatory Commission) উপর দেন। 1945 খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে দুই পর্য্যায়ে এই কমিশনের বৈঠক হয়.। সানফ্রান্সিসিস্কো সম্মেলনের কার্যকরী সমিতির চৌদ্দটি দেশকে নিয়ে এই প্রস্তুতি কমিশনের একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতি 1945 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট থেকে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত কাজ করে কতকগুলি সুপারিশ প্রস্তুত করে এবং সেগুলি 26শে নভেম্বর ওয়েষ্টমিন্স্টারের 'চার্চ্চ-হাউসে' অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয়। মিঃ গ্ল্যাডওয়াইন জেব্ আগাগোড়া এই প্রস্তুতি কমিশনের কার্যকরী সচিব ছিলেন, অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদলগুলির মধ্যে মার্কিন উপ-প্রতিনিধি—শিকাগোর যুবা আইনবিদ্ (কিছুকালের জন্য সরকারী চাকুরীরত) মিঃ অ্যাড্লাই ষ্টীভেন্সন্ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন মিঃ ফিলিপ নোয়েল-বেকার এবং সোভিয়েত দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মিঃ গ্রোমিকো।

প্রস্তুতি কমিশন যতশীঘ্র সম্ভব সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনবোধ করে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ সভার সম্পূর্ণ কার্যপ্রণালীর এক খসড়া রচনা করে। সাধারণ সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে মোটামুটি সেই কার্যপ্রণালীই গৃহীত হয়। প্রস্তুতি কমিশন নিরাপত্তা পরিষদের জন্যও কার্যপ্রণালীর খসড়া রচনা করে। তবে সামান্য পরিবর্তনসহ সেই কার্যপ্রণালী নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ করে। প্রস্তুতি কমিশন প্রস্তাব করে যে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক প্রকাশ্য হবে এবং তিন রকমের বৈঠক হবে—পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থিরীকৃত সময়ের ব্যবধানে 'নিয়মিত' (regular) বৈঠক; তিনমাস পরে পরে 'পর্যাবৃত্ত' (Periodic) বৈঠক (লীগ পরিষদের বৈঠক বৎসরে চারবার

হতো); এবং প্রয়োজনে সভাপতিকর্তৃক আহূত 'বিশেষ' বৈঠক। বৈঠকের এ ধরণের শ্রেণীবিভাগ শুরু থেকেই অবশ্য টেঁকেনি এবং পরিষদের কাজকর্মেও তা' মানা হয়নি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে উপযোগী করে গড়ে তোলার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুতি কমিশন সুপারিশ করে যে এই পরিষদ প্রথম অধিবেশনেই একটি 'মানবিক অধিকার কমিশন', একটি 'অর্থনৈতিক ও কর্মবিনিয়োগ কমিশন" একটি 'অস্থায়ী সামাজিক কমিশন', একটি 'পরিসংখ্যান কমিশন' এবং একটি 'মাদক ঔষধাদি সম্পর্কিত কমিশন' গঠন করবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এগুলি ছাড়াও আরও কিছু কমিশন গঠন করে। উপরিউক্ত অঙ্গসমূহ যাতে অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করতে পারে সেজন্য প্রস্তুতি কমিশন তাদের জন্য সাময়িক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে।

প্রস্তুতি কমিশনের কাজকর্ম এ পর্য্যন্ত নির্বিবাদে চললেও অছি পরিষদের গঠনের প্রশ্নে তা' আর সম্ভব হয়নি। অছি পরিষদের কেন্দ্রমূলে প্রশাসনিক ক্ষমতাধারী রাষ্ট্রগুলি থাকার জন্য যে ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তা' ছিল মূলতঃ আইনবিদ্দের। প্রশাসনিক রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র সংঘের মধ্যে চুক্তি ব্যতীত কোন অঞ্চলকে অছিভুক্ত করা সম্ভব ছিল না এবং তা' না হলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রশাসনিক রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব ছিল না এবং ফলে অছি পরিষদের গঠনও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আইনের এই ফাঁদে অবশ্য উভয় দলই—উপনিবেশের স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ (সান্ফ্রান্সসিস্কোতেই যা' দেখা গিয়েছিল)—ধরা পড়েছিল। প্রধান বিষয়গুলিতে (যেমন লীগের ম্যাণ্ডেটধারী রাষ্ট্রসমূহকর্তৃক যতশীঘ্র সম্ভব অছি চুক্তি জমা দেওয়ার ব্যাপার) সিদ্ধান্ত শেষ পর্য্যন্ত হলেও বেশীরভাগ সিদ্ধান্তই সংখ্যালঘিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবাদ সত্ত্বেও গৃহীত হয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয় সংক্রান্ত চার্টারের পাঁচটি ধারার সম্প্রসারণের কাজে প্রস্তুতি কমিশনকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। এরজন্য কমিশনকে কিছু সুদূর-প্রসারী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রশ্ন উঠে, রাষ্ট্র-সংঘের সবগুলি অঙ্গের জন্য একটাই সচিবালয় থাকবে (যা সোভিয়েৎ ইউনিয়ন চেয়েছিল), না সবগুলি অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সচিবালয় থাকবে। একটি সুসংবদ্ধ সচিবালয়ের অনুকূলে সিদ্ধান্ত হওয়ায় অবশ্য কাঠামোগত দিক থেকে বিভেদ সৃষ্টিকারী সম্ভাবনা এড়ানো সম্ভব হয়। পাঁচ বৎসরের জন্য মহাসচিব নিয়োগ করার ব্যবস্থার কথা এই কমিশন সুপারিশ করে এবং মহাসচিবের নিয়োগের ব্যাপারে বিতর্ক এড়ানোর

উদ্দেশ্যে সাধারণ সভার বিবেচনার জন্য শুধু একজন পদপ্রার্থীর নাম পেশ করাই নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে বিধেয় হবে বলে মনে করা হয়।

প্রস্তুতি কমিশনের উপরিউক্ত কার্য্যাবলী সম্পাদনে যথেষ্ট মত পার্থক্য হলেও ঝড় উঠেছিল রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী সদর-দপ্তর সম্পর্কে সুপারিশকে কেন্দ্র করে। কার্যকরী সমিতির বেশীরভাগ সদস্য আমেরিকায় রাষ্ট্র-সংঘের সদর-দপ্তর স্থাপনের অনুকূলে মত দিয়েছিলেন। একথা প্রচার হওয়ার সাথে সাথেই ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল এবং তাতে বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠীও যোগ দিয়েছিল। যেসমস্ত দেশ (মূলতঃ ইউরোপীয়) জাতিপুঞ্জের ঐতিহ্যের কথা ভেবে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর জেনেভায় না হলেও ইউরোপের মধ্যে রাখতে চেয়েছিল, সে সমস্ত দেশই প্রস্তুতি কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে কার্য্যকরী সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠের সুপারিশকে বাধা দিয়েছিল। বৃটেন ও ফ্রান্স ছিল ইউরোপের প্রধান মুখপাত্র আর তাদের বিরোধিতা করেছিল সোভিয়েৎ রাশিয়া ও চীন। শেষোক্তদের বক্তব্য ছিল যে, সদর-দপ্তর ইউরোপে রাখলে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বজনীন ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ হবে এবং একটি আঞ্চলিক সংস্থায় পর্য্যবসিত হবে। আমেরিকায় সদর-দপ্তর স্থাপনের অনুকূলে যুক্তির অবতারণা মার্কিন সরকার না করলেও মার্কিন প্রতিনিধি জানিয়েছিলেন যে, আমেরিকায় সদর-দপ্তর স্থাপনের অনুকূলে সিদ্ধান্ত হলে সে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হবে। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেস আরও একধাপ এগিয়ে আমেরিকায় উক্ত সদর-দপ্তর স্থাপনের জন্য আবেদন জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে নিজেদের শহরকে বিশ্বসংস্থার কেন্দ্রভূমি ভেবে শিকাগোর মেয়র, কেলি থেকে শুরু করে শুধু সান্‌ফ্র্যান্সিসস্কো থেকেই নয়, ফিলাডেলফিয়া, বোষ্টন, সেণ্ট লুই, ডেন্‌ভার এবং মিয়ামি থেকেও প্রতিনিধিদল লণ্ডনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। নেভীআয়ল্যাণ্ড, নায়াগ্রা, হাইড্‌পার্ক (ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের জন্মভূমি) ও জেণ্ট্রিভিলের (লিঙ্কনের প্রদেশ) কথা বলাই বাহুল্য। ওয়াইওমিঙ্‌, নেব্রাস্কা ও সাউথ ডাকোটার সীমানার মধ্যবর্তী ব্ল্যাকহিলে রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তর স্থাপনের আবেদন নিয়ে উক্ত তিন মার্কিন প্রদেশের পক্ষ থেকেও যৌথ প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছিল। হেগ্‌, ভিয়েনা, প্রাগ্‌ প্রভৃতি ইউরোপীয় শহরের অনুকূলেই শুধু নয়, তাঞ্জিয়ার এবং জেরুজালেমের অনুকূলেও প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে এই সমস্ত প্রস্তাবের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া

যায়নি। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে বিতর্কে প্রধান যুক্তি ছিল দুটি। ইউরোপের অনুকূলে বক্তব্য ছিল যে ইউরোপই ছিল গণ্ডগোলের কেন্দ্রস্থল এবং সেখানেই উভয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। সুতরাং সেখানেই শান্তিরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসংঘকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যপক্ষে যুক্তি ছিল এই যে মার্কিনীদের নিঃসঙ্গ জীবনে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত করার জন্যই আমেরিকায় রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তর স্থাপন করা উচিত। কিন্তু এই উভয়যুক্তির পিছনে অবশ্য ছিল শক্তি এবং গৌরবের এক দ্বন্দ্ব। ইউরোপীয়রা চেয়েছিল ইউরোপকেন্দ্রিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতীককে নিজ মহাদেশে রাখতে, আর আমেরিকানরা অভিনন্দন জানিয়েছিল তাদেরই গগনতলে এক নূতন যুগের উষালগ্নের উন্মেষকে।

শেষ পর্য্যন্ত 15-ই ডিসেম্বর নাগাদ প্রস্তুতি কমিশনের সংশ্লিষ্ট সমিতি 30—14 ভোটে (ছয়জন প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত ছিলেন) আমেরিকায় স্থান নির্বাচনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের কথা হয়। পরে বোষ্টন অথবা নিউইয়র্কের আশে-পাশে স্থান নির্বাচনের জন্য সাতজনের একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। মাসখানেক ঘোরাফেরা করার পর এইদল নিউইয়র্কের কাছে 42 বর্গ-মাইল বিশিষ্ট এক এলাকা নির্বাচন করেন। কিন্তু উক্ত অঞ্চলের ক্ষমতা-সম্পন্ন বিত্তবান চাষীদের মুখর প্রতিবাদের ফলে সাধারণ সভা বিকল্প স্থান নির্বাচনের জন্য উক্ত প্রতিনিধিদলকে (তখন নয়জন সদস্য বিশিষ্ট) নির্দেশ দেয়।

নিউইয়র্ক শহরে রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সদর-দপ্তর প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সেখানে তখন প্রচণ্ড স্থানাভাব। শেষ পর্য্যন্ত ব্রংক্সে অবস্থিত হাণ্টার কলেজের (মহিলাদের) এক বাড়ী পাওয়া যায়। কিন্তু আগষ্ট মাসের মধ্যেই আবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়। এবার লঙ্ আয়ল্যাণ্ডে। রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তর চার বৎসর এখানে ছিল।

এর মধ্যে নতুন করে স্থান নির্বাচনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বরং সদর-দপ্তর ইউরোপে নিয়ে যাওয়ার জন্য সোভিয়েৎ সরকার এক প্রস্তাব করেছিল। সাধারণ সভা ফিলাডেলফিয়া, সান-ফ্রান্সিসস্কো, বোষ্টন ও নিউইয়র্ক আবার ঘুরে দেখার জন্য আরেক প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ দল সানফ্রান্সিস্কোর অনুকূলে জোরালো সুপারিশ করলে সোভিয়েৎ সরকার এত দূরে গিয়ে বৈঠকে

যোগদান না করার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। বৃটিশ সরকার মত দেয় ফিলাডেলফিয়ার সপক্ষে এবং মার্কিন সরকার সানফ্রান্সিস্কোর সপক্ষে সমর্থন প্রত্যাহার করে জানায় যে, আমেরিকার পূর্ব উপকূলে রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই পর্যায়ে যখন সদর-দপ্তরের স্থান নির্ধারণ নিয়ে কোন ঐক্যমত হয়নি, যখন বছর খানেকের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ায় পরিবেশ উত্তপ্ত, তখন নিউইয়র্ক শহর বাজীমাত করে। সরকারী প্রচেষ্টা যেখানে ব্যর্থ, সেখানে বেসরকারী পর্য্যায়ে লোকহিতকর পদক্ষেপ (যা' মার্কিন বৈশিষ্ট্য) সমস্ত বিঘ্ন ও সংশয়ের অবসান ঘটিয়েছিল। সেনেট-সদস্য ওয়ারেন অষ্টিন্ মিঃ জন ডি. রকফেলারের (জুনিয়র) কাছ থেকে পাওয়া এক চিঠি ডিসেম্বরের 11 তারিখে সদর-দপ্তর সম্পর্কিত সমিতির সদস্যদের সামনে পড়ে তাঁদের হতচকিত করে দিয়েছিলেন। উক্ত চিঠিতে মিঃ রক্‌ফেলারের রাষ্ট্রসংঘকে সাড়ে আট মিলিয়ন ডলার দান করার ইচ্ছার কথা জানান, যা' দিয়ে ম্যানহাটানের কেন্দ্রে অবস্থিত (ইষ্ট্ রিভারের টার্টল্ বে' নামক স্থানে) 42 তম এবং 48 তম রাস্তার মধ্যবর্তী ছয়খণ্ড জমি (সেখানের বস্তি ও কষাইখানা তুলে দিলে বাড়ী করার জন্য 17 একর জমি পাওয়ার কথা) কেনার কথা উল্লিখিত ছিল। সাধারণ সভার পূর্বের কল্পনার সাথে এই চিঠির মিল ছিল না; এটা ছিল সম্পূর্ণ শহর অঞ্চল, অথচ রাষ্ট্রসংঘ চেয়েছিল মফঃস্বল এলাকা; এলাকা হিসাবে এটা ছিল ছোট অথচ রাষ্ট্রসংঘ চেয়েছিল যথেষ্ট পরিসরযুক্ত এলাকা; এবং আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়া দূরের কথা, ওখানে রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তরের মার্কিন পরিবেশের শিকার হওয়ার ভয় সম্পূর্ণভাবেই ছিল। কিন্তু ভাবনার অন্যদিকও ছিল। ওখানে অন্ততঃ রাষ্ট্রসংঘ তার সদরদপ্তরের জন্য নিউইয়র্ক শহরের মধ্যে বাড়ী পাবে এবং নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘ তখনই অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সংশ্লিষ্ট জমির নামমাত্র পরিদর্শনের পর সাধারণ সভা 14-ই ডিসেম্বর 46-7 ভোটে উক্ত দান গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

রক্‌ফেলার সেণ্টারের স্থপতি মিঃ ওয়ালেস হ্যারিসন সদর-দপ্তর তৈরীর পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তাঁর সাথে এক আন্তর্জাতিক স্থপতিদলের অপ্রত্যাশিত সহযোগিতার ফলে 1947 খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি বাড়ীর জন্য সাড়ে ছয় কোটি ডলারের (পরে বাড়িয়ে তা' 6·8 কোটি ডলার করা হয়েছিল) এক

পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়। মার্কিন সরকার বিনাসুদে ঐ টাকা ঋণ দিতে স্বীকৃত হয়। অবশ্য মার্কিণ কংগ্রেস উক্ত ঋণ অনুমোদন করে 1948 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। 1948 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টম্বর মাসে কাজ শুরু হয় এবং 1952 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে বাড়ীর তৈরীর শেষ পর্য্যায়, অর্থাৎ সাধারণ সভা ভবন সম্পূর্ণ হয়। (তার পরে অবশ্য মিঃ হ্যামারস্কশোল্ডের নামে ফোর্ড ফাউণ্ডেশানকর্তৃক প্রদত্ত লাইব্রেরী ভবন যুক্ত হয়)। রাষ্ট্রসংঘের 'পাকাপাকি' সদর-দপ্তর সম্পর্কে অবশ্য মত-পার্থক্য হয়েছে। এ কথা ঠিক যে কাজের দিক থেকে পর্য্যাপ্ত না হলেও গগনচুম্বী দুই সৌধযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ ভবনের আকর্ষণ কম নয়। তবে এও ঠিক যে রাষ্ট্রসংঘের কাজ যতই বাড়ছে সচিবালয় ততই স্থানাভাবে ভুগ্‌ছে।

রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যক্রমের ইতিহাস বিবৃত করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। তবে এর প্রকৃতি ও বর্তমান কার্য্যধারা সম্পর্কে জানতে গেলে 1948 খ্রীষ্টাব্দ থেকে রাষ্ট্রসংঘ ও এর সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ যে সমস্ত পরিবর্তন এই সংস্থা সম্পর্কিত প্রারম্ভিক চিন্তা-ধারায় এসেছে, সেগুলি সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। সান্‌ফ্রান্সিস্কোর আশা-আকাঙ্ক্ষা যে স্বপ্ন ছিল তা শীঘ্রই বোঝা গিয়েছিল। 1946 খ্রীষ্টাব্দের 10-ই জানুয়ারী ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের সেন্ট্রাল হলে সাধারণ সভার প্রথম অধিবেশনেই পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের (Foreign Ministers' Conference) বিফলতার ছায়াপাত ঘটেছিল। যদিও রাষ্ট্র-সংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণ মূল সংস্থাকে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন, তবুও একথা অনস্বীকার্য্য যে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যের বিভেদের প্রতিক্রিয়া সর্বতোভাবে এড়ানো সম্ভব হয়নি। সাধারণ সভার সভাপতিপদ নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দ্বন্দের মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উক্ত পদের জন্য নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ট্রিগ্‌ভি লাইয়ের নাম মিঃ গ্রোমিকো হঠাৎ প্রস্তাব করায় অনেকেই অবাক হয়েছিলেন, কারণ অনেকে বেলজিয়ামের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ স্পাক্‌কে অধিকতর ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলে ধরে নিয়েছিলেন। তীব্র মতবিভেদ সত্ত্বেও (28-23 ভোটে) মিঃ স্পাক্ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন এবং মহাসচিবের পদে পাশ্চাত্যের দেশগুলি এম. ফ্যান্ ক্লিফেন্স অথবা মিঃ লেষ্টার পিয়ারসনকে বেশী পছন্দ করলেও কোনও বৃহৎশক্তিই মিঃ লাই-এর বিরোধিতা করেনি বলে তিনিই

মহাসচিব হয়েছিলেন। মিঃ লাই-এর নির্বাচনে কোন বৃহৎশক্তির নাগরিকের মহাসচিবের পদাভিষিক্ত না হওয়ার নজির সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ সহ-মহাসচিবের (পরে অধস্তন মহাসচিব) আটটি পদের পাঁচটিই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল।

একথা অবশ্য বলা যেতে পারে যে, উপরিউক্ত ধরণের বিভেদ সংগঠন-জনিত বলে এড়ানো প্রায় অসম্ভব ছিল। তবে এটাও শীঘ্রই বোঝা গিয়েছিল যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাত রূঢ় বাস্তবের সাথে জড়িত ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রথম অভিযোগ আসে ইরাণের কাছ থেকে (1946 খ্রীষ্টাব্দের 19শে জানুয়ারী) সোভিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। ইরাণের আভ্যন্তরীন বিষয়ে সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপ ও ইরাণ থেকে সোভিয়েৎ সৈন্য প্রত্যাহার করায় অস্বীকার করার জন্য। গ্রীসের আভ্যন্তরীন বিষয়ে বৃটিশ সৈন্যের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন (যেন প্রতিশোধের জন্যই) অভিযোগ করে ঠিক দুদিন পরে। সাথে সাথেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, বৃহৎশক্তিবর্গের মধ্যে বিভেদের শিকর রাষ্ট্রসংঘের মর্মমূলে প্রবেশ করেছে এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের সম্ভাব্য ঐক্যের উপর চার্টারপ্রণেতাগণ যে আশা পোষণ করেছিলেন তা ফলবতী হওয়ার নয়। কয়েকদিন পরে লিবিয়া ও লেবানন থেকে ফরাসী সৈন্য অপসারণের প্রশ্নে যখন গোলযোগ দেখা দেয় এবং সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ করে (যদিও সোভিয়েৎ স্বার্থ এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না) তখন রাষ্ট্রসংঘের উপর বৃহৎশক্তিবর্গের বিভেদের অশুভ প্রভাব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

এ সমস্ত বিবাদ অবশ্য মিটেছে। তবে 'ইরাণের প্রশ্ন' নিরাপত্তা পরিষদের কর্মসূচীতে দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও রয়ে গেছে (রাষ্ট্রসংঘের উপরের এবং ভিতরের পার্থক্যের উদাহরণ স্বরূপ 'ইরাণের প্রশ্ন' উল্লেখযোগ্য)। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে উপরিউক্ত বিভেদসমূহ সাধারণ সভার কার্য্যকলাপকে দূষিত করেনি। প্রস্তুতি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে গঠনের কাজ সমাধা হওয়ার পর সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে ছয়টি রাষ্ট্রকে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য হিসাবে আঠারোটি রাষ্ট্রকে, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পনেরজন বিচারপতিকে নির্বাচিত করে এবং আনবিক

শক্তি কমিশন গঠন করে। 15-ই ফেব্রুয়ারী বৈঠক স্থগিত রেখে প্রথম সাধারণ সভা নিউইয়র্কের কাছে 'ফ্লাশিং মিডোর' অস্থায়ী আবাসে 23 শে অক্টোবর আবার মিলিত হয়। তখনই অছি পরিষদের সৃষ্টি হয় এবং চারটি দেশকে রাষ্ট্রসংঘের সভ্যপদে গ্রহণ করা হয়। সাধারণ সভার আলোচনায় হৃদ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ থাকলেও নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যকারিতার স্বার্থে এর স্থায়ী সদস্যদের কাছে যখন তখন ভেটো প্রয়োগ না করার আবেদন জানিয়ে গৃহীত এক প্রস্তাবের মাধ্যমে সাধারণ সভা রাষ্ট্রসংঘের সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। ফলে প্রশ্ন উঠে নিরাপত্তা পরিষদের নৈতিক দায়িত্ব সাধারণ সভার অনুরোধে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কি না।

ন্যূনতম অর্থেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি কারণ পরবর্তী বৎসর গ্রীসের সাথে তার সমাজতান্ত্রিক শরিকদের বিবাদের প্রশ্নে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের ঘন ঘন ভেটো প্রয়োগের মোকাবিলা করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের বৃহৎশক্তিবর্গ যে কৌশল অবলম্বন করে তা' আক্ষরিক অর্থে চার্টারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও চার্টার-নিহিত মৌলিক ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী ছিল। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মার্শাল প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু সোভিয়েৎ ভেটোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদ তার কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করতে পারছে না, সুতরাং সে সমস্যা সমাধানকল্পে সাধারণ সভার ভূমিকার কিছু রদবদল করা দরকার। এই মার্কিন প্রস্তাব অনুসারে 1947 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে সাধারণ সভাকর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবের ফলে "অন্তর্বর্তীকালীন সমিতি" (Interim Committee অথবা Little Assembly) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের মত এই সমিতিরও (যখন সাধারণ সভার অধিবেশন চলছে না) আহ্বানমাত্র অধিবেশন বসার কথা। নিরাপত্তা পরিষদের মত শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকলেও সাধারণ সভাকর্তৃক পেশ করা যে কোন বিষয় (বিশেষ করে কোন বিবাদ বা পরিস্থিতি যা' সাধারণ সভার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব হয়েছে) নিয়ে এই সমিতির আলোচনা করার কথা ছিল।

কিন্তু আসলে দেখা গিয়েছিল যে, অচলাবস্থার থেকে মুক্তির উপায় হওয়ার পরিবর্তে এই 'অন্তর্বর্তীকালীন সমিতি' ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সমিতি পরিকল্পনা মাফিক কাজ করেনি এবং শুধুমাত্র প্রণালীগত ও সুদূরপ্রসারী কিছু প্রশ্নে সামান্য কয়েকটি সুপারিশ

করেছিল। বাস্তবে অন্তর্বর্তীকালীন সভা হিসাবে এ কখনই কাজ করেনি এবং মাঝে মাঝে এর পুনর্গঠন করা হলেও উত্তরোত্তর এর কাজ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 1955 খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই সমিতির বৈঠক অনির্দিষ্ট-কালের জন্য স্থগিত আছে।

ঐ বৎসরই (1947) প্যালেষ্টাইনে 'ম্যাণ্ডেটের' ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য এক বৃটিশ প্রস্তাব অনুসারে সাধারণ সভার এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হলে ভিন্ন প্রকারে সাধারণ সভার খানিকটা মর্য্যাদা বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। তবে গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পরিবর্তে সাধারণ সভাকে জড়িত করার প্রস্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা গেলেও এর ফলে চার্টারের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের জন্য সংরক্ষিত সে বিষয়ে সাধারণ সভাকে জড়িত করার এক নজির সৃষ্টি হয়।

বাস্তবে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও পশ্চিমি দেশগুলির ক্রমবর্ধমান বিভেদের শিকার না হয়ে নিরাপত্তা পরিষদের উপায় ছিল না। 1948 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে "ব্রাসেলস্ সংস্থা" (Brussels Treaty Organisation) প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রাসেলস্ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটা হয় চেকোশ্লোভাকিয়ায় কম্যুনিষ্ট উত্থানের সাথে সাথে এবং ব্রাসেলস্ চুক্তির পরই আসে বার্লিন অবরোধ (Berlin Blockade)। 26শে জুলাই নিরস্ত্রীকরণ কমিশন অচলাবস্থার কথা জানায়, এবং 10-ই আগষ্ট সামরিক উপদেষ্টা মণ্ডলীর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরে স্বভাবিকভাবেই কেউ অবাক হয়নি। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের দেয় সৈন্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর অসামর্থ্য পরিষদকে 1947 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলেই জানানো হয়েছিল। সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর বিফলতায় নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে আর যাই সম্ভব হোক না কেন চার্টার অর্পিত শান্তিরক্ষার কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। অতএব বৃহৎশক্তিবর্গের ঐক্যের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকার অবকাশ ছিল না বললেই হয়। নিরাপত্তা পরিষদ ভেঙ্গে না গেলেও এর বৈকল্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সাধারণ সভায় সদস্যরাষ্ট্রসমূহের কিছু রাশিয়ার, কিছু আমেরিকার পক্ষাবলম্বন করে এবং কিছু নিরপেক্ষ থেকে যায়। তবে মজার কথা এই যে, বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়লেও এবং কিছু কিছু বিষয়ে অকেজো হয়ে পড়লেও রাষ্ট্রসংঘ ভেঙ্গে যায়নি।

রাষ্ট্রসংঘের যখন এই অবস্থা, তখন (1950) একে এর নাতিদীর্ঘ

অস্তিত্বের সবচেয়ে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন মাঞ্চুরিয়া ও ইথিওপিয়ার প্রশ্নে জাতিপুঞ্জকে হতে হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধিকে (যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সরকারই চীনের জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিভূ) নিরাপত্তা পরিষদ থেকে অপসারণ করার সোভিয়েৎ প্রস্তাব দিয়ে 1950 খ্রীষ্টাব্দ শুরু হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় সোভিয়েৎ ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদসহ রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত অঙ্গে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। যখন এই অবস্থা, তখন (25শে জুন) সিউলে অবস্থিত রাষ্ট্রসংঘের কোরিয়া কমিশন থেকে উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের খবর আসে। সাথে সাথেই পরিষদের বৈঠক বসে এবং মার্কিন প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত আক্রমণকে শান্তিভঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়, অনতিবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে, আক্রমণকারী সৈন্য প্রত্যাহার করতে এবং এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রকে সাহায্য করতে বলা হয়। আক্রমণ চলতে থাকার এবং কোরিয় বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে দু'দিন পরে নিরাপত্তা পরিষদের আবার বৈঠক হয়, এবং পরিষদকে জানানো হয় যে 25শে জুনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিন সেনাবাহিনীকে দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিরাপত্তা পরিষদ তখন আমেরিকার দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং এই প্রস্তাব অনুসারে (যেহেতু 43 নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে কোন বাহিনী গঠন করা সম্ভব হয়নি এবং যেহেতু সুপারিশ ছাড়া নিরাপত্তা পরিদের কিছুই করার ছিল না) আক্রমণ প্রতিহত করে কোরিয়ায় শান্তি পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সভ্যরাষ্ট্রসমূহকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে সুপারিশ করা হয়। বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ক্যানাডা সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যবাহিনী দেয় (তুরস্ক ও ফ্রান্সসহ আরও ষোলটি দেশ পরে সৈন্যবাহিনী দেয় এবং সর্বসাকুল্যে 45-টি দেশ কোন না কোন প্রকারের সাহায্য দেয়), এবং 7ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ ঠিক করে যে, সমস্ত সৈন্যবাহিনী এক সামরিক কর্তৃত্বাধীনে থাকবে এবং মার্কিন সরকার সর্বোচ্চ অধিনায়ককে নিযুক্ত করবে। পরের দিন জেনারেল ম্যাক্‌আর্থারকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়।

এই সমস্ত দ্রুত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিরাপত্তা পরিষদকে কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি এবং চার্টারের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ খানিকটা আশ্চর্যজনকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকারীর

ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। রাষ্ট্রসংঘ সঙ্গতভাবেই দাবী করতে পারে যে, এক্ষেত্রে সভ্যরাষ্ট্রসমূহের ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে আক্রমণের যথার্থভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল (যা লীগ পারেনি)। যদিও আমেরিকার দৃঢ়তার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল, তবুও রাষ্ট্রসংঘও প্রশংসার দাবী রাখে। তবে এও ঠিক যে নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েৎ প্রতিনিধির অনুপস্থিতির জন্যই মার্কিন নেতৃত্ব সম্ভব হয়েছিল এবং পরিষদকেও সোভিয়েৎ ভেটোর শিকার হতে হয়নি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আগষ্ট মাসে যখন মিঃ মালিক ফিরে এসে পরিষদের সভাপতির পদ (পালাক্রমে মিঃ মালিকের সভাপতি হওয়ার সময় হয়েছিল) গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি একমাস ধরে পরিষদের কাজকর্ম ব্যাহত করার জন্য সভাপতি পদের পুরোপুরি ব্যবহার করেন। সেপ্টেম্বর মাসেও অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব হয়নি কারণ মিঃ মালিকের সভাপতিত্ব যতখানি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ছিল, ভেটো ক্ষমতা তার চেয়ে কম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ছিল না।

এর ফলে অক্টোবর মাসে কোরিয়ায় সৈন্য প্রেরণকারী দেশসমূহ (Sanctionist Powers) "অখণ্ড, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক কোরিয়ার" অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং "কোরিয়ায় পুনর্বাসন কমিশন" গঠন করেই যে সাধারণ সভাকে কাজে লাগিয়েছিল শুধু তাই নয়, সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্য সাধারণ সভাকে নূতন ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য মার্কিন সরকার প্রস্তাবও এনেছিল। এটাই হলো "অ্যাচিসন্ প্রস্তাব" অথবা "শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব" (Uniting for Peace Resolution) এবং নভেম্বরের দুই তারিখে এই প্রস্তাব 52-5-2 ভোটে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায় সমূহে করা হয়েছে। এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে বিফলতায় পর্য্যবসিত পূর্বের "লিট্‌ল্ অ্যাসেম্‌ব্লী"র মত এই প্রস্তাবও ভেটো-কবলিত নিরাপত্তা পরিষদের অক্ষমতাজনিত সমস্যা সমাধানের আশা নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে এই প্রস্তাব ছিল পরিষদের অক্ষতার নিদর্শন। অন্যদিকে থেকে দেখতে গেলে এর মাধ্যমে রাষ্ট্র-সংঘের মুখ্য অঙ্গদ্বয়ের মধ্যে ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ পুনর্বিন্যাস করে চার্টারের সুদূরপ্রসারী সংশোধন করা হয়েছিল।

কতকগুলি ঘটনার (যেগুলির সমন্বয়ের ফলে জুনমাসে রাষ্ট্র সংঘের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল) স্বীকৃতি থেকেই "শান্তির জন্য

ঐক্য প্রস্তাবের” উদ্ভব। তৎপর মার্কিন নেতৃত্ব ছাড়াও সেগুলি হলো :—

(1) ঘটনাস্থলে রাষ্ট্রসংঘের অবস্থিতি (রাষ্ট্রসংঘের কোরিয়া কমিশনের মাধ্যমে), যার ফলে আক্রমণ ঘটা সম্পর্কে ত্বরান্বিত, দ্বিধাহীন এবং সরকারী পর্য্যায়ের প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

(2) প্রায় ঘটনাস্থলেই মার্কিন বাহিনীর অবস্থিতি যার সাহায্যের (যথেষ্ট না হলেও) ফলে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিল।

(3) শুধু উত্তর কোরিয়ারই নয় (উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্য ছিল না), তার সমর্থক সোভিয়েৎ ইউনিয়নের নিরাপত্তা পরিষদে অনুপস্থিতি।

যথাসম্ভব এই ধরনের অনুকূল পরিস্থিতি বজায় রাখার দিকে লক্ষ্য রেখে সাধারণ সভাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অধিবেশনে মিলিত হওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল (যদি শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হয়), আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন করতে পারে পৃথিবীর যে কোন স্থানে এমন কোন পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখা এবং সে সম্পর্কে প্রতিবেদন করার জন্য এক ‘শান্তি পরিদর্শন কমিশন’ (Peace Observation Commission) হয়েছিল, এবং (সামরিক উপদেষ্টা-মণ্ডলীর কর্তৃত্বাধীনে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর পরিবর্তে) রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী হিসাবে ব্যবহারের জন্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে তাদের নিজেদের সেনাবাহিনীর কিছু কিছু অংশকে প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছিল। নিরাপত্তা পরিষদ ভেটো-কবলিত হলে সাধারণ সভার পক্ষে এর ফলেই অগ্রসর হওয়া, এর ফলেই বলবৎমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা (যদিও লীগের মত এক্ষেত্রেও সভ্যরাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাধীন পদক্ষেপের বলেই তা’ সম্ভব ছিল), সর্বোপরি, এর ফলেই আক্রমণ বা শান্তিভঙ্গের অভিযোগের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রমাণ সংগ্রহ করার উপায় হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের স্বকীয় স্থায়ী পরিদর্শক বাহিনীর ব্যবস্থাও সম্ভব ছিল।

এই প্রস্তাবের সমস্ত অংশকে সমানভাবে বলবৎ করা হয়নি। ‘শান্তি পরিদর্শন কমিশন’ স্থাপিত হলেও এবং একবার সেটাকে কাজে লাগানো হলেও (1952 খ্রীষ্টাব্দে বলকানের ক্ষেত্রে) সর্বব্যাপী এক বিশ্বজনীন পরিদর্শকের ভূমিকায় এই কমিশন এর প্রণেতাদের আশাপূরণ করতে পারেনি। তদনুরূপভাবে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী গঠনকল্পে সদস্যরাষ্ট্রসমূহ-

কর্তৃক তাদের সেনাবাহিনীর কিছু কিছু অংশকে প্রদান করার আহ্বানেও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়নি। সাধারণ সাহায্যের নামে অস্পষ্ট ভাষায় অঙ্গীকার করা এই আহ্বান এড়ানোর কায়দা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রস্তাবের একটা দিক যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল, সেটা হলো সহজেই কোন বিষয় সাধারণ সভার হাতে তুলে দেওয়া। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন একে অবৈধ বলে আপত্তি তুললেও সাধারণ সভা এপথে অনেকটা এগিয়েছিল। চার্টারের ফাঁকের সুযোগ নিয়ে (যেমন 10 নম্বর ধারা অনুসারে সাধারণ সভা চার্টারের এক্তিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করতে পারে) অবশ্য এটা করা হয়নি। এর স্বপক্ষে যুক্তি ছিল লিঙ্কনের হেবিয়াস করপাস্ (Habeas Corpus) ভঙ্গের যুক্তির মত, অর্থাৎ, 'একটা বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত আইন ভাঙার সুযোগ দেওয়া উচিত, অথবা একটা আইন রক্ষা করে সরকারের বিলুপ্তির পথ খুলে দেওয়া উচিত।'

যদিও রাষ্ট্রসংঘের যে কোন শুভানুধ্যায়ী স্বীকার করবেন যে, কোরিয়া পরিস্থিতির মোকাবিলা রাষ্ট্রসংঘ দৃঢ়তার সাথেই করেছিল, তবুও সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীতে অচলাবস্থার জন্য এবং নিরাপত্তা পরিষদে ভেটোর জন্য সৈন্য পরিচালনা সম্পর্কে এবং বিভিন্ন সভ্যরাষ্ট্রের দেওয়া সাহায্যের সমন্বয়সাধন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু করা রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রসংঘকে অবহিত রাখলেও সৈন্যপ্রদানকারী পনেরটি দেশের সাথে অল্প-বিস্তর বোঝাপড়া করে বস্তুতঃ মার্কিন সরকারই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। সঙ্গতভাবেই অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং কোরীয় ও মার্কিন জনসাধারণসহ সারা বিশ্বের জনসাধারণের এ ধারণাই হয়েছিল যে কোরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের নাম করে আমেরিকাই যুদ্ধ করেছিল। এ অভিযোগ সত্য হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, উত্তর কোরিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল কিছু দেশ রাষ্ট্রসংঘে থাকার জন্য এছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কোরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের সামরিক ব্যবস্থাপনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদানের উপর প্রায় সর্বাংশে নির্ভরশীল ছিল বলে সামান্যই করার ছিল।

কোরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থা গ্রহণ সোভিয়েৎ ইউনিয়নের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও সোভিয়েৎ সরকার তার সমস্ত সামরিক ও কূটনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে রাষ্ট্রসংঘের বিরোধিতা করেনি। যুদ্ধ সম্প্রসারিত হওয়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি থাকলেও উত্তর কোরিয়া ক্ষুদ্র শক্তি বলে (ট্রুম্যানের মতে) এই

"পুলিশী ব্যবস্থা" (Police operation) সীমিত রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে চীন উত্তর কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তখন এক বৃহৎশক্তির বিরুদ্ধে এবং বৃহত্তর এলাকা জুড়ে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘবাহিনীতে সৈন্যপ্রদানকারী রাষ্ট্রসমূহের শঙ্কিত না হয়ে উপায় ছিল না। এবং রাষ্ট্রসংঘও (যেহেতু কোরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘেরবাহিনীর উপর বস্তুতঃ রাষ্ট্রসংঘের হাতে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না) শান্তিবলবৎমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে গোলাগুলি বন্ধেই বেশী আগ্রহী হয়ে পড়েছিল।

জেনারেল ম্যাক্‌আর্থার যতদিন পর্য্যন্ত কোরিয়ায় সর্বাধিনায়ক ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত 'সীমিত লক্ষ্য' (limited objective) ও আলোচনাপ্রসূত মীমাংসার উদ্দেশ্যে পুরোপুরি মার্কিন সহযোগিতার আশা নিরর্থক ছিল। কিন্তু 1951 খ্রীষ্টাব্দের 11-ই এপ্রিল তাঁর অপসারণের পরে মার্কিন চিন্তাধারায় পরিবর্তনের ফলে এবং চীনের আপোষ বিরোধী মনোভাব নরম হওয়ায় 1953 খ্রীষ্টাব্দের 27শে জুলাই পান্‌মুঞ্জনে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য সেই যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে শান্তি চুক্তিতে রূপান্তরিত করার রাষ্ট্রসংঘের ভিতরের এবং বাইরের (যেমন 1954 খ্রীষ্টাব্দে জেনেভায় অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন) সমস্ত প্রচেষ্টা আজ পর্য্যন্ত ব্যর্থই হয়েছে। অতএব রাষ্ট্রসংঘের দিক থেকে দেখতে গেলে কোরিয়া পর্বের প্রথমভাগের সাফল্য শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। অবশ্য একথা ঠিক যে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী এক অখণ্ড, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক কোরিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হলেও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রসংঘ আক্রমণ প্রতিহত করে আক্রমণকারীকে পিছু হঠ্‌তে বাধ্য করতে পারে।

সাংবিধানিক দিক থেকে দেখতে গেলে কোরিয়া যুদ্ধের ছাপ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য অঙ্গের উপরও পড়েছে। সোভিয়েৎ সরকার অভিযোগ করেছিল যে, মহাসচিব আগাগোড়া বৃটিশ ও মার্কিনদের ক্রীড়ণক হয়ে কাজ করেছিলেন। এর কারণও ছিল। মহাসচিব নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, যৌথ নিরাপত্তার নীতি বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে এবং সচিবালয়কে নিয়োজিত করেছিলেন। তাছাড়াও পরবর্তীকালে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভাকর্তৃক গৃহীত উত্তর কোরিয়া বিরোধী প্রস্তাবসমূহ রূপায়িত করায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সোভিয়েৎ সরকার ও তার সমর্থকগণের কাছে "শান্তির জন্য ঐক্য চুক্তি"সহ

এই সমস্ত প্রস্তাব অবৈধ ছিল বলে তারা মহাসচিবের কার্যকলাপকেও বৈধ বলে স্বীকার করেনি। 1951 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে মহাসচিবের কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার প্রাক্কালে সোভিয়েৎ সরকার নিরাপত্তা পরিষদে তাঁর পুনর্মনোনয়নের প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করে। 'রাষ্ট্রসংঘের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য মহাসচিব শাস্তি পেতে পারেন না', এই নীতি অনুসরণ করে মার্কিন প্রতিনিধি অন্য যে কোন ব্যক্তির মনোনয়নে ভেটো দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সাংবিধানিক ফাঁকের আশ্রয় নিয়ে এই অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠা গিয়েছিল। মিঃ লাইকে পুনরায় মনোনয়ন দেওয়া হয়নি (কারণ তাতে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ দরকার), তবে সাধারণ সভায় 46-5-8 ভোটে গৃহীত এক প্রস্তাবের বলে তিনি আরও তিন বৎসর মহাসচিবের পদে বহাল ছিলেন। নীতিরক্ষা হলেও এর ফল সুখপ্রদ হয়নি। 1951 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর পর থেকে সোভিয়েৎ সরকার মিঃ লাইকে মহাসচিব বলে স্বীকার করেনি এবং সরকারী-বেসরকারী সমস্ত পর্য্যায়ে তাঁকে বর্জন করেছিল। ফলতঃ তাঁর সমর্থকগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসাধনের প্রশ্নে ও তাঁর প্রতি সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আস্থার প্রশ্নে তিনি তাঁর কার্য্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। সচিবালয়ের ভিতরে মার্কিন তৎপরতাও অবশ্য মহাসচিবকে আরও দুর্বল করে দিয়েছিল। 1952 খ্রীষ্টাব্দে (ম্যাক্‌কার্থীবাদ যখন তুঙ্গে) ম্যাক্‌কার্থী-বাদের জোয়ার ওয়াশিংটনকে প্লাবিত করে নিউইয়র্কেও আছড়ে পড়েছিল। নভেম্বর মাসে মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকারের এক পূর্ণাঙ্গ নির্ণায়ক সভা (Grand Jury) স্বদেশের প্রতি আনুগত্যহীন এক বিরাট সংখ্যক মার্কিন নাগরিকের রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে অনুপ্রবেশের প্রমাণ পাওয়ার দাবী জানায়। বস্তুতঃ রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারী এমন কোন মার্কিন নাগরিককে কোন মার্কিন বিচারালয় তখন অথবা পরে গুপ্তচরবৃত্তি বা বিধ্বংসী কার্য্যকলাপের জন্য শাস্তি দেওয়াতো দূরের কথা, অভিযুক্তও করেনি। কিন্তু মহাসচিবকে দুদিক থেকেই রূঢ় সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। একদল (যাঁরা এই নির্ণায়ক সভার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন) মহাসচিবকে দোষী মনে করেন সচিবালয়ের মধ্যে এই সমস্ত কার্য্যকলাপ সহ্য করার জন্য এবং অন্যদল (যাঁরা সচিবালয়ের আন্তর্জাতিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী) তাঁকে সমালোচনা করেন সচিবালয়ের উপর মার্কিন আঘাতের বিরোধিতা না করার জন্য। এসব ঘটনার ফলে 1952 খ্রীষ্টাব্দের 10-ই নভেম্বর মিঃ লাই তাঁর বর্ধিত কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

অবিলম্বেই গ্রহণযোগ্য একজন উত্তরসূরীর জন্য অনুসন্ধান শুরু হয়। কমন্‌ওয়েলথ্‌ ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি প্রস্তাব করে ক্যানাডার মিঃ লেষ্টার পিয়ারসনের নাম, আমেরিকা সমর্থন করে ফিলিপাইনের জেনারেল রোমুলোকে। আর পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ক্রেস্‌জিউস্কি (Mr. Skrzeszewski) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমর্থন লাভ করেন। নিরাপত্তা পরিষদে মিঃ পিয়ারসনের অনুকূলে সর্বাধিক ভোট পড়লেও তাঁর বিরুদ্ধে সোভিয়েৎ ভেটো প্রয়োগ করা হয়। সাথে সাথেই বৃহৎশক্তিবর্গের মধ্যে গোপনে আলোচনা শুরু হয় এবং প্রার্থী হিসাবে অনেকের নাম উঠলেও শেষ পর্য্যন্ত সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রকের ভূতপূর্ব মুখ্য অধিকর্তা মিঃ ড্যাগ্‌ হ্যামারস্কশোল্ড্‌ সম্বন্ধে মতৈক্য হয়। তাঁর মনোনয়ন সাধারণের স্বীকৃতি লাভ করলে 10-ই এপ্রিল সাধারণ সভায় 57-1 ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তের বলে পাঁচ বৎসর কার্য্যকালের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবরূপে নিযুক্ত হন।

1955 খ্রীষ্টাব্দে ষোলটি রাষ্ট্রের সদস্যপদ লাভের ফলে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্যের উল্লেখযোগ্য রদ্‌বদল হয়। একে অপরের সমর্থক রাষ্ট্রের সদস্যপদেয় আবেদন পত্র 'যোগ্যতার ভিত্তিতে' অনুমোদন করার ব্যাপারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মতপার্থক্যের ফলে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য সংখ্যা বেড়ে একান্ন থেকে মাত্র ষাটে এসে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের ভিতরের রাজনৈতিক বাস্তবের স্বীকৃতি হিসাবে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এক বোঝাপড়া হয়। এর ফলেই ষোলটি দেশ সদস্যপদ লাভ করে। এই ষোলটি দেশের চারটি—আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং রুমানিয়া স্পষ্টতঃই কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীর। অষ্ট্রিয়া, আয়ার, ফিন্‌ল্যাণ্ড, ইতালী, পর্ত্তুগাল এবং স্পেন—পশ্চিম ইউরোপের এই দেশ ছয়টির আদর্শগত ধ্যান-ধারণা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হলেও এর কোনটিই কম্যুনিষ্ট ছিল না। জর্ডান ও লিবিয়ার রাষ্ট্রসংঘভুক্তির ফলে আরব জগতের প্রতিনিধিত্ব জোরদার হয় এবং ক্যাম্বোডিয়া, সিলোন্‌ (এখন শ্রীলঙ্কা), লাওস এবং নেপালের সদস্যপদের ফলে এশিয়া থেকে সদস্যসংখ্যা বেড়ে যায়। অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে, এই ষোলটি রাষ্ট্রের অন্ততঃ দশটি ছিল ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী।

1956 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন বৃহৎশক্তি জড়িত এমন কোন সংকট রাষ্ট্র-সংঘকে সাম্‌লাতে হয়নি। এটা হ্যামারস্কশোল্ড্‌ ও সচিবালয়ের পক্ষে সৌভাগ্যসূচক ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। সুয়েজ ও হাঙ্গেরীর

ঘটনার "ধাক্কা" রাষ্ট্রসংঘে এসে লাগার পূর্ব পর্য্যন্ত দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে তীব্র সংঘাত না হওয়ার ফলে ঐ সময় মহাসচিব উভয়পক্ষেরই আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন। 26শে জুলাই প্রেসিডেণ্ট নাসেরকর্তৃক সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানী জাতীয়করণোদ্ভূত সংকট রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

1956 খ্রীষ্টাব্দের 13-ই অক্টোবর সুয়েজ সংকটের সমাধানকল্পে প্রস্তাবাকারে গোটা ছয়েক নীতি গৃহীত হলেও সেগুলির রূপায়ণ সম্পর্কে ঐক্য সম্ভব হয়নি। কিন্তু পক্ষকাল মধ্যেই মিশর এবং ইঙ্গ-ফরাসী জোটের মধ্যে এবং জর্ডান ও ইজরায়েলের মধ্যে (পরোক্তদের অভিযোগ নিয়ে 19শে অক্টোবর পরিষদে আলোচনা হলেও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি) উত্তেজনা চরমে উঠে। তারপরই (29শে অক্টোবর) ইজরায়েল মিশর আক্রমণ করে। তার পরদিন নিরাপত্তা পরিষদে এ নিয়ে বিতর্ক চলাকালীন যুদ্ধ্যমান দেশ-গুলির প্রতি বৃটেন ও ফ্রান্সের দেওয়া হুমকীর খবরে বিতর্কে ছেদ পড়ে। ইজরায়েল ও মিশর যুদ্ধ বন্ধ করে সুয়েজ খাল থেকে অন্ততঃ দশ মাইল দূরে সৈন্য সরিয়ে না নিলে বৃটেন ও ফ্রান্সকর্তৃক সশস্ত্র হস্তক্ষেপের হুমকীই ছিল এর প্রতিপাদ্য বিষয়। শান্তি রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদের অক্ষমতাকে বৃটিশ হুমকীর সমর্থনে ব্যবহার করা হয়। ইজরায়েল্‌কে সৈন্য প্রত্যাহার করার নির্দেশসহ এবং রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্যদের বলপ্রয়োগ ও বলপ্রয়োগের হুম্‌কী থেকে বিরত থাকার অনুরোধসহ এক মার্কিন প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে আনীত হয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে সাত, বিপক্ষে দুই ভোট দেওয়া হয় এবং পরিষদের দুই সদস্য ভোটদান ভোট দান থেকে বিরত থাকে। বৃটেন (সর্বপ্রথম) এবং ফ্রান্স ভেটো প্রয়োগ করায় এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

অতএব যে ধরণের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য "শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব" করা হয়, উক্ত প্রস্তাবের দুই প্রণেতারাষ্ট্রের (বৃটেন ও ফ্রান্স) কার্য্যকলাপের ফলেই রাষ্ট্রসংঘকে কোরিয়া যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম সেই ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। উক্ত প্রস্তাববলে সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং পয়লা নভেম্বর অধিবেশন আরম্ভ হয় (তখন অবশ্য মিশরের উপর বৃটেন ও ফ্রান্সের বিমান আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে)। তৎপর যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের আবেদনসহ এক মার্কিন প্রস্তাব 64-5-6 ভোটে পরের দিন সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। বৃটেন ও ফ্রান্স এই প্রস্তাবকে পুরোপুরি পালনও করেনি, অমান্যও করেনি। এর উত্তরে

তারা জানায় যে রাষ্ট্রসংঘবাহিনী আরবদের ও ইজরায়েলীদের মধ্যে শান্তি-রক্ষা না করা পর্যন্ত এবং সুয়েজ সম্পর্কে সন্তুষ্টিজনক ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয়। মহাসচিবকর্তৃক আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী (UNEF) গঠনের এক ক্যানাডীয় প্রস্তাব নভেম্বরের তিন তারিখে গৃহীত হয়। সাত ঘণ্টার মধ্যেই মহাসচিব উপরিউক্ত বাহিনী সম্পর্কে একটি মোটামুটি পরিকল্পনা পেশ করেন। 5-ই নভেম্বর সাধারণ সভায় সংবাদ আসে যে রাষ্ট্রসংঘবাহিনীর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ সাপেক্ষে বৃটেন ও ফ্রান্স 6-7 নভেম্বরের মধ্যরাত্রি থেকে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণে রাজী আছে। জরুরী বাহিনীর গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা সাধারণ সভা 7-ই নভেম্বর অনুমোদন করে এবং আটদিন পরে উক্ত বাহিনীর প্রথম দল মিশরে পৌঁছয়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এই বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা পাঁচ হাজারে দাঁড়ায়। দশটি দেশ থেকে—যার কোনটিই বৃহৎশক্তি ছিল না অথবা সুয়েজ প্রশ্নে পক্ষাবলম্বন করেনি—জরুরী বাহিনীতে সৈন্য নেওয়া হয়। ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য সাধারণ সভার ভিতরে এবং বাইরে প্রচুর চাপ সৃষ্টি হওয়ায় বৃটেন ও ফ্রান্স সৈন্য প্রত্যাহারে স্বীকৃত হয় এবং 22শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের সমস্ত সৈন্য মিশর ত্যাগ করে। সিনাই থেকে ইজরায়েলী সৈন্য প্রত্যাহারের স্বীকৃতি আদায় করতে অবশ্য আরও বেশী সময় লেগেছিল এবং রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীকর্তৃক গাজার যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার টহলের শর্তে এবং আকাবা উপসাগরে অবাধ নৌ-চলাচল বিষয়ে আমেরিকার অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে 1957 খ্রীষ্টাব্দে পয়লা মার্চ ইজরায়েল সমস্ত সৈন্য সরিয়ে ফেলার কথা ঘোষণা করে। এদিকে মিশরের অনুরোধে রাষ্ট্রসংঘ-নিয়োজিত কিছু কর্মী এপ্রিল মাসের মধ্যে সুয়েজ খালের নাব্যতা পুনরুদ্ধারের বন্দোবস্ত করেন।

মিশরের গণ্ডগোলের গোড়ার দিকেই হাঙ্গেরীতে উত্থান হলে সোভিয়েৎ সৈন্যবাহিনী তা' দমন করে। চার্টারের ষষ্ঠ অধ্যায় বলে পশ্চিমী শক্তিগুলি 28শে অক্টোবর হাঙ্গেরীতে সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপের প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদের কাছে উপস্থাপিত করে। হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী মিঃ ন্যাগী হাঙ্গেরী থেকে সোভিয়েৎ সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সাহায্য চেয়ে 2-রা নভেম্বর আবেদন করেন। সোভিয়েৎ ও হাঙ্গেরীর সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলার খবরে 3-রা নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা অমীমাংসিত

অবস্থায় স্থগিত রাখা হয়। ঐ দিনই মধ্যরাত্রে সোভিয়েৎ বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়, কাদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ন্যাগী বুদাপেষ্টে যুগোশ্লাভ দূতাবাসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। পরিষদের জরুরী অধিবেশনে হাঙ্গেরী থেকে সোভিয়েৎ সৈন্য প্রত্যাহারের মার্কিন প্রস্তাব সোভিয়েৎ ভেটোর জন্য অগ্রাহ্য হলে "শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব" বলে নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক আহূত সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশনে মোটামুটি একই মার্কিন প্রস্তাব 50-8-15 ভোটে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র সংঘের পরিদর্শকদের হাঙ্গেরীতে প্রবেশের অনুমতি দিতে কাদার অস্বীকার করেন। সাধারণ সভাও মৌখিক প্রতিবাদের বেশী কিছু করতে চায়নি। খুব কড়া কোন প্রস্তাব আশাও করা যায়নি এবং তা' গৃহীত হলে'ও বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতো না। সাধারণ সভার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করায় সোভিয়েৎ সরকারকে চার্টার ভঙ্গ করার জন্য নিন্দা করা হয়।

মিশরে ও হাঙ্গেরীতে রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যকারিতায় আকাশ-পাতাল তফাতের জন্য ঐ সময় অনেকেই অবাক হ'ন। মিশরের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সংঘের চাপে পড়ে দু'টি বৃহৎশক্তি ও ইজরায়েল নিজেদের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পূর্বেই মিশর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। আর হাঙ্গেরীতে একটি বৃহৎশক্তির (রাষ্ট্রসংঘকে) অবজ্ঞার মুখে রাষ্ট্রসংঘকে অসহায় হয়ে বসে থাকতে হয়। এই দুটি সংকটের মোকাবিলায় রাষ্ট্র-সংঘের ভূমিকা থেকে সীমিত কার্য্যকারিতা এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ মান্য বা অমান্য করার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। সুয়েজ সম্পর্কে সাধারণ সভার প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজেদের স্বার্থেই মেনে নিয়েছিল। রাষ্ট্র-সংঘ না থাকলেও ঘটনার হেরফের হতোনা বলেই অনেকে মনে করেন। সুয়েজ ও হাঙ্গেরীর প্রশ্নে সাধারণ সভার প্রস্তাবের ভাষা জোরালো হলে'ও সেগুলি সর্বতোভাবে সুপারিশমূলক ছিল এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সেগুলি করা হয়েছিল। হাঙ্গেরীর ক্ষেত্রে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন সাধারণ সভার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পথ বেছে নেওয়ার ফলে বোঝা যায় যে কোন বৃহৎশক্তির বিরোধিতার মুখে রাষ্ট্রসংঘের কোন প্রস্তাব বলবৎ করা সম্ভব নয় (রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোক্তাগণও একই অভিমত পোষণ করতেন)।

রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী (UNEF) সুয়েজ সংকটের ফলশ্রুতি হিসাবে থেকে গিয়েছিল। একে পুলিশবাহিনী বলা যায় না; যুদ্ধরত

সৈন্যদের একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখাই ছিল এর কাজ। একদিক থেকে দেখতে গেলে এই বাহিনী 'প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ সংস্থার' (Truce Supervisision Organisation in Paletsime) থেকে একধাপ এগিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অনুমতিসাপেক্ষেই সেই দেশ থেকে এ বাহিনী কাজ করতে পারতো। এ জন্যই মিশর ও ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ইজরায়েলী দিক থেকে এ বাহিনী কাজ করেনি। হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত এই বাহিনী আক্রান্ত হলে প্রতীকী অর্থে দু-একটা গুলি ছুঁড়ে আত্মরক্ষা করতে হলেও এর বাস্তবমূল্য অকিঞ্চিৎকর ছিল না। বিভিন্ন রকমের দশটি দেশ থেকে নেওয়া পাঁচ হাজার লোকের এই বাহিনী সাংগঠনিক দিক থেকে এবং কর্মতৎপরতার দিক থেকে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সুয়েজ সংকট অবসানের প্রাথমিক পর্য্যায়েই এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি। 1967 খ্রীষ্টাব্দে মিশর থেকে এর অপসারণের দাবী করা পর্য্যন্ত এই বাহিনী মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

1958 খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে লেবানন সিরিয়ার বিরুদ্ধে লেবাননের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করায় নিরাপত্তা পরিষদ সেখানে এক 'পরিদর্শক মণ্ডলী' (Observation Group) প্রেরণ করে। জুলাই মাসে লেবানন ও জর্ডান সরকারের অনুরোধে ঐ দুই দেশে মার্কিন এবং বৃটিশ সৈন্য পাঠানো হয়। এর বিরুদ্ধে সোভিয়েৎ সরকারের তিক্ত সমালোচনায় অনেকে মনে করেন যে আমেরিকা ও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব আসন্ন। তবে যত তাড়াতাড়ি সিরিয়া ও লেবাননের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তত তাড়াতাড়িই সেই উত্তেজনার নিরসন হয় এবং উক্ত প্রশ্নে সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশন চলাকালীনই জর্ডান থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ শুরু হয়। সংকটকালে পরিত্রাতা হিসাবে মহাসচিবের ভূমিকা লেবানন পরিস্থিতিতে (যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও হয়েছিল) স্পষ্ট হয়ে উঠে।

এ পর্য্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত পরিস্থিতির জন্য মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে রাষ্ট্র-সংঘকে বহুলাংশে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু 1960 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ আফ্রিকার দিকে মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে উঠে। বিভিন্ন উপনিবেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে ঐ বৎসর সতেরটি দেশ রাষ্ট্র সংঘের সদস্য হয় এবং তার মধ্যে ষোলটি দেশই আফ্রিকার। 1960 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে নাইজিরিয়ার সদস্যপদ প্রাপ্তির ফলে রাষ্ট্রসংঘের

সদস্যসংখ্যা একশত হয়। নূতন সদস্যরাষ্ট্রসমূহের বেশীর ভাগই ছিল পূর্বতন ইউরোপীয় শাসকদের কৃত্রিম সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রসংঘের প্রথম দিকের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের তুলনায় এই সমস্ত রাষ্ট্রের অধিকাংশেরই ভাবমূর্ত্তি ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেনি। এই রাষ্ট্রগুলিকে সমস্ত রকমের সাহায্যের জন্য রাষ্ট্রসংঘের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হতো।

রাষ্ট্রসংঘের উপর কঙ্গোর (আয়তনে বিশাল) নির্ভরতা ছিল বেশী। 1960 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কঙ্গো স্বাধীনতা অর্জন করে অথচ বেলজিয়ামের কর্তৃপক্ষ কঙ্গোবাসীকে স্বাধীনতার জন্য মোটেই প্রস্তুত করেনি। আভ্যন্তরীন গণ্ডগোলে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত কঙ্গোর শাসনব্যবস্থা সাথে সাথেই ভেঙ্গে পড়ে এবং কঙ্গো রাষ্ট্রের সংহতি বিপন্ন হয়। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোক্তাগণ কোন সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলা করার ব্যবস্থা চার্টারে করেছিলেন, কিন্তু কোন সদস্যরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন অরাজকতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুই ভাবেননি। অথচ সদস্যপদ প্রাপ্তির প্রাথমিক শর্ত পালনের কথা (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রের স্থিতিশীল সরকার থাকতে হবে) কঙ্গোর পক্ষে প্রযোজ্য ছিল না বললেই হয়। নিজের নাগরিকদিগের এবং সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য বেলজিয়ামকর্তৃক তাড়াতাড়ি কঙ্গোতে সৈন্য প্রেরণ করাকে বৈদেশিক আক্রমণের পর্য্যায়ভুক্ত করা গেলেও কঙ্গো সমস্যার জটিলতার মূলে ছিল আভ্যন্তরীণ অরাজকতা। কঙ্গোর রাজনৈতিক পটভূমিকা ছিল সাংঘাতিক রকমের বিস্ফোরক; সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকার অন্যান্য দেশ কঙ্গোর জন্য তাদের স্বাধীন অস্তিত্বকে বিপন্ন মনে করেছিল; কঙ্গোর গণ্ডগোলের সুযোগে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতার নামে আফ্রিকায় হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়েছিল এবং বেলজিয়াম (মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশও) কঙ্গোতে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থহানি (বেলজিয়ামের মালিকানাধীন কঙ্গোর কাতাঙ্গা প্রদেশের বড় বড় তামার খনি হাতছাড়া হওয়ার জন্য) হওয়ার ভয়ে সচকিত হয়ে পড়েছিল।

কঙ্গো সমস্যার প্রত্যেকটি স্তর সচিবালয়ের কার্য্যকলাপের সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল যে তার বিশদ আলোচনা সপ্তম অধ্যায়ে (সচিবালয় সম্পর্কিত) করাই শ্রেয় মনে করা হয়েছে। কঙ্গো সমস্যার ব্যাপকতা, জটিলতা ও অবদমনীয়তা—সমস্ত দিক থেকেই দেখতে

গেলে কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকাকে এই সংগঠনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সর্ব্বোপরি, 1961 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে নাদোলায় (Ndola) বিমান ধ্বংসের ফলে রাষ্ট্র-সংঘের কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন মহাসচিব ড্যাগ্ হ্যামারস্ক শোল্ডের মৃত্যুতে কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘকে অকল্পনীয় আত্মত্যাগ করতে হয়েছিল। হ্যামারস্ক শোল্ডের কার্য্যকালের অবশিষ্টাংশের জন্য ব্রহ্মদেশের মিঃ য়ু থাণ্ট্ অস্থায়ী মহাসচি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ায় আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে রাষ্ট্রসংঘে নূতন সদস্যদের গুরুত্বের প্রতিফলন হয়।

অনেকেই মনে করেন যে নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত আফ্রিকা ও এশিয়ার তিনটি দেশের জন্যই 1961 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ভারতকর্তৃক বলপ্রয়োগে গোয়া দখল প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়নি। ভারতের মতে গোয়া দখল মোটেই আক্রমণাত্মক কাজ হয়নি বরং ঔপনিবেশিকতাই 'চিরস্থায়ী আক্রমণ।' অবশ্য পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতার ন্যাক্কারজনক ইতিহাসের কথাও অনস্বীকার্য্য।

যদি গোয়া প্রশ্নকে রাষ্ট্রসংঘের বিফলতার প্রতীক মনে করা হয়, তবে বলা যেতে পারে যে রাষ্ট্রসংঘ কিউবা সমস্যাকে বাস্তবতঃ এড়িয়ে গেছে। কিউবা প্রশ্নে আমেরিকা ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন (পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের পরে সর্বপ্রথম) অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে মুখোমুখি হলে উদ্বিগ্ন মানবতার প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রসংঘকে নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করতে হয়। অবশ্য কেউ চাইলে রাষ্ট্রসংঘকে আলোচনা-কেন্দ্র হিসাবে (বাঞ্ছিত অথবা অবাঞ্ছিত) ব্যবহার করতে পারতো। কিউবাতে সোভিয়েৎ ক্ষেপণাস্ত্রের সন্নিবেশের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ দাখিল করার মার্কিন সরকার নিরাপত্তা পরিষদকে আদর্শ স্থান হিসাবে মনে করে। ক্রুশ্চেভ ও কেনেডির মধ্যে মতৈক্য না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য মহাসচিব পর্দার অন্তরালে আলোচনার পথ সুগম রাখতে সাহায্য করেন। কিন্তু কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধের বৈধতার স্বপক্ষে মত মার্কিন সরকার রাষ্ট্রসংঘের পরিবর্তে আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের সংস্থার (OAS) কাছেই চেয়েছিল এবং পেয়েছিল। তাছাড়াও য়ু থাণ্ট্ কিউবা থেকে সোভিয়েৎ ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র ভেঙ্গে ফেলার কাজ (রাষ্ট্রসংঘকর্তৃক) পরিদর্শনের জন্য কাস্ত্রোর কাছে অনুমতি চাইলে কাস্ত্রো তা অগ্রাহ্য করেন। এই দুই বৃহৎশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ হলে যে রাষ্ট্রসংঘের কিছু করার থাকে না তা' বার্লিনের মত কিউবা সংকটেও প্রকট হয়ে উঠে।

কঙ্গো ও কিউবা সংকট য়ু থাণ্ট্ মোটামুটি প্রশংসমানভাবে উত্তীর্ণ হওয়ায় 1962 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে পাঁচ বৎসরের জন্য মহাসচিবের পদে তাঁর নির্বাচন নির্বিরোধেই হয়েছিল। কিন্তু 1963 খ্রীষ্টাব্দ তুলনামূলক-ভাবে সঙ্কটমুক্ত বৎসর হলেও (ভিয়েৎনাম সংকটে অবশ্য রাষ্ট্রসংঘকে নিষ্কর্মণ্য হয়ে থাকতে হয়েছিল) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার সাংবিধানিক ও আর্থিক প্রশ্ন নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে।

কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের ব্যয় হয় প্রচুর। সেখানে প্রথম ছ'মাসেই খরচ হয় ছয় কোটি ষাট লক্ষ ডলার (যেখানে রাষ্ট্রসংঘের স্বাভাবিক বার্ষিক বাজেট মাত্র সাত কোটি ডলার)। শুরুতে ক্যানাডা, আমেরিকা ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন পরিবহন ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করায় একমত হলেও অবশিষ্ট চারকোটি পঁচাশি লক্ষ ডলারের বোঝা বড় কম ছিল না। 1961 খ্রীষ্টাব্দে কঙ্গোতে ব্যয় হয় বার কোটি ডলার। পরের বৎসরও প্রায় তাই। সাধারণ সভা উক্ত অর্থ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ বাজেট থেকে না নিয়ে (যেমন হয়েছিল জরুরী বাহিনীর ক্ষেত্রে) সদস্যরাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে তাদের দেয় বার্ষিক চাঁদার হারে আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য সাধারণ সভাকর্তৃক ধার্য্য চাঁদা অনেক সদস্য-রাষ্ট্রই (রাজনৈতিক অথবা আইনগত কারণের আশ্রয় নিয়ে) দেয়নি। কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার প্রতি সোভিয়েৎ অনীহা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে উক্ত সরকার শান্তিরক্ষার কাজে সাধারণ সভার কার্য্যকলাপকে অবৈধ বলে। ফলে সাধারণ সভাকর্তৃক চাঁদা ধার্য্য করার ক্ষমতাও উক্ত সরকারের কাছে অবৈধ বলে পরিগণিত হয়। ফ্রান্সও সোভিয়েৎ যুক্তি সমর্থন করে ধার্য্য অর্থ দিতে অস্বীকার করে।

এই ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে মহাসচিবকে রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু সংস্থার (UNICEF) তহবিল থেকে ঋণসহ প্রায় সমস্ত রকম সম্ভাব্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। মার্কিন সরকার নানাভাবে উক্ত ব্যয়ের পঞ্চাশ শতাংশ বহন না করলে কি হতো বলা মুশকিল। 1961 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সাধারণ সভা কুড়ি কোটি ডলারের ঋণপত্র (Bond) বিক্রয় করার এক পরিকল্পনা অনুমোদন করে। তবে মার্কিন সরকার উক্ত ঋণপত্রের একটা বড় অংশ ক্রয় না করলে ঐ ব্যবস্থাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতো।

রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী (UNEF) ও রাষ্ট্রসংঘের কঙ্গো বাহিনীর (ONUC) ব্যয় নির্বাহের জন্য সভ্যরাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে 'রাষ্ট্রসংঘের খরচ হিসাবে' অর্থ আদায় করা 17 নম্বর ধারা অনুসারে বৈধ কিনা এই প্রশ্নে অর্থ প্রদানকারী রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের অভিমত জানতে চায়। 1962 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই ধরনের অর্থ আদায় করার ক্ষমতার বৈধতার অনুকূলে বিচারালয়ের (9—5 ভোটে) সিদ্ধান্ত হয়। এই অভিমতকে সাধারণ সভা গ্রাহ্য করে এবং চার্টারের 19 নম্বর ধারার (অর্থাৎ কোন সদস্যরাষ্ট্রের বার্ষিক দেয় চাঁদার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ অদেয় থাকলে সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্র সাধারণ সভায় ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে) তাৎপর্য্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হয়।

সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্টারের এই ভাষাকে যথার্থ বলে স্বীকার করলেও তারা আশা করেনি যে নিরাপত্তা পরিষদের দুই স্থায়ী সদস্য (সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও ফ্রান্স) এই চাপের সামনে মাথা নত করবে। তবে তারা মার্কিন সরকারের (কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশ দিয়েছে) বিরক্তি উৎপাদন করতে চায়নি এবং নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ব্যবস্থার সাথে সাথে আর্থিক প্রশ্নে সাধারণ সভায় ভেটো ব্যবস্থার সুযোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের কার্য্য-কারিতা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করতে চায়নি। এ নিয়ে যখন বাকবিতণ্ডা চলতে থাকে, তখন অবশ্য কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘের দেনা বেড়েই চলে।

1964 খ্রীষ্টাব্দের জুনের শেষে (যখন রাষ্ট্রসংঘের কঙ্গোবাহিনীর আয়ুষ্কাল শেষ হয়) কঙ্গোতে সামরিক খাতে ব্যয় আটত্রিশ কোটি ডলার এবং অসামরিক সাহায্য খাতে ব্যয় পাঁচ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। এর বার কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলার সদস্যরাষ্ট্রসমূহের কাছে (বিশেষ করে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও ফ্রান্স) পাওনা ছিল। চার্টারের 17 নম্বর এবং 19 নম্বর ধারার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাপ্রসূত সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সাধারণ সভার উনবিংশ অধিবেশন স্থগিত রাখা হলেও ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায়নি। 1964 খ্রীষ্টাব্দের পয়লা ডিসেম্বর সভার অধিবেশন আরম্ভ হলে মার্কিন প্রতিনিধি সোভিয়েৎ ইউনিয়নের ভোটাধিকার নাকচ করার দাবী করেন। কোন পক্ষই অবশ্য চরম পর্য্যায়ে বিরোধের পক্ষপাতী ছিল না। সমাধানের জন্য সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা চালানো হয়। তবে লাভ হয়নি কিছু। মিঃ কোয়াইসন্ স্যাকী (Mr. Quaison Sackey) ধ্বনিভোটে সভাপতি নির্বাচিত হলেও সাধারণ

সভার কোন সমিতির বৈঠক (বিভিন্ন সমিতির অধ্যক্ষ এবং সহ-সভাপতির পদগুলিতে নির্বাচন না হওয়ায়) সম্ভব হয় না ।

যাই হোক্, এ নিয়ে প্রচুর জল ঘোলা হলেও জানুয়ারীর 27 তারিখ নাগাদ সাধারণ সভায় বিতর্কের উত্তেজনা অনেকটা থিতিয়ে আসে। অধিবেশন স্থগিত রাখার চেষ্টা বার বার করা হয় এবং 16-ই ফেব্রুয়ারী আলবেনিয়া উক্ত প্রশ্নে ভোট দাবী করে। সভাপতি অধিবেশন স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন এবং দুদিন পরে সাধারণ সভা সর্বসম্মতভাবে 1964 খ্রীষ্টাব্দের বাজেটের মোটামুটি সমপরিমাণ বাজেট অনুমোদন করে এবং ঘাট্‌তি পূরণের জন্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহের কাছে আবেদন করে। তেত্রিশটি সদস্যরাষ্ট্র-সম্বলিত এক সমিতির হাতে কঙ্গোতে শান্তি রক্ষাজনিত সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দিয়ে পয়লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অধিবেশন মূলতুবি রাখা হয়।

এই শান্তিরক্ষা সমিতি (Peace Keeping Committee) আর্থিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে বিফলতার কথা যথাসময়ে জানালেও সাধারণ সভার অধিবেশন আরম্ভ করার (চার্টারের 19 নম্বর ধারার কথা উল্লেখ না করে) এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক স্বতঃস্ফূর্ত দানের মাধ্যমে ঘাট্‌তি পূরণের সুপারিশ করে। মূলতুবি সাধারণ সভা এই সুপারিশ গ্রহণ করে এবং পরের সভা (বিংশতিতম) স্বাভাবিকভাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একুশে সেপ্টেম্বর অধিবেশনে মিলিত হয়। মার্কিণ সরকার সোভিয়েৎ সরকারের বিরুদ্ধ মতবাদ নীরবে মেনে নেওয়ার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। তার অবশ্য কারণও ছিল। একদিকে সাধারণ সভায় "তৃতীয় বিশ্বের" রাষ্ট্রগুলির বর্দ্ধিত প্রভাব এবং সাধারণ সভাকে অধিকতর শক্তিশালী করে আরও বেশী কাজে লাগানোর চেষ্টার ফলে রাষ্ট্রসংঘের বৃহৎশক্তিগুলির প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয় এবং অন্যদিকে চার্টারের 17 এবং 19 নম্বর ধারা আঁকড়ে থাকলে সাধারণ সভাকর্তৃক কর আদায়ের অব্যাহত ক্ষমতার ফলে ধনী রাষ্ট্রগুলির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে শান্তিরক্ষার কাজে রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যকারিতা ক্ষুণ্ণ করার অভিপ্রায় মার্কিন (অথবা বৃটিশ) সরকারের ছিল। একথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় 1964 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (সমস্যাবিজড়িত কঙ্গোবাহিনীর অস্তিত্ব তখনও ছিল) সাইপ্রাসে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের (এতে সোভিয়েৎ সরকারও মত দিয়েছিল) প্রস্তাবের মাধ্যমে। সাইপ্রাসের জটিল পরিস্থিতি

মোকাবিলা করার জন্য বৃটেন রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য চাইলে 'রাষ্ট্রসংঘের সাইপ্রাস পরিদর্শন বাহিনী' (UNFICYP) গঠিত হয় এবং এতেই সর্বপ্রথম নিরাপত্তা পরিষদের এক স্থায়ী সদস্যের (বৃটেন) সৈন্য ছিল। প্রথমদিকে এই বাহিনীতে বৃটিশ সৈন্যসংখ্যা ছিল 2700; পরে ক্যানাডা, ফিন্‌ল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও অষ্ট্রেলিয়া থেকে সৈন্যদল এই বাহিনীতে যোগদান করলে এর সর্বমোট সংখ্যা ছয় হাজার হয় (তখন অবশ্য বৃটিশ সৈন্য সংখ্যা কমে এক হাজারে দাঁড়িয়েছিল)। স্বতঃস্ফূর্তদানের উপরে নির্ভর করার ফলে সাইপ্রাস বাহিনী অচলাবস্থা (কঙ্গোবাহিনী যার শিকার হয়েছিল) এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এই ব্যবস্থা-প্রসূত অর্থাভাবের অসুবিধার কথা মহাসচিব অবশ্য ঘন ঘনই জানাতেন। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ এই বাহিনীর আয়ুষ্কাল সীমিত রাখতে সচেষ্ট ছিল। প্রথমে তিনমাস করে এর মেয়াদ অনুমোদন করা হতো এবং 1965 খ্রীষ্টাব্দের জুন থেকে ছয়মাস করে। এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাও কমিয়ে তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে রাখা হয়েছিল। যদিও একটি সদস্যরাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে থেকে এবং সেই রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন বিষয় সম্পর্কে সচেতন থেকে এই বাহিনীকে কাজ করতে হয়েছিল, তবুও শান্তিরক্ষার ভূমিকায় সাইপ্রাস বাহিনীর কাজের বিরূপ সমালোচনা কেউ (এমনকি সোভিয়েৎ সরকারও) করেনি। ইতিমধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে হলেও রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী (মধ্য প্রাচ্যের জন্য) রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সাধারণ সভা গ্রহণ করে এবং এই বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য সমৃদ্ধিশালী সদস্যরাষ্ট্রসমূহের উপর উচ্চ-হারে ধার্য্য অর্থ এবং স্বতঃস্ফূর্ত্তদানের উপর নির্ভর করা হয়।

1966 খ্রীষ্টাব্দের শেষেও শান্তিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ সম্পর্কে মতৈক্য না হওয়ায় এবং শান্তিরক্ষার ভবিষ্যৎ পন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় য়ু থান্টের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় পরের অনিশ্চয়তার জন্য অনেকে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। য়ু থান্ট্‌ও জানান যে শান্তিরক্ষায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য না পেলে এবং ভিয়েৎনাম যুদ্ধের নিষ্পত্তি না হলে তাঁর পক্ষে পুনরায় মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। য়ু থান্টের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ-শক্তিগুলি নিজেদের নীতি পরিবর্ত্তনে অনিচ্ছুক হলেও য়ু থান্টের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকায় মহাসচিবের পদে অন্য কোন ব্যক্তির নিয়োগ সম্পর্কে তারা মোটেই আগ্রহান্বিত ছিল না। কিছু

কিছু প্রস্তাব (অবশ্য হাল্কভাবে) হয়েছিল। তবে য়ু থান্ট্ প্রথমে একবিংশতিতম সাধারণ সভার অধিবেশনের শেষ পর্য্যন্ত কাজ করতে স্বীকৃত হন। পরে অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতভাবে তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয় এবং ডিসেম্বরের দুই তারিখে সাধারণ সভায় সর্বসম্মতভাবে তিনি দ্বিতীয় কার্য্যকালের জন্য (1971 খ্রীষ্টাব্দের 31শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) মহাসচিব রূপে নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রসংঘের ইতিহাসে 1967 খ্রীষ্টাব্দকে কিছুতেই গৌরবময় বলা যায় না। যে মাসে সাধারণ সভা যখন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সমস্যায় পর্য্যুদস্ত, তখন মিশরীয় সরকার মিশর থেকে অবিলম্বে জরুরী বাহিণী প্রত্যাহার করার জন্য মহাসচিবের নিকট দাবী জানায়। এ দাবী না মেনে মহাসচিবের উপায় ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী মিশর থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত হওয়ার সাথে সাথে মিশর আকাবা উপসাগর অবরোধ করলে ইজরায়েল হঠাৎ মিশর আক্রমণ করে। এর জন্যই হয় ছয়দিনের বিধ্বংসী যুদ্ধ। লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত ইজরায়েল যুদ্ধ বিরতির জন্য নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বানে কর্ণপাত করেনি। সোভিয়েৎ ইউনিয়নের অনুরোধে সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশন বসে (11 নম্বর ধারাবলে, 'ঐক্যের জন্য শ্যন্তিপ্রস্তাবের' বলে নয়) এবং পাঁচ-সপ্তাহ ধরে আলোচনা করেও জেরুজালেমের ইজরায়েল ভুক্তি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে দুটি প্রস্তাব ছাড়া সাধারণ সভার পক্ষে অন্য কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

বৃহৎশক্তি সম্পর্কের মধ্যে অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহাসচিবের পদের গুরুত্ব আবার প্রতিভাত হয়। ঘটনাস্থলে পরিদর্শনকারী সৈন্যের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে রাষ্ট্রসংঘের উপস্থিতির পূনর্ব্যবস্তার বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে মতৈক্য হয়। যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য মহাসচিব জেনারেল অড্বুলের (General Odd Bull) নেতৃত্বে যুদ্ধবিরতি পরিদর্শন দল (UNTSO) প্রেরণ করেন। সাধারণ সভার পরিবর্তে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে এটা হওয়া উচিত বলে সোভিয়েৎ সরকার প্রশ্ন তুললে পরিষদের সভাপতি এতে পরিষদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে বলে জানান। নভেম্বর মাসেও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির সম্ভাবনা না দেখা দেওয়ায় আলোচনা-প্রসূত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে সুইডেনের কূটনীতিবিদ্ ডঃ গুনারজারিং এর নিয়োগ অনুমোদন করে। ডঃ জারিং-এর দীর্ঘ এবং ধৈর্য্যশীল প্রচেষ্টা অবশ্য ফলপ্রসূ হয়নি।

ইজরায়েল ও তার আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে যুদ্ধকালীন অবস্থা বিদ্যমান থেকেছে এবং উভয়পক্ষ থেকে প্রায়শঃই গোলাগুলি চলেছে। ফলে রাষ্ট্র-সংঘের পরিদর্শনকারী সৈন্যদের মধ্যে হতাহত হয়েছে প্রচুর এবং পরিদর্শন-কারী সৈন্য প্রত্যাহার করার কথা মহাসচিব একাধিকার ভেবেছেন। মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদ একমত হতে পারেনি এবং কখনও কখনও মতৈক্য হলেও বৃহৎশক্তি দ্বন্দ্বের জন্য কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। (1973 খ্রীষ্টাব্দে আবারও যুদ্ধ হয় এবং এখনও মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি)।

জরুরী বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক দুর্গতির অবসান হয়নি। শান্তিরক্ষার ব্যয়ের জন্য দীর্ঘদিনের ঘাটতি থেকেই গিয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেয় অর্থ আদায় হয়নি। শান্তিরক্ষাখাতে পাঁচ কোটি ডলার ঋণ থেকেই গিয়েছিল। একথা ঠিক যে এই ঋণের সাথে রাষ্ট্রসংঘের নিয়মিত বাজেটের সম্পর্ক ছিল না। তবে এও ঠিক যে, এই অর্থনৈতিক দায়িত্বহীনতার ফলে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এক ধরনের সংক্রমণ হয়েছিল যার জন্য অনেক সময় নিয়মিত দেয় অর্থ আদায় হতো না এবং মহাসচিব জোড়াতালি ব্যবস্থার (যেমন কোন অছিখাত্ থেকে ঋণ নেওয়া) আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। 1968 খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন চেকোশ্লোভাকিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ করলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ফাটল দেখা দেয় এবং বৃহৎশক্তিকর্তৃক শান্তিভঙ্গের মুখে রাষ্ট্রসংঘের অসহায়তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে। বাস্তবে এটা ছিল হাঙ্গেরীর ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এই সামরিক হস্তক্ষেপকে নিন্দা করে এবং অবিলম্বে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে সোভিয়েৎ সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব সোভিয়েৎ ভেটোর জন্য নাকচ হয়ে যায়। চেকোশ্লোভাকীয় সরকার গোড়ার দিকে প্রতিবাদ করলেও শেষে সুর নরম করে এবং নিরাপত্তা পরিষদের কর্মসূচী থেকে সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানায়। তখন অবশ্য রাষ্ট্রসংঘের আর কিছুই করার ছিলনা।

অনুরূপভাবে ভিয়েৎনাম প্রশ্নেও রাষ্ট্রসংঘের সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলিকে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে হয়। মহাসচিব অবশ্য কয়েকবার ভিয়েৎনাম সংকট নিরসনের জন্য উদ্যোগ করেছিলেন এবং খোলাখুলিভাবে ভিয়েৎনামে বৃহৎশক্তিগুলির ভূমিকার সমালোচনা করেছিলেন। বাস্তব-বাদিতার স্বার্থে এ কথা বলা যায় যে, ভিয়েৎনাম প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘ

কখনও কিছু করে উঠতে পারেনি। যুদ্ধ-কবলিত বিশ্বে অকেজো শান্তিসংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের অস্তিত্ব হতাশার কারণই হয়েছিল। তবে অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্যদান ও বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া, মহাকাশ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সাগরতলের আন্তর্জাতীয়করণ প্রভৃতির মাধ্যমে অবশ্য রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যকারিতার নজির পাওয়া যায়। তৎসত্বেও সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে ফাঁকা আত্মম্ভরিতার পরিবর্তে সংযত ও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের পঞ্চবিংশতি বার্ষিকী উদ্‌যাপন বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

নিরাপত্তা পরিষদ

কথা ও কাজের মধ্যে প্রভেদের দিক থেকে দেখতে গেলে নিরাপত্তা পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য অঙ্গগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে। গোড়ার দিকের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামো ও কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কিত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই হয়েছিল। লীগ পরিষদের দুর্বলতা থেকে নিরাপত্তা পরিষদ মুক্ত থাকবে এই আশাই করা হয়েছিল। আইনের প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। এমনকি আইনও যুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে বাধার সৃষ্টি করবে না, এই আশাই করা হয়েছিল। ডাম্বারটন ওক্সের প্রস্তাব সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মন্তব্যে বলা হয়েছিল যে, 'নিরাপত্তা পরিষদের পূর্বে অন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এত ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।' সান্‌ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে মার্কিণ প্রতিনিধিদলের প্রধান এই বক্তব্যের সমর্থনে বলেছিলেন যে, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে নিরাপত্তা পরিষদ অনন্য এবং গতানুগতিক জোটের পর্য্যায়ে একে ফেলা যায় না এবং লীগ পরিষদের সাথেও এর তুলনা করা যায় না।' রাষ্ট্রসংঘের প্রচার দপ্তরের আনুষ্ঠানিক ভাষ্যেও বলা হয়েছিল, 'বাস্তবে নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা-সম্বলিত সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের সংস্থার ক্ষমতার সমান।' তদানীন্তনকালে অনেকে মনে করেছিলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা হবে অনেকটা সশস্ত্র পুলিশের মত, যার কাজ হবে সত্বর অকুস্থলে পৌঁছনো এবং ন্যায়-অন্যায়, কূটনৈতিক সৌজন্য প্রভৃতি প্রয়োজনে অবজ্ঞা করে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। 1945 খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে (Foreign Affairs) এক প্রবন্ধের মাধ্যমে একজন লেখক যখন আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, "সভ্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক দেয় সৈন্যবাহিনী, সাহায্য এবং সুবিধাদির বিষয়ে বিশেষ চুক্তি করায় নিরাপত্তা পরিষদ তৎপর হবে", তখন এই মন্তব্যে অনেকেরই ধারণার প্রতিফলন হয়েছিল। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সম্পর্কে পরিষদের ভূমিকার প্রশ্নেও উক্ত লেখক জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, পরিষদের আলোচনা-

বিবরণী সংবাদ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে গোপন রাখা হলেও আলোচনার ফল জানানো হবে এবং সাধারণসভার নিকট পরিষদের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

মাঝখানে অত্যন্ত কম সময় অতিবাহিত হলেও কি ধরণের আশা-আকাঙ্খা ও ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে এ ধরণের চিন্তাধারা গঠিত হয়েছিল তা এখন নির্ধারণ করা শক্ত। একথা বরং সহজে অনুমেয় যে চার্টারপ্রণেতাগণের আশা পূর্ণ করা নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। সামরিক উপদেষ্টা-মণ্ডলীর (যার অধীনে সশস্ত্রবাহিনী থাকার কথা) সহায়তায় যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিরক্ষার দায়িত্ব-পালনে সক্ষম হবে, এ আশা বাস্তববাদী নেতৃবৃন্দ 1945 খৃষ্টাব্দে প্রকৃতই করেছিলেন কিনা জোর করে বলা মুশকিল। তবে প্রকৃত সত্য যদি উদ্‌ঘাটিত হতো, তবে নিঃসন্দেহে দেখা যেত যে, মিত্রশক্তিবর্গের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে এই গগনচুম্বী পরিকল্পনা (Grand design) সমর্থন করলেও তাঁদের সকলেই বিশ্বাস করেননি যে এই পরিকল্পনার বাস্তাবায়ন সম্ভব হবে। এঁদের কয়েকজন দিবাস্বপ্ন দেখলেও বেশীর ভাগই এই পরিকল্পনা সমর্থন করেছিলেন কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে বিশ্বরাজনীতির ধারার সাথে এর সঙ্গতি ছিল। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা অথবা অনুরূপ কোন ব্যবস্থাই যুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারবে।

নিরাপত্তা পরিষদের কেন্দ্রমূলে ছিল বৃহৎশক্তি ঐক্যের আশা। তখন মনে করা হয়েছিল যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে, বিশেষ করে প্রাক্তন শত্রু-রাষ্ট্রসমূহকর্তৃক শুরু করা যুদ্ধ বন্ধ করাই নিরাপত্তা পরিষদের কাজ হবে। পরিষদে একসাথে কাজের মাধ্যমে বৃহৎশক্তিবর্গের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধন হবে বলেই আশা করা হয়েছিল। তখন মনে হয়নি যে, নিজেদের ঝগড়া মিটাতেও বৃহৎশক্তিবর্গকে ব্যস্ত হতে হবে। শান্তি-রক্ষকগণ শান্তিভঙ্গের কারণ হবে, এ প্রশ্ন তখন ছিল অবান্তর। বৃহৎ-শক্তিবর্গ হয় নিজেদের মধ্যে বিবাদ থেকে বিরত থাকবে, নয় তাদের বিবাদের ফলে রাষ্ট্রসংঘ ভেঙ্গে যাবে। বৃহৎশক্তিবর্গকর্তৃক রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্ট হওয়ার ফলে ঈপ্সিত পথে এদের পরিচালিত করা (বিশেষ করে গোড়ার দিকেই) রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

রাষ্ট্রসংঘে বৃহৎশক্তিবর্গের এই ভূমিকার সাথেই জড়িত 'তথাকথিত ভেটো' দেওয়ার ক্ষমতা। 'তথাকথিত' বলা হচ্ছে এজন্য যে, ভেটোর

মাধ্যমে বৃহৎশক্তিগুলিকে কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়নি (জাতিপুঞ্জের আমলেও তাই হয়েছিল)। এর ফলে বৃহৎশক্তিবর্গের সার্বভৌম অধিকার অর্থাৎ স্বকীয় সম্মতি ব্যতিরেকে কোন আন্তর্জাতিক দায় গ্রহণ না করার অধিকার (প্রাক্-রাষ্ট্রসংঘ যুগে যে অধিকার সার্বভৌমত্বের মাপকাটি ছিল) রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণালী বর্জন করে রাষ্ট্রসংঘ যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল ; কিন্তু সমস্ত রাষ্ট্রকে (বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ধরণের দায়িত্ব সম্বলিত) সংখ্যাগরিষ্ঠের (বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন) সিদ্ধান্তের শিকার করাও কোনক্রমেই বাস্তব-বাদীতার পরিচায়ক হতো না। এ ব্যবস্থা না করলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন যে রাষ্ট্রসংঘের বাইরে থেকে যেতো শুধু তা-ই নয়, রাষ্ট্রসংঘের ভিতরে যে নেতৃত্ব এই দুটি দেশ দিতে পারে তার পথও বন্ধ হয়ে যেতো। একদিকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ বর্জনের জন্য এবং অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদের উপর বিশেষ ধরণের দায়িত্ব আরোপ করার ফলে এবং পরিষদের মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের বিশেষ ভূমিকার কারণে ভেটোর মত বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলির (বিশেষ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন) এবং রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিগত বিভেদের দিক থেকে দেখতে গেলে একথা বলা যেতে পারে যে চার্টারকর্তৃক অর্পিত সীমিত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পেয়ে এই বৃহৎশক্তিগুলির পক্ষে সন্তুষ্ট থাকা উল্লেখের অবকাশ রাখে। এক দিক থেকে দেখতে গেলে (যেমন সোভিয়েৎ সরকারকর্তৃক ব্যবহৃত ভেটোর অভিজ্ঞতা থেকে) মনে হতে পারে যে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের পথ বন্ধ করার জন্যই ভেটোর প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু অন্যদিকে থেকে (ডাম্বারটন ওক্স ও সানফ্রান্সসিস্কো সম্মেলনের সময়ে বিরাজমান ধারণা অনুসারে) দেখতে গেলে ভেটোর তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, বৃহৎশক্তিবর্গকর্তৃক সমর্থিত সিদ্ধান্তসমূহই কেবল গ্রহণ করা রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে। যেমন ডাঃ ফিলিপ যেসাপ্ বলেছেন যে, '(রাজনৈতিক বিষয়ে) যতটা চিবোতে পারবেনা ততটা কামড়ানো থেকে রাষ্ট্রসংঘকে বিরত রাখার জন্যেই ভেটোর উদ্ভাবন।'

চার্টার প্রণয়নে শুধু যুক্তিযুক্ততা স্থান পেলে অবশ্য বলা যায় যে কেবলমাত্র বৃহৎপঞ্চশক্তিই নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করতে পারতো। যেহেতু তাদের ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা তো

দূরের কথা, গ্রহণ করাও সম্ভব নয়, রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যনির্বাহক অঙ্গে সদস্যপদ এই পঞ্চশক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। এতে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার দায়িত্বসম্বলিত রাষ্ট্রগুলির সংখ্যা যথাযোগ্য হতো, তাদের কাজে দ্রুততা সম্ভব হতো এবং তাদের ক্ষমতা এবং দায়িত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হতো। তাহলে শুধু এই পঞ্চশক্তিকে নিয়েই নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয়নি কেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর হিসাবে বলা যেতে পারে যে জাতিপুঞ্জের নজির বাধার স্থষ্টি করেছিল। 1918 খৃষ্টাব্দে জেনারেল স্মাট্‌স্‌ 'দি লীগ অব্ নেশন্‌স্‌ : এ প্র্যাক্‌টিকাল সাজেশান' নামক পুস্তকে গণতন্ত্র ও বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিত্বের খাতিরে লীগ পরিষদে বৃহৎপঞ্চশক্তি ছাড়াও কিছু রাষ্ট্রকে অস্থায়ী সদস্য হিসাবে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই গ্রাহ্য হয়নি। শুধু আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীগত কারণে কিছু রাষ্ট্রকে লীগ পরিষদের সদস্য করা বাস্তবতঃ লীগ পরিষদ সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় ধারণার পরিপন্থী ছিল। শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থার ফলে কিছু দুর্বল রাষ্ট্র (শান্তিরক্ষার্থে তর্ক করা এবং ভোট দেওয়া ছাড়া অন্য কিছুর সামর্থ্য যাদের ছিল না) লীগ পরিষদের সদস্য হতে পারতো। তবে এসমস্ত যুক্তি কোন কাজেই আসে নি। এছাড়াও বলা যেতে পারে যে কোন অস্থায়ী সদস্যের মাধ্যমে কোন বিশেষ এলাকার অথবা কোন বিশেষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের ধারণাও কোনক্রমেই সংশয়াতীত ছিল না। (বাস্তবে, কোনরাষ্ট্রের প্রতিনিধির পক্ষে নিজের রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রের হয়ে কথা বলার ক্ষমতা সীমিত। তাঁর উক্তির মাধ্যমে অথবা ভোটদানের মাধ্যমে তাঁর প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মতের প্রতিফলন হতে পারে। তবে যদি তা না হয় তবে অবশ্য কিছুই করণীয় থাকে না)।

জাতিপুঞ্জের বাস্তব অভিজ্ঞতায় উপরিউক্ত সমস্ত তত্ত্বগত আপত্তি সঠিক বলে প্রমাণিত হলেও ফল হয়েছিল বিপরীত। ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহ লীগ পরিষদে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির স্বার্থে বৃহৎশক্তিবর্গকে নিয়ন্ত্রিত করার অস্ত্র হিসাবে জাতিপুঞ্জকে ব্যবহার করাই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল। ফলে লীগ পরিষদে অস্থায়ী সদস্যদের সংখ্যা চার থেকে বেড়ে ছয় হয় 1922 খৃষ্টাব্দে, নয় হয় 1926 খৃষ্টাব্দে, দশ হয় 1933 খৃষ্টাব্দে এবং এগারো হয় 1936 খৃষ্টাব্দে। প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে এ ব্যবস্থা কোনক্রমেই

নিখুঁত ছিল না। তবে জাতিপুঞ্জের রাজনীতির ধারা অনুসারে বিভিন্ন আঞ্চলিক অথবা গোষ্ঠীগত সুযোগ-সুবিধার ধারণা অগ্রাধিকার লাভ করেছিল। নিজেদের প্রকৃত অথবা কল্পিত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব হবে মনে করে বিভিন্ন অঞ্চল বা গোষ্ঠী পরিষদে সদস্যপদের জন্য তাদের 'প্রার্থীকে' যথাশক্তি সমর্থন করতো।

ডাম্বারটন ওক্সের প্রস্তাবের সময় কয়েকটি রাষ্ট্রের হাতে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, তা' জাতিপুঞ্জের আমলে অকল্পনীয় ছিল। অথচ মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে নিরাপত্তা পরিষদের গঠন সম্পর্কিত আলোচনার সময় জাতিপুঞ্জের নজিরের স্বপক্ষে জোরালো অভিমত গড়ে উঠে। ডাম্বারটন ওক্স প্রস্তাবের সময় তত্ত্বগতভাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে নিরাপত্তা পরিষদে ক্ষুদ্রশক্তি সমূহেরও প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা ছয়ের (সাময়িকভাবে স্থিরীকৃত) বেশী করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল (যদিও ফলপ্রসূ হয়নি)। এবং চার্টার প্রণয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে (যা জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে কখনই হয়নি) বলা হয়েছে যে, পরিষদে অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নির্বাচন প্রাক্কালে (প্রথমতঃ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাসহ রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য উদ্দেশ্য-সমূহের প্রতি সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অবদানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে (23 নম্বর ধারা)। এটা হয়েছিল ক্যানাডার পীড়াপীড়িতে এবং এই উপধারা ঠিকমত প্রয়োগ করা হলে ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সম্ভব হতো। বাস্তবতঃ অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নির্বাচনে এই উপধারার বিষয়বস্তুকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় সাধারণ সভা বরং (লীগ সভার মতই) অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার কথা না ভেবে শুধু আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীগত বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং 'বিশেষ লক্ষ্য' রেখেছে 'পৃথিবীর ন্যায্য ভৌগোলিক বিভাগ' সম্পর্কিত চার্টারের বিধানের প্রতি।

বিশুদ্ধতাবাদীদের কাছে নিন্দার্হ হলেও এটা শুধু সাংবিধানিক দুর্বলতার ব্যাপার নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতির প্রশ্নও। আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে নির্বাচনের বাস্তব মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। 1919 খৃষ্টাব্দ থেকে চলে এলেও এবং এর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন জাতির গৌরব বা ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিহিত থাকলেও এর বাস্তব মূল্য

অস্বীকার করা যায় না। নিরাপত্তা পরিষদকে যখন বিশ্বজনমতের কেন্দ্র-বিন্দু হিসাবে কাজ করতে হয় তখন অন্ততঃ বিতর্কের দিক থেকে দেখতে গেলে (যৌথ সামরিক ব্যবস্থার দিক থেকে না হলেও) আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীগত ভিত্তিতে অস্থায়ী সদস্য গ্রহণের পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হয়। সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে অতিরঞ্জন করা ঠিক হবে না ; এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রশক্তির সদস্যপদ লাভের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ মাঝারি শক্তিগুলির সহযোগিতা লাভে হয়তো বঞ্চিত হয়েছে ; তবে পরিষদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য অথবা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার জন্য এই সমস্ত অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে যথার্থভাবে দায়ী করা যায় না। নিরাপত্তা পরিষদের প্রকৃত দোষ ত্রুটির উৎস আবিষ্কার করতে চাইলে সন্ধান অন্যত্র চালানোই বাঞ্ছনীয়।

বলবৎমূলক ব্যবস্থাকে (Sanctions clause, XVI নং ধারা) সনদের সর্বাধিক ত্রুটিযুক্ত অংশ-সমূহের একটি বলে অভিহিত করার ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কগণ এবং জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিগণ (দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে) মোটামুটি একমত ছিলেন। কোন রাষ্ট্র সনদের বিধানাদি লঙ্ঘন করে যুদ্ধলিপ্ত হলে জাতিপুঞ্জের সভ্যরাষ্ট্রসমূহ সনদের ষোল নম্বর ধারা অনুসারে তত্ত্বগতভাবেই উক্ত রাষ্ট্রের সাথে সমস্ত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু সনদের 10 নম্বর ধারার ভাষ্য হিসাবে 1923 খৃষ্টাব্দে লীগ সভা-কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবের ফলে ষোল নম্বর ধারার কার্য্যকারিতা সর্বাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। এবং সনদ ব্যবস্থা রক্ষার্থে জাতিপুঞ্জকর্তৃক অবলম্বিত সামরিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জাতিপুঞ্জ বাহিনীর গঠনকল্পে বিভিন্ন সদস্যকর্তৃক দেয় প্রয়োজনীয় স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী সম্পর্কে সুপারিশ করার মামুলী ক্ষমতাই শুধু লীগ পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়। দুদিক থেকে এ ব্যবস্থা ত্রুটিযুক্ত ছিল। সামরিক সাহায্যের জন্য জাতি-পুঞ্জের আহ্বানে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া সদস্যরাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল এবং পূর্বেই জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সংগঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভ্যরাষ্ট্রকর্তৃক দেওয়া সেনাবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কোন ব্যবস্থা এতে করা হয়নি।

চার্টারের সপ্তম অধ্যায়কে উপরিউক্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা

6

করা হয়েছে। 42 নম্বর ধারায় নিরাপত্তা পরিষদকে 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনী দ্বারা পদক্ষেপ' গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং 43 নম্বর ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহ্বান করতে পারে। এ ধরনের যৌথ সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি যাতে আগে থেকেই সম্ভব হয়, সে ব্যবস্থা (43 নম্বর থেকে 47 নম্বর ধারার বিধানাদির বলে) সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর মাধ্যমে করা হয়েছে। পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সামরিক প্রধানদের নিয়ে (অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের নিয়ে) এই উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হবে। 'সামরিক প্রয়োজন' সম্পর্কিত বিষয়ে পরিষদকে অবহিত করা এই উপদেষ্টা মণ্ডলীর কর্তব্য এবং নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই উপদেষ্টামণ্ডলীই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে কি ধরণের সৈন্যবাহিনী দেওয়া যায় এবং পরিষদকে কি কি সুবিধা ও সাহায্য দেওয়া যায় সে সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ 'যথাসম্ভব শীঘ্র' নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আলোচনা আরম্ভ করবে। যৌথ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনে সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় বিমান বাহিনীর বিভিন্ন দলকে যাতে অচিরেই কাজে লাগানো যায় সে ব্যবস্থা করবে। এবং সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর সহযোগিতায় এসব হবে। সনদের এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে চার্টারকে মুক্ত রাখা হলেও এর সবকিছুই সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর বাস্তব কার্য্যকারিতা ও যথাযথ সামরিক চুক্তির উপর নির্ভরশীল।

অচিরেই সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করা হয়েছিল। 1946 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর 4 তারিখে লণ্ডনে এর প্রথম বৈঠক হয় এবং ফেব্রুয়ারীর 16 তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ এই উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রথম কাজ হিসাবে 43 নম্বর ধারার (অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে সভ্য-রাষ্ট্রসমূহের চুক্তি বিষয়ক) সামরিক তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব একে অর্পণ করে। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্যের দেশগুলির মধ্যের বিভেদ সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে গুরুতরভাবে প্রতিফলিত হওয়ায় এর সাফল্যের সম্ভাবনা শুরু থেকেই ছিলনা বললেই হয়। তবুও বৎসরাধিককাল গোপনে কাজ করার ফলে এই উপদেষ্টামণ্ডলী 1947 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়।

প্রতিবেদনের সব বিষয়েই যে মতানৈক্য হয়েছিল তা' বলা যায় না। প্রতিবেদনের যে পঁচিশটি ধারা সম্পর্কে মতৈক্য হয়েছিল সেগুলির মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ছিল (যেমন পরিষদের স্থায়ী সদস্যসমূহকর্তৃক বেশীর ভাগ সৈন্য সরবরাহ করা)। আবার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ষোলটি বিষয়ে মতৈক্য সম্ভব হয়নি। যেমন, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স কমসংখ্যক সৈন্য সরবরাহের পক্ষপাতী ছিল এবং মার্কিন মত ছিল বিপরীত; যেমন, সৈন্য সরবরাহের ব্যাপারে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন সমতার পক্ষপাতী হলেও অন্যান্য সদস্যসমূহের ভিন্নমত ছিল। এসমস্ত খুঁটিনাটি সম্পর্কে মতানৈক্য খুব বড় কথা নয়। তবে এসবের পিছনে যে পারস্পরিক সন্দেহ (রাজনৈতিক) ছিল তা' মোটেই অবজ্ঞার বিষয় ছিলনা। শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে এক বাস্তব সামরিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক উপদেষ্টা-মণ্ডলীকে সাধারণ নীতি সম্পর্কে যথাযথভাবে নির্দেশ দানে অসমর্থ হওয়ার ফলে উদ্ভূত অচলাবস্থা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। 1948 খৃষ্টাব্দের 2রা জুলাই সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী আর কিছু করা সম্ভব নয় বলে খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে দেয় এবং সেই সময় থেকে এই উপদেষ্টামণ্ডলী নামেমাত্রই টি'কে আছে।

নিরাপত্তা পরিষদের এই অসাফল্যের ফলে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থাপনার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ অকেজো হয়ে পড়ে। তবুও চার্টারের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত শান্তিভঙ্গের হুমকি, শান্তিভঙ্গ অথবা আগ্রাসী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনার প্রশ্নে এই অচলাবস্থা শুরু হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে কোরিয়ায় যৌথ সামরিক ব্যবস্থাবলম্বনে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রসংঘ (জাতিপুঞ্জের জন্মের সময় থেকে) কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। যে অনুকূল পরিস্থিতির ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল তা' তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এও দেখা গেছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যবিধিজাত দুর্বলতার ফলে পরিষদে অচলাবস্থার সময় পরিস্থিতি মোকাবিলা করার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সাধারণ সভাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। 1950 খৃষ্টাব্দ থেকে 1960 এর দশকের শুরুর দিকের বৎসরগুলি পর্য্যন্ত মনে হয়েছিল যে চার্টারের সপ্তম অধ্যায়ের অন্তর্গত যে কোন ধারার প্রয়োগের প্রশ্নে "শান্তির জন্য ঐক্য" প্রস্তাবে বর্ণিত বিধানের বলে সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। তবে সোভিয়েৎ ও ফরাসী অর্থনৈতিক ভেটো (Financial Veto) প্রয়োগের

ফলে উদ্ভূত অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায় বললেই হয়।

সোভিয়েৎ প্রতিনিধিগণ সবসময়ই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যেহেতু 43 নম্বর ধারা (অর্থাৎ পরিষদের সদস্যসমূহের মধ্যে আলোচনা-ভিত্তিক চুক্তিকরণ) কখনই বলবৎ হয়নি, সুতরাং 41 নম্বর এবং 42 নম্বর ধারাও (অর্থাৎ পরিষদকে অর্পিত যৌথ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ক্ষমতা) প্রযোজ্য হতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন মতালম্বীগণ বলেছেন যে, কোরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘকর্তৃকগৃহীত পদক্ষেপ চার্টারের সপ্তম অধ্যায় অনুসারে বৈধ এবং এ বিষয়ে তাঁরা বিশেষ করে 39 নম্বর ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে এই ধারা বলে নিরাপত্তা পরিষদ শুধু 'সুপারিশই' করতে পারে; যৌথ ব্যবস্থাবলম্বনে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করার ক্ষমতা এই ধারাবলে পরিষদকে দেওয়া হয়নি। একথা অবশ্য ঠিক যে এই ধারার ফলে যৌথ সামরিক ব্যবস্থায় সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক অংশ গ্রহণের অনুকূলে জোরালো নৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। 1966 খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রশ্নে উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে যখন চরম উত্তেজনা তখনই নিরাপত্তা পরিষদ সর্বপ্রথম চার্টারের সপ্তম অধ্যায় অনুসারে সোজাসুজিভাবেই শান্তি বলবৎমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণ রোডেশিয়ার অবৈধ স্বাধীনতা চলতে থাকলে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে বলে বেইরা (Beira) বন্দরে পেট্রোলবাহী জাহাজ পৌঁছনো 'প্রয়োজনে বলপূর্বক' নিবারণ করার জন্য এপ্রিল মাসে বৃটেনকে যথোচিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্মিথ্ সরকার এসব অবজ্ঞা করায় 1966 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নিরাপত্তা পরিষদ (রাষ্ট্রসংঘের ইতিহাসে সর্বপ্রথম) দক্ষিণ রোডেশিরার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 'দক্ষিণ রোডেশিয়া পরিস্থিতি শান্তির ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকী স্বরূপ' প্রতিভাত হওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদ 39 নম্বর ও 41 নম্বর ধারার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সমস্ত সদস্য (এবং সদস্য নয় এমন) রাষ্ট্রসমূহকে দক্ষিণ রোডেশিয়ায় প্রস্তুত ব্যাপক সংখ্যক পণ্যসামগ্রী আমদানী না করতে এবং ঐ দেশে পেট্রোল, বিমান, অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী না করতে এবং দক্ষিণ রোডেশিয়াকে কোন ধরনের অর্থনৈতিক সাহায্য না দিতে নির্দেশ দেয়।

1968 খৃষ্টাব্দের মে মাসে নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তর বলে দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে ব্যাপক ও বাধ্যতামূলক করে, যা' জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘের ইতিহাসে আগে কখনই হয়নি। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগাল এই নির্দেশ সর্বতোভাবে অমান্য করার জন্য, দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ঐ দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সর্বতোভাবে ছিন্ন করায় অসমর্থ হওয়ার জন্য এবং রোডেশিার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তের অনুকূলে ভোটদানকারী বেশ কিছু রাষ্ট্র উক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন গোড়া থেকেই এড়িয়ে যাওয়ায় ঈপ্সিত ফললাভ হয়নি। এর ফলে স্মিথ্ সরকার স্বকীয় শক্তি সংহত করার, দক্ষিণ রোডেশিয়াকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করার এবং কৃষ্ণকায় সংখ্যাগরিষ্ঠের উপরে অধিকতর বিধিনিষেধ আরোপ করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদ 1970 খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সমস্ত রাষ্ট্রকে দক্ষিণ রোডেশিয়ার সাথে সমস্ত সম্পর্ক—কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক—ছিন্ন করতে এবং সমস্ত ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা ছিন্ন করতে বলে। আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি অবশ্য আরও বেশী দাবী (এতে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের সমর্থন তারা পেয়েছিল) করেছিল। বৃটেন কর্তৃক বলপ্রয়োগে স্মিথ্ সরকারের অপসারণ তারা চেয়েছিল। এই দাবীর পিছনে সাধারণ সভায় সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভে তারা সক্ষম হলেও নিরাপত্তা পরিষদে তাদের পীড়াপীড়ির ফলে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (এই প্রথম) ভেটো প্রয়োগ করে।

মধ্যপ্রাচ্যের মত রোডেশিয়া প্রশ্নেও চার্টার প্রণেতাগণের প্রত্যাশা ও নিরাপত্তা পরিষদের কাজের মধ্যে পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠে। রাষ্ট্রসংঘের জন্মের প্রথম দিকেই নিরাপত্তা পরিষদের এধরণের ব্যর্থতার স্বীকৃতি হিসাবে অনেক রাষ্ট্রই বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে (যেমন ন্যাটো) নিরাপত্তার চেষ্টা করেছে। ঐ সময় থেকেই বৃহৎশক্তিগুলি এবং বহু ক্ষুদ্রশক্তি রাষ্ট্রসংঘের প্রতি আস্থাশীল থাকা সত্ত্বেও সমমনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তির উপরই নিরাপত্তার জন্য নির্ভর করেছে। অর্থাৎ ক্ষমতার ভারসাম্যের (balance of power) পুরোনো নীতিই ভিন্ন প্রকারে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। চার্টার প্রণেতাগণ এটা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। এর জন্যই 51 নম্বর ধারার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং উক্ত ধারায় ব্যপকার্থে বলা হয়েছে যে "বর্তমান চার্টারের কোন কিছুই একক

বা যৌথ আত্মরক্ষার সহজাত অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে না।" আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতা দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা সম্ভব নয় অথবা কোন রাষ্ট্রের গুরুতর স্বার্থ ব্যাহত না করে কেবল ছোটখাটো যুদ্ধ বন্ধ কয়াই রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে সম্ভব (যেমন কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের কঙ্গোবাহিনী অথবা মধ্যপ্রাচ্যে জরুরীবাহিনী করেছিল) ভেবেই 51 নম্বর ধারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চার্টারকর্ত্তৃক অর্পিত এই কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তা পরিষদের দুর্বলতার অর্থ এই নয় যে পরিষদের আর কিছুই করার নেই। শান্তি বলবৎমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পরিষদকে দেওয়া হলেও পরিষদের গঠনশৈলীর দিকে লক্ষ্য রেখে চার্টার প্রণেতাগণ এর উপর আরও কার্য্যভার অর্পণ করেছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের প্রশাসনিক দায়িত্বভার পরিষদের হাতে না থাকলেও পরিষদের উদ্যোগ ও সম্মতি ব্যতিরেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ে (মহাসচিবের নির্বাচন ও নূতন সদস্যরাষ্ট্র গ্রহণে) সাধারণ সভা কিছুই করতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদের সাতটি (এখন নয়টি) সদস্যরাষ্ট্রকর্ত্তৃক (স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহ সহ) সুপারিশক্রমে মহাসচিব সাধারণ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হন। এর ফলে বৃহৎশক্তিসমূহের আস্থাভাজন ব্যক্তিই মহাসচিবরূপে নির্বাচিত হতে পারেন। এছাড়া অবশ্য উপায়ও ছিলনা। সাধারণ সভা অবশ্য পরিষদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করতে পারে, তবে পরিষদকে এড়িয়ে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামত কোন ব্যক্তিকে মহাসচিবের পদে নির্বাচিত করতে পারে না। পরিষদকৃত মনোনয়ন নিয়ে সাধারণ সভায় যাতে বিতর্ক না হয় সেজন্য প্রস্তুতি কমিশন সচিবের পদে নির্বাচনের জন্য পরিষদকর্ত্তৃক শুধু একজন প্রার্থীর নাম প্রেরণের সুপারিশ করেছিল। মিঃ লাই, মিঃ হ্যামারস্কশোল্ড এবং মিঃ য়ু থাণ্টের মনোনয়ন এই সুপারিশের ধারা অনুসারেই হয়েছিল। একথা অবশ্য ঠিক যে এঁদের প্রত্যেকের নির্বাচনের আগে দর কষাকষিও কম হয়নি।

আমরা আগেই দেখেছি যে রাষ্ট্রসংঘে নূতন সদস্য গ্রহণের সময় প্রচণ্ড মত বিরোধ দেখা দেয়। এক্ষেত্রেও সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের আগে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ প্রয়োজন হয় (4 নম্বর ধারা)। অর্থাৎ, পরিষদের নয়টি সদস্যরাষ্ট্র (স্থায়ী সদস্যসমূহ সহ) সুপারিশ করার পরে সাধারণ সভায় গৃহীত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সদস্যপদ প্রার্থী দেশের রাষ্ট্রসংঘভুক্তি হয়। এর জন্য নূতন সদস্য গ্রহণের সময় ভেটোর ছড়াছড়ি হয়ে থাকে। বস্তুতঃ সোভিয়েৎ ইউনিয়নের গোড়ার দিকের

ভেটোগুলির অর্ধেকই সদস্যপদ দান আটকানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিল। সাধারণ সভায় বিতর্ককালে এ নিয়ে প্রচুর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভেটোবলে পরিষদে সুপারিশের পথ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করার জন্য পরিষদের উপর চাপসৃষ্টি করাও হয়েছে। সদস্য-পদভুক্তি সম্পর্কে ভেটোপ্রয়োগ বৈধ হলেও এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভও প্রদর্শন করা হয়েছে। সদস্যপদ প্রদান সম্পর্কে এপর্যন্ত দুটি মতবাদ গড়ে উঠেছে। চার্টারের কোন বিশেষ ধারার উপর নির্ভরশীল না হলেও এর একটি মতবাদ হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ সার্বজনীন হওয়া উচিত কারণ রাষ্ট্রসংঘ হচ্ছে 'বিশ্ব সংস্থা'। অর্থাৎ সদস্যপদদানের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন কারণ দেখাতে না পারলে সদস্যপদ প্রার্থী সমস্ত দেশকেই রাষ্ট্রসংঘ-ভুক্ত করা উচিত। ভিন্নমত অনুসারে রাষ্ট্রসংঘ হলো এমন একটি সমিতি (club) যেখানে সদস্যপদজনিত সুবিধা আদি সদস্যরাষ্ট্রসমূহের জন্য এবং চার্টার আরোপিত 'দায় স্বীকার করে' এবং রাষ্ট্রসংঘের বিবেচনায় উক্ত দায় পালনে 'সক্ষম এবং ইচ্ছুক' এমন অন্যান্য সমস্ত 'শান্তিপ্রিয়' রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত থাকা উচিত। এই ধারণা অনুসারে সদস্যপদ-প্রাপ্তির যোগ্যতাবলী সমিতির নিকট এবং বিশেষ করে সমিতির পরিচালক সদস্যদের নিকট প্রমাণ করার দায়িত্ব সদস্যপদ প্রার্থী রাষ্ট্রের উপরই এসে পড়ে। চার্টারের ভাষা অনুসারে অবশ্য পরোক্ত মতবাদই সঠিক। তবে এই মতবাদের ত্রুটি এই যে, 'শান্তিপ্রিয়' ইত্যাদি যোগ্যতাবলীর পরীক্ষায় আদি সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অনেকেই উত্তীর্ণ হতে পারবে না। বাস্তবতঃ আদি সদস্যসমূহ (বিশেষ করে পরিষদের স্থায়ী সদস্যসমূহ) নিজেদের সুবিধামত এবং সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য না রেখেই দুদিকের যুক্তিরই অবতারণা করেছে। প্রকৃতপক্ষে বিবেচ্য হচ্ছে সদস্যপদ প্রার্থী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রসংঘ-ভুক্তি হলে কোন্ দিক জোরদার হবে। এর থেকে সাধারণভাবে অনুমান করা যায় যে সদস্যপদদান সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দেশগুলি সমর্থন করেছে এবং সোভিয়েৎ গোষ্ঠী সন্দিহান হয়েছে। কিন্তু সাধারণ সভায় নূতন সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সদস্যপদের সার্বজনীনতার নীতি জোরদার হয়েছে। কোন সদস্যপদ প্রার্থী রাষ্ট্রের আবেদন গ্রাহ্য না করার কারণ দেখানোর দায়িত্ব এখন সদস্যপদদানে অনিচ্ছুক সদস্যসমূহের উপর এসে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের নির্বাচন পদ্ধতি থেকে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে ভিন্ন ধরনের ক্ষমতা বণ্টনের কথা

মনে হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য রাষ্ট্রের নির্বাচন হয় না, হয় ব্যক্তিবিশেষের। বিচারালয়ের 'বিধি' (statute) অনুসারে সেই সমস্ত ব্যক্তিগণ এই বিচারালয়ের বিচারপতি পদে নির্বাচিত হবেন যাঁরা প্রশংসনীয় নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, যাঁরা তাঁদের নিজেদের দেশে উচ্চতম বিচারালয়ের পদাধিকারী হওয়ার যোগ্য এবং যাঁরা আন্তর্জাতিক আইনে উচ্চমানের যোগ্যতা-সম্পন্ন, এবং লক্ষ্য রাখা হয় যাতে এই সমস্ত ব্যক্তিগণ বিশ্বের বিশিষ্ট সভ্যতাগুলির এবং প্রধান আইন ব্যবস্থাসমূহের প্রতিনিধি হন। এই বিশদ নির্বাচন ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য জাতিপুঞ্জের আমলের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সদস্যরাষ্ট্রসমূহ মনোনয়ন পত্র পেশ করে এবং সেগুলি নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভায় প্রেরিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভায় গোপনে ভোট গ্রহণ হয় এবং উভয় ক্ষেত্রে মোট সদস্য-সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ নির্বাচিত হন। সমস্ত শূন্যপদ পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নির্বাচিত হলে অপ্রয়োজনীয় সংখ্যা বাদ না দেওয়া পর্য্যন্ত ভোট চলতে থাকে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণের নির্বাচনে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভায় ভোটজনিত পার্থক্য হলেও তা' একই উপায়ে সমাধান করা হয়। পনেরোজন বিচারপতি নিয়ে এই বিচারালয় গঠিত হয় এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর পাঁচজন করে বিচারপতি অবসর গ্রহণ করেন। পুন-র্নির্বাচনের ব্যবস্থা অবশ্য আছে।

ভিন্ন ধরনের হলেও আরেকটি বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার সঙ্গে ভাগ করে ক্ষমতা ভোগ করে। তা' হলো 47 নম্বর ধারার প্রতিপাদ্য বিষয়, অর্থাৎ, 'অস্ত্র-শস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য নিরস্ত্রীকরণ'। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত 'সাধারণ নীতি' নির্ধারন করার দায়িত্ব সাধারণ সভার (এর গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে) উপর (11 নম্বর ধারাবলে) এবং ঐ সম্পর্কে পাকাপাকি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ভার পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়। সঙ্গত কারণেই (যদিও কোন সুফলই হয়নি) এই পরোক্ত দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীন সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর উপর দেওয়া হয়েছে। কারণ শান্তিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব যে অঙ্গের উপর ন্যস্ত, সেই অঙ্গের উপরই বিভিন্ন জাতীয় বাহিনীর (রাষ্ট্রসংঘের কাজে নিয়োজিত বাহিনী ছাড়া) নিয়ন্ত্রণভার থাকা উচিত।

দুটি কারণে অবশ্য এ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়নি। প্রথমটি হচ্ছে আণবিক

বোমার আবিষ্কার। এরফলে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার প্রকৃতির প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে যা' চার্টার প্রণেতাগণ ভাবতে পারেন নি। দ্বিতীয় কারণ সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা। এর জন্যই আণবিক বোমা সম্পর্কিত সমস্যা মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের প্রথম দিকের সবচেয়ে জোরদার প্রচেষ্টা সাধারণ সভার মাধ্যমেই (নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে নয়) করা হয়। 1946 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত আণবিকশক্তি কমিশন (Atomic Energy Commission) নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসমূহ ও ক্যানাডাকে নিয়ে গঠিত হলেও এবং উক্ত কমিশন নিরাপত্তা সম্পর্কিত' বিষয়ে পরিষদের কাছে দায়ী থাকলেও এই কমিশন সাধারণ সভা দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কমিশনের দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাসের বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই; সামান্য সময়ের জন্য এই কমিশন আশার সঞ্চার করলেও 1948 খৃষ্টাব্দ নাগাদ এর ইতিহাস সম্পূর্ণ বিফলতার ইতিহাসেই পর্য্যবসিত হয়। 1947 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভা-কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদ পরিষদের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রকে নিয়ে 'গতানুগতিক অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কিত কমিশন' (Commission for Conventional Armaments) গঠন করে। 1952 খৃষ্টাব্দ নাগাদ এই কমিশনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতের শিকার হয় এবং সাধারণ সভার এক প্রস্তাব বলে বিফল এই দুই কমিশনকে একত্রিত করে 'নিরস্ত্রীকরণ কমিশন, (Disarmament Commission) গঠন করা হয়। সদস্যপদের দিক থেকে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনকে হুবহু আণবিক শক্তি কমিশনের মত করা হয় এবং একে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। অতএব দেখা যায় যে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত জটিল সমস্যা সমাধানের মূল দায়িত্ব আরেকবার পরিষদের উপরই ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের কার্য্যের অগ্রগতি (বরং ঠিক করে বলতে গেলে এর বিফলতা) সম্পর্কে সাধারণ সভায় প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে সাধারণ সভার মাথা ব্যথা কম নেই। সোভিয়েৎ প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ কমিশন বর্জন করলে 1958 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভা রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রকে নিয়ে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের পুনর্গঠন করে। এতে অবশ্য কিছু ফল হয়নি। 1959 খৃষ্টাব্দে দশটি দেশকে নিয়ে একটি বেসরকারী সমিতি (রাষ্ট্রসংঘের বাইরে) গঠন করা হয়। এতে 'ন্যাটো' এবং 'ওয়ারশ' জোটের দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব রাখা হয় এবং এতেই পরবর্তীকালের

বেশীর ভাগ আলোচনা হয়। 1961 খৃষ্টাব্দে নিরপেক্ষ দেশগুলির অন্তর্ভুক্তির ফলে এই সমিতির সদস্যসংখ্যা আঠারো হয়। যা-ই হোক্, সাধারণ সভার বিতর্কে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমেই এর উদ্বেগের কথা বোঝা যায়। 1963 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েৎ ইউনিয়নের মধ্যে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তিকে (Nuclear Test Ban Treaty) এই উদ্বেগেরই প্রতিফলন বলা যেতে পারে। নিরস্ত্রীকরণের মূল সমস্যার ব্যাপারে অবশ্য কোন অগ্রগতিই হয়নি। সোভিয়েৎ পীড়াপীড়িতে নিরাপত্তা পরিষদ 1965 খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠক পুনরাহ্বান করে। বাহ্যতঃ নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের অচলাবস্থা এর কারণ হলেও আসল কারণ ছিল ঊনবিংশতিতম সাধারণ সভা ভেঙে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। এতে অবশ্য কিছুই লাভ হয়নি এবং দশ সদস্য-বিশিষ্ট সমিতিই (1969 খৃষ্টাব্দে এর সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে ছাব্বিশ করা হয়) আলোচনার মুখ্যকেন্দ্র হিসাবে থেকে যায়। আণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নেই উদ্বেগ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে এবং 'আণবিক অস্ত্রের প্রসার নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তি' (Non-Poliferation Treaty) স্বাক্ষরিত হওয়ায় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা অগ্রগতি হয় এবং 1969 খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের মধ্যে আক্রমণাত্মক অস্ত্রাদি সীমিতকরণ সম্পর্কিত আলোচনা' (Strategic Arms Limitation Talks) আরম্ভ হওয়ায় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রতিক্রিয়া স্পষ্টতঃই শ্লথ হলেও এই সমিতি (ছাব্বিশ জাতিবিশিষ্ট) সাধারণ সভার মতই রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধ (chemical and biological warfare) নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করে।

নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে যেমন নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক 'বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির' ব্যাপারেও উভয়েরই কর্তব্য রয়ে গেছে। এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সাধারণ সভাকে অনুসন্ধান ও বিতর্কজনিত ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হলেও পরিষদই মুখ্য কার্য্যকরী অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। চার্টারের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (যেখানে আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধানাদি আছে) সাধারণ সভার চেয়ে নিরাপত্তা পরিষদের উল্লেখ অনেক বেশী রয়েছে। তাছাড়াও, নিরাপত্তা পরিষদ আলোচনা করছে এমন কোন

বিষয়ে সাধারণ সভা আলোচনা করতে পারলেও বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পরিষদের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে (12 নম্বর ধারা) । 'পরিষদে বৃহৎশক্তিবর্গ একযোগে কাজ করবে'—এই ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখেই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এদিক থেকে দেখতে গেলে চার্টার-ব্যবস্থা জাতিপুঞ্জকে অনুসরণ করেছে। বিবাদ থেকেই অধিকাংশ যুদ্ধের সূত্রপাত ; আন্তর্জাতিক বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হলেও শান্তিরক্ষকের ভূমিকায় নিরাপত্তা পরিষদের প্রয়োজন হয় ।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শান্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ যেখানে যুযুধান দেশগুলির উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে (অর্থাৎ সদস্যরাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে সৈন্য সাহায্য নিয়ে শান্তি-রক্ষার্থে বলপ্রয়োগ করতে পারে), আন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তিকারকের ভূমিকায় পরিষদ বিবদমান দেশগুলির নিকট শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার সুপারিশই শুধু করে (যদিও সে সুপারিশ অগ্রাহ্য হলে শান্তি-ভঙ্গের বিপদ থাকে) । বস্তুতঃ এটা হচ্ছে বর্তমান অসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতিফলন। সব দেশই স্বীকার করে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পাশাপাশি অবস্থানের জন্য বিবাদ ও যুদ্ধ হতে পারে এবং যুদ্ধ করা অন্যায় (অন্ততঃ কাগজে-কলমে) । অথচ দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, বাধ্যতামূলকভাবে আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তি করার প্রশ্নে খুব কম দেশই ইচ্ছুক। অন্য কথায়, আন্তর্জাতিক বিচারপতিদের চেয়ে আন্তর্জাতিক রক্ষীবাহিনীর প্রতি তারা বেশী সদয়। আধুনিক যুদ্ধের বিধ্বংসী প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশ সচেতন হলেও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নকারী এবং আইন সংশোধনকারী সংস্থার জন্মের পূর্বেই বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক বিচার-ব্যবস্থার গ্রহণ-যোগ্যতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। অবশ্য এও বলা যেতে পারে যে, শান্তিরক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা শুধু কাগজে-কলমেই স্বীকার করা হয়েছে ; চার্টারের শান্তি বলবৎমূলক ব্যবস্থা অকেজো বলে প্রমাণিত হয়েছে ।

আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদের (এবং সাধারণ সভার) ভূমিকা কোনক্রমেই বিচারালয়ের ভূমিকা নয়, বরং বলা চলে বিশেষ ধরণের কূটনৈতিক ভূমিকা। ক্লস্ উইৎস্কে (Clauswitz) অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নিরাপত্তা পরিষদ ভিন্ন উপায়ে কূটনৈতিক ভূমিকাই (গতানুগতিক অর্থেই) পালন

করে। 33 নম্বর ধারায় এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক বিবাদের শরিকরা 'সর্বপ্রথম আলোচনাভিত্তিক চুক্তি, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, অনুরঞ্জন, সালিশী, বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণ, আঞ্চলিক সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা অবলম্বনের মাধ্যমে অথবা তাদের নিজেদের পছন্দমত অন্যান্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ সমাধান করবে।' বস্তুতঃ এগুলি গতানুগতিক কূটনীতিরই ভিন্ন ভিন্ন পন্থা। এবং এই সমস্ত পন্থা ফলপ্রসূ না হলেই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য পরিষদকে কূটনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। কার্য্যতঃ সবসময়ই এ ব্যবস্থা অনুসৃত হয়নি; উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন উপায়ে বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টা করার আগেই অনেক বিবাদ পরিষদের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে। তাতে অবশ্য তেমন কিছু হেরফের হয় না। কোন আন্তর্জাতিক বিবাদজনিত বিপজ্জনক পরিস্থিতি নিরসনে অথবা উক্ত বিবাদ নিষ্পত্তিতে বিবদমান রাষ্ট্রগুলির উপর নিরাপত্তা পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের অঙ্গ হিসাবে শুধু নৈতিকচাপই সৃষ্টি করে থাকে।

আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তিতে পরিষদ বিভিন্ন পন্থা (যার সাথে সংশ্লিষ্ট বিবাদসমূহের বৈচিত্র্যের তুলনা করা চলে) অবলম্বন করেছে। বিবরণের সুবিধার জন্য এই সব পন্থাকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন তদন্ত, বিবদমান দেশগুলির মধ্যে পরিষদের উপস্থিতি (interposition), অনুরঞ্জন, সুপারিশ এবং আবেদন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিবাদ নিষ্পত্তির একাধিক পন্থাকে একযোগে প্রয়োগ করার প্রয়োজন দেখা গেছে।

তদন্ত ঃ প্রমাণের ভিত্তিতে সুপারিশ-কল্পে নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে তদন্ত বলা যেতে পারে। সমস্ত বিবাদের ক্ষেত্রেই ঘটনাবলীর (যার ফলে বিবাদের সৃষ্টি হয়) ক্রমানুয়তা সম্পর্কে, বিবদমান কোন্ রাষ্ট্র কি করেছে, বিভিন্ন ঘটনার সাথে বিবাদের কার্য্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা—এমন কি বিবাদের কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কি না প্রভৃতি নিয়ে মতপার্থক্য প্রায় নিশ্চিতভাবেই হয়। নিরাপত্তা পরিষদ নিজে তদন্ত না করে পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সমিতির মাধ্যমে অথবা সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কমিশনের মাধ্যমে তদন্ত চালায় এবং প্রায়শঃই তদন্তকারী সমিতি অথবা কমিশনকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে (যেমন গ্রীক্ সীমান্ত ঘটনাসমূহ তদন্তকারী কমিশনের ক্ষেত্রে হয়েছিল)। কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্দেহাতীতভাবে নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ হলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই

নিরাপত্তা পরিষদ বিবদমান দেশগুলির অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের কারণ খুঁজে বার করতে সমর্থ হয়েছে।

বিবাদে হস্তক্ষেপ ঃ যখন কোন পরিস্থিতি বিস্ফোরক হয়ে উঠে তখন পরিস্থিতির অবনতিরোধের জন্য বিবদমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বকীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদের উপস্থিতির বাস্তব মূল্য অনেক বেশী হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরণের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবাদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন করাও সম্ভব হয়। তবে যখন কোন পরিস্থিতির অবনতির ফলে যে কোন মুহূর্তে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, তখন শান্তিরক্ষার দিক থেকে এবং বিবদমান দেশগুলিকে সংযত রাখার দিক থেকে পরিষদের উপস্থিতি অত্যন্ত কার্য্যকরী হয়। সাধারণতঃ যুদ্ধ-বিরতি পরিদর্শন করার জন্য বিবদমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরিষদের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। উদাহরণ স্বরূপ প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধ বিরতি পরিদর্শন কমিশনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

অনুরঞ্জন ঃ চিরাচরিত কূটনৈতিক পন্থা হিসাবে অনুরঞ্জন হচ্ছে নিরপেক্ষ এবং 'পক্ষপাতহীন মধ্যস্থ' দেশের কাজ। নিরপেক্ষতার জন্যই এ ধরণের মধ্যস্থ দেশ বিবদমান দেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। অনুরঞ্জনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সহজেই এ ধরণের মধ্যস্থতার জন্য কূটনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ কোন সমিতি বা ব্যক্তির উপর অনুরঞ্জনের দায়িত্ব দিতে পারে। ইন্দোনেশিয়া ও হল্যাণ্ডের বিবাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ মধ্যস্থতার জন্য এক সমিতি গঠন করেছিল। এই সমিতির তিনজন সদস্যের একজনকে ইন্দোনেশিয়া, একজনকে হল্যাণ্ড নিযুক্ত করেছিল এবং উক্ত দুই সদস্য তৃতীয়জনকে নিয়োগ করেছিলেন। পাক-ভারত বিবাদে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত সমিতির প্রকৃতি মোটামুটি একই ধরণের হলেও উক্ত সমিতির তিনজন সদস্যকেই নিরাপত্তা পরিষদ মনোনীত করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে আলোচনা-ভিত্তিক মীমাংসা বা অনুরঞ্জনের দিক থেকে দেখতে গেলে কোন সমিতির চেয়ে সুনাম এবং বিবেচনার অধিকারী কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করাই অধিকতর সুবিধাজনক।

সুপারিশ ঃ অনেক সময় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহকে সংযত হতে অথবা অপেক্ষা করতে বললেই কোন বিবাদের নিষ্পত্তি অথবা গুরুতর পরিস্থিতির নিরসন সম্ভব হয়না, স্থিতাবস্থার বাস্তব পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্যালেষ্টাইন ও সুয়েজ প্রশ্নে তাই হয়েছিল।

এ ধরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ বিবাদ নিষ্পত্তির নীতি অথবা কর্তব্য বিবদমান রাষ্ট্রগুলির নিকট সুপারিশ করতে পারে অথবা সেগুলি রূপায়ণের জন্য নিজেই ব্যবস্থা করতে পারে। সুয়েজ প্রশ্ন নিরসনের ভিত্তি হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদ বিভিন্ন নীতি সুপারিশ করেছিল। যেমন সুয়েজ খাল ব্যবহার সম্পর্কে সমস্ত দেশের অধিকার, সুয়েজে মিশরের সার্বভৌমত্ব এবং সুয়েজ হতে আয়ের একটা অংশ সুয়েজের উন্নতির জন্য ব্যয় করা। অবশ্য এ ধরণের সুপারিশকে চার্টার বর্ণিত ন্যায়ের ধারণার সাথে এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। আবার আরেকটা দিকও আছে। নিরাপত্তা পরিষদকৃত সুপারিশের বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিবদমান রাষ্ট্রগুলির উপর নির্ভর করতে হয় বলে সুপারিশ যাতে বাস্তবভিত্তিক হয় সেদিকেও পরিষদকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

আবেদন ঃ অনেক সময় বিবাদ নিষ্পত্তিতে বিভিন্ন পন্থা বিফল হওয়ার জন্য, তথ্য সংগ্রহের কাজে সুবিধার জন্য, যুদ্ধবিরতি ঠিকমত বজায় রাখার জন্য অথবা আলোচনাভিত্তিক মীমাংসার পথ সুগম করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির নিকট সংযতভাবে চলার জন্য সোজাসুজি আবেদন করতে পারে। পরিস্থিতিগত বিভিন্নতার জন্য পরিষদকেও বিভিন্ন ধরণের আবেদন করতে হয়েছে। ইজরায়েল কর্তৃক জেরুজালেম শহরের মর্য্যাদা (Status) পরিবর্তন রোধকল্পে পরিষদকৃত 1969 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের 4 তারিখের প্রস্তাবকে এই ধরণের আবেদনের নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এই প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদ....

(1) জেরুজালেম শহরের মর্য্যাদা পরিবর্তন করার জন্য ইজরায়েল কর্তৃক গৃহীত সমস্ত পদক্ষেপকে 'অত্যন্ত কঠিন ভাষায় নিন্দা' করছে এবং জেরুজালেমের প্রশ্নে পরিষদের পূর্ববর্তী প্রস্তাবসমূহ ইজরায়েল অবজ্ঞা করায় পরিতাপ প্রকাশ করছে;

(2) জেরুজালেমের মর্য্যাদা পরিবর্তনকল্পে ইজরায়েলকর্তৃক গৃহীত সমস্ত আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপকে অবৈধ বলে এবং উক্ত পদক্ষেপসমূহ জেরুজালেমের মর্য্যাদা পরিবর্তন করতে পারেনা বলে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছে;

(3) এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করার প্রশ্নে ইজরায়েলের ইচ্ছা পরিষদকে জানানোর জন্য ইজরায়েলকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং ইজরায়েল

নেতিবাচক উত্তর দিলে অথবা নিরুত্তর থাকলে 'আরও কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়' তা' ঠিক করার জন্য পরিষদ অনতিবিলম্বে পুনরায় বৈঠকে মিলিত হবে বলে ইজরায়েলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এ ধরণের আবেদনের ক্ষেত্রে পরিষদের সদস্যদের শুভবুদ্ধি ব্যতীত পরিষদের ক্ষমতার উপর অন্য কোন বাধা নেই বললেই চলে। তবে এও মনে রাখা উচিত যে, যে সমস্ত দেশের নিকট আবেদন করা হয়, সেই সমস্ত দেশের উপরই আবেদনের কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। এগুলি আর যাই হোক পরামর্শ, মিনতি অথবা আবেদন ছাড়া কিছুই নয় এবং এগুলি রূপায়ণের ক্ষমতাও পরিষদের নেই। তবে বলা যেতে পারে যে প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদ এধরণের আবেদন বলবৎ করার পথে 1948 খৃষ্টাব্দের 15ই জুলাইয়ের বিখ্যাত প্রস্তাববলে (পূর্বেই এর উল্লেখ করা হয়েছে) অনেকটা এগিয়েছিল। উক্ত প্রস্তাব অনুসারে :

(নিরাপত্তা পরিষদ) প্যালেষ্টাইন পরিস্থিতিকে 39 নম্বর ধারার অর্থে শান্তির প্রতি হুমকী বলে মনে করছে; 40 নম্বর ধারাবলে সংশ্লিষ্ট সরকার ও কর্তৃপক্ষদের এই প্রস্তাব গ্রহণের তারিখ থেকে তিন দিনের মধ্যে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করতে আদেশ করছে, এবং ঘোষণা করছে যে এই আদেশ ভঙ্গের অর্থ হবে চার্টারের 39 নম্বর ধারার অর্থে আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গ যার জন্য চার্টারের সপ্তম অধ্যায় অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কি কি ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা যায় তা' অনতিবিলম্বে বিবেচনা করবে। শুধু এই প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গেই দেখা গেছে যে চার্টারের ষষ্ঠ অধ্যায়বলে (বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) কৃত পরিষদের সুপারিশ অগ্রাহ্য হওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদ চার্টারের সপ্তম অধ্যায়ের (শান্তিভঙ্গের হুমকী, শান্তিভঙ্গ ও আগ্রাসী কার্য্যকলাপের সম্পর্কে পদক্ষেপ সংক্রান্ত) আশ্রয় গ্রহণ করেছিল (এই অধ্যায় অনুসারে পরিষদ শান্তি বলবৎমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারে)। তবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলবৎ করতে সর্বদা অস্বীকার করে পরিষদ ঠিকই করেছে।

1948 খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইন বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর এবং উক্ত বিভাজন ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য এক কমিশন নিয়োগ করার পর সাধারণ সভা যখন দেখে যে এই কমিশনের পক্ষে উক্ত সিদ্ধান্ত বলবৎ করা সম্ভব নয়, তখন সংশ্লিষ্ট কমিশনকে প্রয়োজনীয় সাহায্য

দেওয়ার জন্য সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করে। অবৈধ হবে বলে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত অনুরোধ অস্বীকার করে।

আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা অনেকটা শ্রমিক-মালিক বিভেদ নিরসণের উদ্দেশ্যে গঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের অনুরঞ্জন শাখার মত (যেখানে সরকারী অনুরঞ্জন শাখা বিবাদ নিষ্পত্তির কাজ বিধিনিষেধহীন যৌথ আলোচনার উপরই ছেড়ে দেয়)। কোন শিল্পবিবাদ যতক্ষণ না হিংসাত্মক হয়ে উঠে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বা সমাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সরকার নিজের কার্য্যকলাপ তথ্য-সংগ্রহ, অনুরঞ্জন, সুপারিশ, সালিশী এবং পুলিশী টহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। হয় শ্রমিক নয় মালিকের উপর সরকার নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু শিল্প-বিবাদ অথবা ধর্মঘট চলতে থাকলেও শ্রমিকদের বেতন, কাজের সময় অথবা চাকুরীর অন্য কোন শর্ত নিজের ইচ্ছামত জোর করে চাপিয়ে দেয়না। গণতান্ত্রিক সরকার নাগরিক স্বাধীনতা (civil liberty) রক্ষা করার জন্য সংযত থাকে এবং নিরাপত্তা পরিষদ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের (চার্টার কর্তৃক যথাযথভাবে সংরক্ষিত) প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নিজের কার্য্যকলাপ সীমিত রাখে।

আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পতির ক্ষেত্রে পরিষদের ভেটো-ক্ষমতা নিয়ে প্রায়শঃই ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সান্‌ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ভেটো-ক্ষমতার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে চার্টারের সপ্তম অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নয় (বৃহৎশক্তি ঐক্য ব্যতীত শান্তি বলবৎমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ মোটমুটি অসম্ভব মনে করে), অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে পরিষদের সুপরিশমূলক কাজে (যেমন চার্টারের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে) ভেটো প্রয়োগের সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে। উক্ত অসন্তোষের বিরুদ্ধে বৃহৎশক্তিবর্গের যুক্তি হচ্ছে এই যে ভেটো প্রশ্নে চার্টারের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়কে আলাদা করে দেখা ঠিক নয়। তাদের মতে চার্টারের ষষ্ঠ অধ্যায় অনুসারে কৃত পরিষদের সুপারিশ অগ্রাহ্য হলে পরিষদকে সপ্তম অধ্যায় অনুসারে শান্তিবলবৎমূলক ব্যবস্থার পথে এগুতে হয়। এই যুক্তিরই রেশ্‌টেনে বলা হয়েছে যে (সোভিয়েৎ প্রতিনিধিকর্তৃক) যেহেতু মানব প্রকৃতি হচ্ছে কথা কাটাকাটি থেকে মারামারি আরম্ভ করা, অতএব প্রয়োজনবোধে পরিষদে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কে আলোচনার পথ বন্ধ করায় ভেটো প্রয়োগ অন্যায় নয়। যাই হোক,

এই যুক্তি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হলেও সম্মেলনে ভিন্নমতই প্রাধান্য-লাভ করেছিল। ফলে পরিষদে ভোটদান সম্পর্কিত বিধানে "প্রণালীগত" (Procedural) প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এবং "প্রণালীগত" প্রশ্নের শ্রেণীভুক্ত বলে আলোচনার ক্ষেত্রে ভেটো প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলতঃ যে কোন নয়জন সদস্যের (পনেরোজনের মধ্যে) ভোটে আলোচনার জন্য যে কোন বিষয়কে পরিষদের কর্মসূচীতে রাখা যেতে পারে। এতে অবশ্য উল্লেখযোগ্য কোন সুফল হয়নি। কারণ কোন বিষয়ে আলোচনার শেষে যদি প্রস্তাব গ্রহণের প্রশ্ন উঠে, তখন ভেটো প্রয়োগ করা যায়। অন্য কথায়, পরিষদের স্থায়ী সদস্যসমূহের ভোটসহ নয়টি সম্মতিসূচক ভোটের ভিত্তিতেই কেবল প্রস্তাব গ্রহণ সম্ভব। (অবশ্য পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্য কোন বিবাদে জড়িত থাকলে উক্ত বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিকল্পে পরিষদকর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সদস্য ভেটো প্রয়োগ করতে পারে-না)। এধরণের প্রস্তাব সুপারিশ ছাড়া কিছুই নয় বলে মনে করা যেতে পারে যে, এক্ষেত্রে ভেটো ক্ষমতা না থাকলেও বৃহৎশক্তিবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতোনা। পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্যের নিকট এধরণের কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হলেই ভেটো প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অতএব মনে করা যেতে পারে যে, এধরণের প্রস্তাবে ভেটো ক্ষমতা প্রযোজ্য না হলেও সংশ্লিষ্ট বৃহৎশক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোটদান করতো, সেক্ষেত্রেও ঐ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের মতো শক্তিশালী হতোনা। কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে যে এমন দুটি প্রস্তাবের মধ্যে কোন বাস্তব পার্থক্য হতে পারে কি যার একটি 14—1 ভোটে গৃহীত এবং অন্যটির স্বপক্ষে চৌদ্দটি রাষ্ট্র ভোট দিলেও কোন একটি বৃহৎশক্তিকর্তৃক ভেটো প্রয়োগের ফলে গৃহীত হতে পারেনা? প্রথমটির মত দ্বিতীয় প্রস্তাবের পিছনেও কি যথেষ্ট পরিমাণে সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায়না?

নৈতিক চাপ সৃষ্টি করার পরিবর্তে বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির কোন ব্যবস্থা অবলম্বন যদি কোন প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হয় এবং সে প্রস্তাব যদি ভেটো প্রয়োগে নাকচ হয়ে যায়, তবে চার্টারের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রসঙ্গে ভেটো ক্ষমতার সমালোচনা সঙ্গতভাবেই করা যেতে পারে। ভেটোর ফলেই তথ্যানুসন্ধান সমিতি, যুদ্ধ বিরতি পরিদর্শন কমিশন, পর্য্যবেক্ষকদল প্রভৃতির নিয়োগের পথ বন্ধ হয় এবং পরিষদের কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং ভেটোর ফলেই (বিশেষ করে সোভিয়েৎ) শান্তি বলবৎমূলক ব্যবস্থা নয়

এমন সমস্ত ক্ষেত্রেও পরিষদ তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। একথা ঠিক যে, 1959 খৃষ্টাব্দে লাওস্ প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য এক নজিরের সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত প্রশ্নে পরিষদের সভাপতির মতামত অর্থাৎ অনুসন্ধান চালানোর জন্য কোন উপ-সমিতির নিয়োগ 'প্রণালীগত প্রশ্নের' (Procedural) অন্তর্গত, পরিষদকর্তৃক গৃহীত হওয়ায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে ভেটো-প্রসূত জটিলতার নিরসন হতে পারে।

শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের উপর নির্ভরতার প্রশ্নে বিভিন্ন বিবাদের মধ্যে যেমন পার্থক্য হয়, বিবাদ নিরসনের উপায় হিসাবে প্রকাশ্য আলোচনার প্রশ্নেও বিভিন্ন বিবাদের মধ্যে পার্থক্য হয়। বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির প্রশ্নে প্রকাশ্য আলোচনার সম্ভাব্য ফলাফল (ভেটো-প্রসূত সম্ভাব্য ক্ষতির মত) চার্টার প্রণেতাগণ অবশ্য যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। পরিষদের গোপন বৈঠক অত্যন্ত কম হয় (যেমন মহাসচিবের মনোনয়ন সম্পর্কিত আলোচনা কালে হয়ে থাকে)। তাছাড়া, পরিষদের বৈঠক প্রকাশ্যেই হয় এবং সাধারণের দৃষ্টি পরিষদের উপর (যেমন সাধারণ সভার ক্ষেত্রে) নিবদ্ধ থাকে। তবে সাধারণ সভার তুলনায় পরিষদে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণের সংখ্যা অনেক কম বলে পরিষদের কাজকর্মের কোন কিছুই সাধারণের দৃষ্টি এড়াতে পারেনা। প্রকাশ্য আলোচনার সুফল এবং কুফল এখন অবশ্য অনেকেই স্বীকার করেন। এর ফলে একদিকে যেমন বেতার, সংবাদপত্র, টেলিভিশান ইত্যাদির মাধ্যমে কোন প্রশ্নে বিশ্বের জনমত আকৃষ্ট হয় এবং সংবেদনশীল মনোভাব গড়ে উঠে এবং বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণের কার্য্যধারা নিরীক্ষণ সম্ভব হয়; আবার অন্যদিকে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ প্রচারের স্বার্থে বিশ্বের কোটি কোটি জনসাধারণের (বিশেষ করে স্বদেশের) সম্মুখে (আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সহকর্মীদের দিকে লক্ষ্য না রেখেই) বক্তব্য রাখেন। এর ফলে প্রচারকার্য্যই চলে, আলোচনা অগ্রসর হয়না। বাস্তবতঃ একটা নয়, দুটো নিরাপত্তা পরিষদ আছে। একটা জন সমক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকে মিলিত হয় এবং অন্যটির বৈঠক হয় প্রতিনিধিদের আলাপকক্ষে, ভোজসভায় এবং বিভিন্ন দূতাবাসে। এই দুই পর্য্যায়েই পরিষদের প্রয়োজন। সব সময় এ দুটোর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় না হলেও একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি কাজ করতে পারেনা। কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের তদন্তের জন্য সপ্তাহাধিক অথবা মাসাধিক কাল ধরে ধৈর্য্যসহকারে তথ্য

সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়। এবং বিবাদ নিরসনের দিক থেকে দেখতে গেলে পরিষদকৃত অনুসন্ধানের সর্বৈব প্রচারও অপরিহার্য্য। তবে ঘটনাচক্রে বা কোন বিষয় (যেমন বেসরকারী স্থানীয় চুক্তি) আগেই ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সময়ই কোন যুদ্ধবিরতি পর্য্যবেক্ষকদলের কাজকর্ম ব্যাহত বা পণ্ড হয়ে যায়। আবার কোন গোলযোগপূর্ণ এলাকায় রাষ্ট্রসংঘের পর্য্যবেক্ষকদল বিশ্বজনমতের প্রতিভূ হয়ে কাজ করেন বলে সম্পূর্ণরূপে গোপনতা রক্ষা করাও সম্ভব হয়না। অনুরঞ্জনের ক্ষেত্রে বদ্ধকক্ষে আলোচনা এবং অলিখিতভাবে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য হলেও অনেক সময়ই আলোচনা এমন পর্য্যায়ে পেঁাছয় যখন আলোচনা সম্পর্কিত কিছু প্রকাশ করার হুম্‌কী বা প্রকাশ করা ছাড়া চুক্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় উদ্ভূত অচলাবস্থার নিরসনের জন্য পরিষদকক্ষেই খোলাখুলি আলোচনা ছাড়া উপায় থাকেনা। কোন বিবদমান রাষ্ট্রের নিকট পরিষদকৃত সুপারিশ বা আবেদনসম্বলিত প্রস্তাব বা প্রস্তাবের উদ্দেশ্য খোলাখুলি হলেও যথেষ্ট পরিমাণ গোপন আলোচনার (যাতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রও প্রায়শঃই অংশগ্রহণ করে থাকে) পরই ঐ ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পরিষদের প্রকাশ্য আলোচনার ভঙ্গী ও পরিবেশের প্রতিক্রিয়া যথা-যথভাবে পরিমাপ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সর্বসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত রাষ্ট্রসংঘ ভবনের একটি সুবিদিত কক্ষে পরিষদের বৈঠক বসে। বৈঠক বসে অশ্বখুরাকৃতি এক গণ্ডীর মধ্যে। গণ্ডীর ঠিক মধ্যস্থলে বসেন পরিষদের সভাপতি, তাঁর ডান দিকে মহাসচিব এবং বাম দিকে রাজনৈতিক ও পরিষদ বিষয়ক অধস্তন সচিব (Under Secretary for Political and Security Council Affairs)। প্রত্যেক প্রতিনিধির পিছনে দু-তিনজন করে অধস্তন থাকেন এবং গণ্ডীর মাঝখানের এক টেবিলে বসেন সচিবালয়ের ভাষ্যকারগণ, লঘুলিপিকগণ (Stenographers) এবং সংবাদ সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীগণ। সভাপতির আসনের পিছনের দেওয়ালে রাষ্ট্রসংঘের প্রতীক চটকদারভাবে আঁকা রয়েছে এবং ঐ প্রতীকের দু'পাশে আছে চওড়া জানালা। ঐ জানালা দিয়ে 'ইষ্ট রিভার' দেখা গেলেও উত্তর আমেরিকার উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের জন্য সেগুলি প্রায়শঃই পর্দা ঢাকা থাকে। সভাপতির আসনের সামনের দিকে রয়েছে দর্শকদের আসনশ্রেণী এবং অবশিষ্ট দুই পাশে আছে বেতার, টেলিভিশান ও

চলচ্চিত্রের কর্মীদের কাঁচঘেরা প্রচুর খুপরী। অবস্থানের দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায় যে এই খুপরীগুলি যেন মাঝখানের অশ্বখুরাকৃতি গণ্ডীর উপর হুমড়ী খেয়ে পড়েছে। অর্থাৎ বেতার, টেলিভিশান ও চলচ্চিত্রের লোকেরা পরিষদকক্ষের ঘটনাবলী খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করেন। দৃষ্টিশক্তি মোটামুটি ভাল থাকলে নিকটতম প্রতিনিধির সামনে রাখা (বড় অক্ষরে ছাপানো থাকলে) কাগজপত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় অনায়াসেই পড়া যায়।

এরকম নিবিড়, অন্তরঙ্গ পরিবেশে বৈঠক হলেও সংঘবদ্ধতার দিক থেকে পরিষদ অগ্রসর হতে পারেনি। বস্তুত: পরিষদের কোন যৌথ ব্যক্তিত্বই গড়ে উঠেনি। সেদিক থেকে পরিষদকে আলাদা আলাদা পনেরোজন (মহাসচিব ও অধস্তন সচিবকে নিয়ে সতেরোজন) ব্যক্তির সমাবেশস্থলে বলাই ঠিক হবে এবং এঁদের প্রত্যেকে নিজেদের সহকারী এবং অধস্তনদের সঙ্গে নিয়ে এবং স্বদেশের জনসমর্থন-পুষ্ট হয়ে পরিষদ-কক্ষে উপস্থিত হন। পরিষদের বৈঠকের ঘনিষ্ঠ পরিবেশে পারস্পরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক এবং তার ফলে রাজনৈতিক মতবিরোধের প্রকটতা না কমে বরং রাজনৈতিক বিভেদের সাথে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের সংমিশ্রণই হয়। অবশ্য এমনও দেখা গেছে যে সর্বমতগ্রাহ্য উদ্দেশ্যের এবং ভীতির পরি-প্রেক্ষিতে পরিষদ একতাবদ্ধ হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিষদে সংহতির অভাব দেখা গেছে। আসলে পনেরোটি দেশের ভিন্ন ভিন্ন মতের সমন্বয়সাধনের মন্থর এবং কঠিন পথেই মতৈক্যের সন্ধান চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। নিরাপত্তা পরিষদ প্রশাসনিক অঙ্গ নয়, আবার আইন সভাও নয়। একে প্রায় স্থায়ী অধিবেশনে নিবদ্ধ কূটনৈতিক সম্মেলন বলা চলে।

পরিষদের কাজের মাধ্যম হিসাবে ফরাসী এবং ইংরেজী ভাষা ছাড়াও রুশ এবং স্পেনীয় ভাষাকে (1970 খৃষ্টাব্দে) স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে যুগপৎ ভাষ্য (যা' সব সময়ই পাওয়া যায়) ছাড়াও এর সবগুলি অথবা এর যে কোন ভাষায় ধারাবাহিক ভাষ্যকরণ দাবী করা যায়। বাস্তব আদর্শ হিসাবে এ নিয়ম প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকলেও এর থেকে বোঝা যায় যে পরিষদে বিতর্কের স্বতঃস্ফূর্ততার চেয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধির বক্তব্যে সতর্ক শব্দচয়নকে, স্বদেশের সরকারের কাছে আলোচ্য বিষয়ে নির্দ্দেশ চেয়ে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তাকে এবং কোন বিষয়ে মূল খসড়া (text) না পড়া পর্য্যন্ত মন্তব্য না করার

অধিকারকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ফলে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং চিরাচরিত নিয়মে চলেন না এমন বক্তাই ভাষার বিভিন্নতাজনিত বাধা ডিঙিয়ে পরিষদের বিতর্কে মৌলিকতার ছাপ রাখতে পারেন। সে নজিরও আছে। উদাহরণস্বরূপ মিঃ ভিসিন্স্কি ও স্যার গ্ল্যাডওয়াইন্ জেবের বাক্‌যুদ্ধের কথা অথবা মিঃ কৃষ্ণ মেননের সুপ্রসিদ্ধ বাক্‌চাতুর্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু একজন সাধারণ বক্তার পক্ষে ভাষার বাধাজনিত অস্বাচ্ছন্দ্য ও কৃত্রিমতা কাটিয়ে পরিষদের বিতর্ককে সাবলীল করে তোলা দুরূহ।

প্রতি একমাস অন্তর পরিষদের পনেরোটি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে পালাক্রমে সভাপতি পদের পরিবর্তনের ফলে উপরিউক্ত অসুবিধাগুলি বরং বৃদ্ধি-প্রাপ্তই হয়েছে। তার কারণ এত অল্প সময়ে কোন সভাপতিই নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে পরিষদের বিতর্ককে আরও স্বচ্ছন্দ করে তোলার সুযোগ পাননা। তবে এই নিয়মের ফলে কোন সদস্যরাষ্ট্র দীর্ঘদিন সভাপতির পদ দখল না করতে পারার জন্য সভাপতিকর্তৃক ইচ্ছাকৃত ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকেনা। অন্ততঃ এই সুফলের জন্যই পালাক্রমে সভাপতি বদলের রীতির পরিবর্তন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরিষদের ধারাবাহিকতার দিক থেকে দেখতে গেলে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র-সমূহের প্রতিনিধিগণ মাত্র দুই বৎসরের জন্য পরিষদে থাকার ফলে পরিষদের ধারাবাহিকতার যথেষ্ট ক্ষতিসাধনই হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের এত সমস্ত দুর্বলতার জন্য গোড়ার দিকে পরিষদের উপর নির্ভরতা কমে গিয়েছিল। প্রথম তিন বৎসর অর্থাৎ 1946, 1947 এবং 1948 খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক বৎসর গড়ে 132 বার পরিষদের বৈঠক হয়েছিল। পরে অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদ প্রতি বৎসর এতবেশী বার বৈঠকে মিলিত হয়নি। একথা ঠিক যে বৈঠকের সংখ্যা থেকে বেশী কিছু বোঝা নাও যেতে পারে। তবে শেষের দিকে পরিষদে আলোচিত বিষয়বস্তু গুরুত্বের দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলনা। কোরিয়ার গণ্ডগোল এবং গ্রীক্ সমস্যার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যেমন হয়েছিল, তেমনি সুয়েজ ও হাঙ্গেরী প্রশ্নের আলোচনাও ভেটোর কল্যাণে নিরাপত্তা পরিষদ থেকে সাধারণ সভায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অনেক-ক্ষেত্রে ভেটো প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকলেও দেখা গেছে যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ তাদের সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসার জন্য পরিষদের থেকে সাধারণ সভাকেই বেশী পছন্দ করেছে। এর থেকে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে

গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ার কথাই মনে হয় এবং বাস্তবেও দেখা গেছে যে নিরাপত্তা পরিষদের (যেখানে সদস্যসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত) পরিবর্তে সাধারণ সভাকে (যেখানে সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রই অংশগ্রহণ করে) অধিকতর শক্তিশালী করার পক্ষপাতী সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

1960 এর দশকে অবশ্য পরিষদের ভূমিকার অবনতি রোধ করা গেছে। কঙ্গো এবং সাইপ্রাস্ প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদকেই কাজে লাগানো হয়েছে; কিউবা, স্যাণ্টোডোমিঙ্গো এবং 1965 খৃষ্টাব্দের পাক-ভারত সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদই মোকাবিলা করেছে। রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রশ্নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার (শুধু মতামত পেশ করার নয়) ব্যাপারেও পরিষদে তৎপরতা দেখা গেছে। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকাকে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকাই বলা যায়। কঙ্গো প্রশ্নে সাধারণ সভার হেনস্তা এবং "শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাবের" বাস্তবায়নরোধে অর্থনৈতিক ভেটো প্রয়োগের মুখে সাধারণ সভার অসহায়তা—প্রভৃতির জন্য সাধারণ সভাকে শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছিল। সর্বোপরি, নিরাপত্তা পরিষদকে সম্প্রসারিত করার জন্য চাপ সৃষ্টির মাধ্যমেই পরিষদের ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ শান্তিভঙ্গজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সাধারণ সভার চেয়ে নিরাপত্তা পরিষদ আকারের দিক থেকেই অধিকতর উপযোগী। সাধারণতঃ বৎসরের শেষের তিন-চার মাস ধরে সাধারণ সভার অধিবেশন চলে। এর বাইরে যখন তখন এত বড় সভার অধিবেশন আহ্বান করার অসুবিধা অনেক (জরুরী অধিবেশনের বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও)। আজকের নিত্য-নৈমিত্তিক সংকটের যুগে রাষ্ট্রসংঘের যে অঙ্গ "এমনভাবে গঠিত যাতে সর্বদা কাজ করতে পারে" (28 নম্বর ধারা) সে অঙ্গের, অর্থাৎ, নিরাপত্তা পরিষদের উপযোগিতা স্পষ্টতঃই বেশী। যে যুগে অঘোষিত এবং হঠাৎ যুদ্ধই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে যুগে রাষ্ট্রসংঘের যে অঙ্গ সঙ্গে-সঙ্গেই সংকটের মোকাবিলা (যথাযথভাবে না হলেও) করতে পারে, সে অঙ্গেরই পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রাথমিক উপায় হিসাবে বজায় থাকার সম্ভাবনা প্রবল। শুধু তাই নয়, অতিবৃহৎশক্তিসমূহের মত ছাড়া যে সংকট নিরসন সম্ভব নয়, সে ধরণের সংকটের মোকাবিলার প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তবে আশার কথা এই যে 1970 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পরিষদে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে (চার্টারের

28 (2) নম্বর ধারা অনুসারে) নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে পরিষদের বৈঠক হবে এবং ঐ বৈঠকগুলিতে সদস্যরাষ্ট্রগুলি মন্ত্রী পর্য্যায়ের প্রতিনিধি পাঠাবে। এধরণের বৈঠকগুলি গোপন হবে এবং বিশেষ কোন সংকট নিরসনের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবের ব্যাপক আদান-প্রদানই এগুলির উদ্দেশ্য হবে। যদি তাই হয়, তবে বিলম্বে হলেও নিরাপত্তা পরিষদে যৌথ সচেতনতা এবং যৌথ দায়িত্ববোধের (যা' অপরিহার্য্য) উদ্ভব হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

সাধারণ সভা

যদি একটি অতি বিশাল গুহাকৃতি কক্ষের কথা কল্পনা করা যায় যার মেঝে সামনের দিক থেকে আরম্ভ করে পিছনের দিকে ঢালু এবং যে কক্ষে দেওয়ালগুলি ক্রমশঃ ভিতরের দিকে ঝুঁকে গম্বুজাকৃতি ছাদে গিয়ে ঠেকেছে, তবেই সাধারণ সভার অধিবেশন-কক্ষ সম্পর্কে ধারণা হওয়া সম্ভব। মেঝের সামনের দিকে আছে অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো সারি সারি সবুজ ডেস্ক্ এবং নীল রঙের চেয়ার এবং সেগুলির সন্নিবেশ আরও একটু সামনের দিকের উঁচু করা আসন এবং তার পিছনের আরও উঁচু করা বিরাট মঞ্চের দিকে মুখ করে। কক্ষের পিছনের দিকে ক্রমশঃ উঁচু করা আসনশ্রেণী এবং সেগুলির পিছনে খিলানের উপর সন্নিবেশিত আসনের সারি। খাড়া করে লাগানো কাঠের টুক্রোর (slat) সাহায্যে দেওয়ালগুলিতে আলোকের ব্যবস্থা করা আছে এবং আছে ক্যামেরা রাখার জন্য সামনে কাচ লাগানো লম্বা লম্বা খুপরি। আরও পিছনের দিকে দর্শকদের আসনশ্রেণীর দিকের দেওয়ালে দেখা যায় বিশাল, ঝলমলে, বিমূর্ত্ত অথচ অনেকটা কাঁকড়ার মত দেখতে দুটি চিত্র। মাঝখানের মঞ্চের উপরে আয়ত কাঞ্চনবর্ণের পটভূমিকায় সজ্জিত রয়েছে বৃত্তাকার নীল ও সাদা রঙের রাষ্ট্রসংঘের প্রতীক। কক্ষ জুড়ে রয়েছে আলোর বন্যা। বিদ্যুতালোক গম্বুজের মধ্যের সরু সিঁড়িপথ (স্পষ্ট-ভাবেই দেখা যায়), টেবিল ও ডেস্ক্ থেকে ঠিকরে পড়ে এবং লুক্কায়িত উৎস থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত কক্ষকে প্লাবিত করে রেখেছে।

দর্শকদের আসনশ্রেণী বোঝাই। তাঁদের কেউ অনর্গল বকে চলেছেন, কারও মুখে প্রশ্ন এবং কেউবা শান্ত হয়ে বহু ভাষাবিদ প্রদর্শকের (সরকারী বা বেসরকারী) ব্যাখ্যা শুনছেন। দর্শকগণের সামনের আসনগুলিতে সারা বিশ্বের সাংবাদিকদের সমাবেশ। ঝানু সাংবাদিকরা পুরোনো পরিচয় ঝালিয়ে নিচ্ছেন এবং নতুনেরা হাত পাকানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। সাংবাদিকদের সামনের অংশ প্রতিনিধিবর্গ এবং বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত। দুদিকের পাশের বারান্দা এবং বিশ্রামকক্ষসমূহ থেকে লোক নির্গমন দেখলে

মনে হয় প্রাণচাঞ্চল্যের স্রোত বয়ে চলেছে। করমর্দন, অভিনন্দন, আলিঙ্গন এবং কাঁধ চাপড়ানোর ছড়াছড়ি পড়ে যায়। আসন নির্দেশক ও নির্দেশিকাগণ অভ্যাগতদের আসন দেখিয়ে দেন এবং বহিরাগতদের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ না করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। যাঁদের ছবি তোলা হয়েছে তাঁদের পুলকিত করে এবং আলোর ঝল্‌কানিতে আশেপাশের লোকদের চমকিত করে আলোকচিত্রকরগণ (Photographers) এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকেন। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব-নির্ধারিত সময় বেশ খানিকটা পার হয়ে গেলেও অধিকাংশ প্রতিনিধিই নিজেদের আসনে না বসে গল্পে মত্ত থাকেন। অধিবেশনের সময়ের পঁচিশ মিনিট এভাবে অতিক্রান্ত হলেও গুঞ্জরণ বন্ধ হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়না। তারপর হাতুড়ীর শব্দে অধিবেশনের শুরু ঘোষিত হওয়ার পর সভাপতির মঞ্চে ক্ষুদ্রাকৃতি (কক্ষের বিশাল আকারের জন্য) তিন ব্যক্তিকে দেখা যায়। আবার হাতুড়ীর শব্দে গল্পে মত্ত ছোট ছোট দলগুলি ভেঙে যায় এবং ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সবাই আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রার্থনা ও ধ্যানের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করার রীতি থাকলেও ঐ সময়টা চলচ্চিত্রগ্রহণ যন্ত্রের ঘূর্ণনজনিত শব্দে সরব হয়ে ওঠে। এ সবের মধ্য দিয়েই সাধারণ সভার আরেকটা অধিবেশনের সূচনা হয়।

অধিবেশনের প্রথম কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে অবশ্য প্রারম্ভিক সজীবতা আর দেখা যায়না। উপস্থিতি কমে আসে এবং বিশিষ্ট অতিথি-দের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় হয় সাধারণ দর্শকগণ নিজেদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে ঢুকে পড়েন, নয় কোন উৎপীড়িত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ তাঁদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগের জন্য ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করেন। দর্শকদের আসনশ্রেণী বোঝাই থাকলেও সাংবাদিকদের আসনে পাঁচ-ছয়জনের বেশী সাংবাদিককে দেখা যায়না। সর্বাধিক পরিচিত সাংবাদিকগণ সচিবালয়ের অপরপ্রান্তে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে বসে যন্ত্রযোগেই সাধারণ সভার সম্পূর্ণ কার্য্য-বিবরণী শুনতে পান। প্রতিনিধিদের সকলেও অধিবেশনে উপস্থিত থাকেননা। তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আনুমানিক বারশত আসনের অর্ধেকেরও বেশী খালি পড়ে থাকে। এবং যেসমস্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন, তাঁরা কখনও চলমান বক্তৃতার দিকে খানিক মনোনিবেশ করেন, কখনও কোন পরিচিতের সাথে একটু গল্প করেন, কখনও বা কোন সহকর্মী অথবা স্বকীয় প্রতিনিধিদলের সচিবের

পেটমোটা (নিউইয়র্ক টাইমস্ বা সকালে আসা স্বদেশীয় সরকারের তারবার্তায় ঠাসা) ঝোলার দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্কের তুলনায় সাধারণ সভার বিতর্কে (বিতর্ক বললে অবশ্য বাড়িয়ে বলা হয়) যুগপৎ অনুবাদের জন্য ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও বক্তৃতায় অস্বাভাবিক বাক্যবাগীশতা ও অপ্রাসঙ্গিকতার (নিরাপত্তা পরিষদের তুলনায়) জন্য সেই ধারাবাহিকতার অনেকখানিই মাঠে মারা যায়। স্বদেশীয় পরিচ্ছদে শোভিত আফ্রিকার এবং এশিয়ার কিছু প্রতিনিধির কথা, অথবা কোন লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধির বক্তৃতায় নির্ভেজাল বাগাড়ম্বরতার কথা বাদ দিলে সাধারণ সভার অধিবেশনে তেমন বর্ণাঢ্য বা আকর্ষণীয় কিছু চোখে পড়ে না। বরং বলা যেতে পারে যে, নিরস আলোচনার মধ্য দিয়ে সাধারণ সভার অধিবেশন ঢিমে তালেই এগুতে থাকে। তবুও, উত্থাপিত বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং মতানৈক্যজনিত তিক্ততার দিক থেকে দেখতে গেলে সাধারণ সভার বিতর্ককে কিছুতেই উচ্ছৃঙ্খল বলা চলেনা। নতুন বক্তাকে মঞ্চে আহ্বান করা ছাড়া সভাপতিকে বড় একটা কথা বলতে শোনা যায়না। সভার কাজকর্ম শ্লথগতিতে এগুলেও এবং তাতে উদ্যোগের বিশেষ কোন লক্ষণ না থাকলেও সভার কাজের মন্থর গতিকে সর্বৈব উদ্দেশ্যহীন বলা চলেনা।

কোন বৃটিশ দর্শক অবশ্য সাধারণ সভা এবং ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের সংসদের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পাবেননা। বৃহদাকারের জন্য সাধারণ সভাকক্ষ বিতর্ক সভা হিসাবে বেমানান (সেণ্ট্ স্টিফেনের ধারণা অনুযায়ী), অথবা বক্তাগণ নিজেদের আসনের নিকট না দাঁড়িয়ে মঞ্চে উঠে বক্তৃতা করেন বলেই যে এই বৈসাদৃশ্য তা মোটেই নয়। এধরণের বৈশিষ্ট্যের নজির অবশ্য ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সংসদগুলিতে দেখা যায়। যেসমস্ত বহিরাগত সাধারণ সভাকে 'বিশ্বের আইনসভা' বলে সহজেই বিশ্বাস করতেন, তাঁরা অবশ্য সভার কাজে অগোছালো ভাব দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেন না। এখানে রাজনৈতিকদল বা দলের পরিষদীয় নেতাদের বা পরিষদীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রণালী দেখতে পাওয়া যায়না। এখানে সরকারী দলও নেই, বিরোধীপক্ষও নেই। আসন ব্যবস্থার দিক থেকে দেখতে গেলে এখানে সামনের সারিতে বসা বা পিছনের সারিতে বসা সদস্যদের মধ্যে পার্থক্যও করা যায়না। বৃটিশ রাজ্যনীতির চিরাচরিত নিয়মানুসারে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারের দায় সাধারণ সভার কারও ঘাড়েই চাপানো যায়না।

স্বার্থের কথায় এখানে কেউ গৃহস্বামী বা অতিথি নন। সকলেই স্বদেশ থেকে সমান দূরে। উপরিউক্ত বৈসাদৃশ্যগুলি ছাড়াও বিশেষ করে বৃটিশ প্রতিনিধিদলভুক্ত সংসদসদস্যের চোখে শৃংখলার যে অভাব ধরা পড়েছিল তা' সাধারণ সভার অনেক সদস্যের কাছে অনুভূত হয়েছিল।

সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে গেলে বৃটিশ হাউস্ অব্ কমন্সের অভিজ্ঞতা কোন কাজে আসে না বললেই হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, গোষ্ঠীভিত্তিক ভোটদান, অধিবেশনে ধারাবাহিকতার অভাব এবং প্রায়শঃই কোন সিদ্ধান্তে পেঁাছনোর অসামর্থ্যের (ইচ্ছাকৃত) দিক থেকে দেখতে গেলে সাধারণ সভাকে বরং 'ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' বা 'লেবার পার্টি কন্‌ফারেন্সের' সাথে তুলনা করা চলে। তবে সাধারণ সভায় সংঘবদ্ধতা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি তেমন একটা না থাকায় একে কোন বৃটিশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা না করাই ভাল। বরং কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ঢিলেঢালা, অসংবদ্ধ, আইনঘেঁষা অথচ বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই সাধারণ সভার সাদৃশ্য বেশী। চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের দিক থেকে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সমপ্রদায়গুলির ক্ষমতার দিক থেকে, বিভিন্ন রাজ্যের অধিকার রক্ষায় কংগ্রেসের আগ্রহের দিক থেকে এবং কংগ্রেসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার ব্যবহার-প্রণালী পরিবর্তনের দিক থেকে দেখতে গেলে মার্কিন কংগ্রেসের সঙ্গে সাধারণ সভার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলির চতুর্বৎসরান্তিক সম্মেলনের সাথে সাধারণ সভার মিল অনেক বেশী। কারণ এধরণের সম্মেলনে স্বার্থের বিভিন্নতা মার্কিন মহাদেশ-ব্যাপী (বিশ্বব্যাপী না হলেও); ধর্ম, জাতি, স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যের ব্যাপকতার আকার খানিকটা ছোট হলেও প্রকারভেদের দিক থেকে মোটেই তা' নয়। সাধারণ সভাও মার্কিন রাজনৈতিক দলগুলির সম্মেলনকে শুধু কর্মসূচী গ্রহণের কেন্দ্র বললে ভুল হবে। উভয়কেই বিভিন্ন ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির মিলনকেন্দ্র বলা চলে। অস্তিত্বকাল, ঐতিহ্য এবং ক্ষমতাসচেতনতার দিক থেকে দেখতে গেলে উভয়ক্ষেত্রেই সমষ্টিকে অংশসমূহের কাছে হার মানতে হয়। উভয়-ক্ষেত্রেই অংশসমূহের উপর সমষ্টির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সীমিত। আগত প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্র ও স্বীকৃতি এবং নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যা উভয় স্থলেই দেখা দেয়। মার্কিন দলগুলির সম্মেলনে বিভিন্ন রাজ্য থেকে

সমবেত প্রতিনিধিদলের বিরোধে কোন প্রতিনিধিদলকর্তৃক সীমিত সময়ের জন্য সভাস্থল পরিত্যাগ অথবা সম্মেলন থেকে অপসারণের ঘটনা ঘটে থাকে। এককভাবে কিছুই সম্ভব নয় বলে উভয়স্থলেই সমবেত প্রতিনিধিদলগুলিকে নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পারস্পরিক সমঝোতার পথে অগ্রসর হতে হয়। উভয়স্থলেই কখনও বক্তৃতামঞ্চ থেকে জনগণের নিকট আবেদন, কখনও স্বার্থের ভিত্তিতে গোপন বোঝাপড়াকে কৌশল হিসাবে অবলম্বন করতে হয়। মার্কিন রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে বিরুদ্ধদলের ভয় ঐক্যসৃষ্টিকারী প্রভাব হিসাবে কাজ করে। সাধারণ সভার ক্ষেত্রে অবশ্য তা' হয়না। তবে উভয়ক্ষেত্রেই (সমানভাবে না হলেও) জনসাধারণের (যাঁরা প্রতিনিধিবর্গকে প্রেরণ করে থাকেন) দিকে লক্ষ্য রেখে সমবেত প্রতিনিধিদলগুলিকে কিছু করতেই হয়।

আনুষ্ঠানিক অর্থে সাধারণ সভার গঠন খুবই সরল। প্রত্যেক বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার এর নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয়। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। তাঁদের সঙ্গে পাঁচজন সহকারী থাকতে পারেন (প্রতিনিধিদলগুলির সঙ্গে প্রায়শঃই বেশ কিছু উপদেষ্টা, বিশেষজ্ঞ এবং অধস্তন থাকেন)। আগের বৎসরের সভাপতির (অথবা তাঁর দেশের প্রতিনিধিদলের নেতার) সভাপতিত্বে অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং সাধারণ সভার নূতন অধিবেশনের প্রথম কাজ হলো পরবর্তী এক বৎসরের জন্য একজন সভাপতি নির্বাচিত করা। কোন বৃহৎশক্তির প্রতিনিধিকে সাধারণ সভার সভাপতিপদে নির্বাচিত না করা প্রচলনে (জাতিপুঞ্জেও যেমন হয়েছিল) দাঁড়িয়ে গেছে। তার অর্থ এই নয় যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সাধারণ সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেননি। সভার প্রথম সভাপতি মিঃ স্পাক্ (বেলজিয়ামের প্রতিনিধি) থেকে আরম্ভ করে এ পর্য্যন্ত কৃতী ব্যক্তিগণই এই পদ ভূষিত করেছেন। সভাপতির ক্ষমতা সীমিত হলেও তিনি ব্যক্তিগত প্রভাবের বলে অধিবেশনের সুষ্ঠু পরিচালনা করতে এবং বিভিন্ন সভ্যরাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের মুখে রাষ্ট্রসংঘের স্বার্থরক্ষা করতে পারেন। অন্যান্য বড় ধরণের সভার সভাপতির যে গুণগুলির প্রয়োজন হয় সাধারণ সভার সভাপতিরও তাই। অর্থাৎ তাঁর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় অসীম ধৈর্য্য, মুখ চিনে রাখার ক্ষমতা, বিভিন্ন প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় পক্ষপাতিত্ব এড়িয়ে যাওয়ার

কৌশল, রসবোধের সঙ্গে স্বকীয় পদের মর্য্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা, কার্য্যপ্রণালীগত খুঁটিনাটি সম্পর্কে প্রাঞ্জল ধারণা, কার্য্যগতি সম্পর্কে ধারণা এবং সভার মেজাজ অনুধাবন করার সহজাত বোধশক্তি। একথা বলা চলেনা যে, সাধারণ সভার সকল সভাপতিই উপরিউক্ত সবগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন। তবে কাউকেই সর্বৈবভাবে নিজের গুণের উপরই নির্ভর করতে হয়নি। সভাকক্ষে তাঁর পাশে মহাসচিবের প্রধান সহায়ক (Chef de Cabinet) বসেন। সাধারণ সভার বিষয়ে তিনিই অধস্তন সচিব এবং কোন আইন সভায় অধ্যক্ষকে সংসদীয় করণিক (Parliamentary Clerk) যে ধরণের সাহায্য করে থকেন, সাধারণ সভার সভাপতিও তাঁর কাছ থেকে সেরকম সাহায্য পেয়ে থাকেন। 1946 খৃষ্টাব্দ থেকে 1962 খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পদের নাম ছিল মহাসচিবের প্রশাসনিক সহকারী (Executive Assistant to the Secretary General) এবং ঐ সময়ে এই পদের অধিকারী মিঃ অ্যাণ্ড্রু করডিয়ারের কর্মকৌশল, প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি এবং নিষ্ঠার ফলে সভার সভাপতি পদের বিবর্তন আকাঙ্খিত পথেই হয়েছে। ভারতের মিঃ ভি. সি. নরসিংহম্ এখন সভার অধস্তন সচিবের পদ অলঙ্কৃত করছেন। গোপন ব্যালটে সভাপতি পদে নির্বাচন হয় এবং প্রচুর ভোটে নির্বাচিত হতে পারেন এমন একজন প্রার্থী সম্পর্কে বোঝাপড়া আনুষ্ঠানিক অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই গোপন আলোচনাবলে হয়ে থাকে। সভাপতিপদের জন্য গোড়ার দিকে কিছুকাল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। সেজন্যই আনুষ্ঠানিক নির্বাচনের পূর্বেই প্রার্থী সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছনোর জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে। ফলে সাধারণ সভার পরবর্তী সভাপতির নাম অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে নামেমাত্রই গোপন থাকে।

সাধারণ সভার নিয়মাবলী অনুসারে সভাপতি ছাড়াও সতেরোজন সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সভার সাতটি স্থায়ী সমিতির জন্য সাতজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উপরিউক্ত পঁচিশজন পদাধিকারীগণের সমষ্টিতে এবং সাধারণ সভার সভাপতির নেতৃত্বে একটি 'সাধারণ সমিতি' (General Committee) স্থাপিত হয়। এই সমিতিকে প্রত্যেক অধিবেশনের ব্যবস্থাপক সমিতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কোন সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের একাধিক সভ্য যাতে সাধারণ সমিতিতে নির্বাচিত হতে না পারেন এবং প্রতি-নিধিত্বের দিক থেকে এই সমিতির গঠনে যাতে যথার্থতা রক্ষা করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। প্রণালীগত কিছু বিষয়ের দায়িত্ব এই সমিতিকে

বহন করতে হয়। সেগুলি হলো: অধিবেশনের কর্মসূচী ও বিতর্কে অগ্রাধিকার প্রদান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্থায়ী সমিতি সাতটির মধ্যে কার্য্যবণ্টন এবং সেগুলির কাজের সমন্বয়সাধন, অধিবেশন সমাপ্তির দিন ধার্য্য করা এবং সভাপতিকে তাঁর দায়িত্বপালনে সহায়তা করা। একথা অবশ্য উল্লেখ করা উচিত যে, এই সমিতি উপদেষ্টা হিসাবেই কাজ করে থাকে। এর সুপারিশ গ্রহণ করা না করা সাধারণ সভার ইচ্ছাধীন। সাধারণ সভায় প্রণালীগত বিষয় গুরুতর হতে পারে বলে অনেকেরই ভয় থাকে (সে ভয় এ পর্য্যন্ত অমূলক বলেই দেখা গেছে) পাছে সাধারণ সমিতি স্বৈরাচারী হয়, এজন্যই এই সমিতির সভ্যপদের (বিশেষ করে সহসভাপতির পদসমূহ) জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। সহ-সভাপতির সংখ্যা প্রথমে ছিল সাত এবং এও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে এই সাতজনের পাঁচজন হবেন নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি। সাধারণ সভার সভাপতি এবং স্থায়ীসমিতিগুলির অধ্যক্ষগণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধি হবেন। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই বৃহৎ পঞ্চশক্তি ধরে নিয়েছিল যে সাধারণ সমিতিতে তাদের মুখপাত্র হিসাবে পাঁচটি সহ-সভাপতির পদ তাদের পাওয়া উচিত। এ ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের যথার্থতার নীতি বজায় থাকছেনা বলে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলি অভিযোগ করলে সহ-সভাপতির সংখ্যা বাড়িয়ে 1956 খৃষ্টাব্দে করা হয় আট, 1957 খৃষ্টাব্দে তেরো, এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্যসংখ্যা প্রচুর বেড়েছে বলে 1963 খৃষ্টাব্দে করা হয় সতেরো। এই সতেরোজনের বিভাজন ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

(a) এশিয়া ও আফ্রিকার সদস্যরাষ্ট্রসমূহ থেকে সাতজন;
(b) পূর্ব ইউরোপীয় সদস্যরাষ্ট্রসমূহ থেকে একজন;
(c) লাতিন আমেরিকার সদস্যরাষ্ট্রসমূহ থেকে তিনজন;
(d) পশ্চিম ইউরোপীয় এবং অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহ থেকে দুজন;
(e) নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র থেকে পাঁচজন।

হিসাবের খাতিরে অবশ্য উপরিউক্ত যে কোন দুইটি শ্রেণীর মধ্যে একবার অধিক্রমণের (overlap) ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

স্থায়ী সমিতিগুলির সাতজন অধ্যক্ষের পদ একই রকমভাবে সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। অতএব দেখা যায় যে, সাধারণ সভার সবচেয়ে স্পষ্ট গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্বের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে এবং সাধারণ সমিতিকে (অসুবিধাজনক-

ভাবে) বৃহদাকার ও অনমনীয় করে ফেলার ভয় থাকলেও এর 'গণতন্ত্রীকরণের' পথে বেশ খানিকটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সভার সংগঠন ও কাজের দিক থেকে দেখতে গেলে 'পরিচয়পত্র-সংক্রান্ত সমিতির' (Credentials Committee) উল্লেখ অপরিহার্য্য। সভার প্রত্যেক অধিবেশনে নির্বাচিত নয়টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিতে সদস্যপদের ধারাবাহিকতা থাকেনা বললেই চলে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন 1952 খৃষ্টাব্দ থেকেই এই সমিতিতে নির্বাচিত হয়ে আসছে। এর থেকে জনগণতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রসংঘভুক্তির প্রশ্নে দুই বিরুদ্ধমতের মুখ্য প্রতিভূ হিসাবে এই দুই শক্তির ভূমিকার কথাই মনে হয়। এই সমিতির ক্ষমতা উপদেশদানেই সীমাবদ্ধ। পরিচয়পত্র সম্পর্কিত বিরোধের প্রশ্নে বিতর্ক মূল সভায়ই হয়ে থাকে।

সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক সংগঠনের বিবরণ দেওয়া হয়ে গেলেও সভার একটা বিশেষ প্রথার উল্লেখ না করলেই নয়। এই প্রথা আনুষ্ঠানিক না হলেও সভার কার্য্যাবলীর সুষ্ঠুসম্পাদনে এর অবদান (1948 খৃষ্টাব্দ থেকেই) সভার অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার তুলনায় কম নয়। সভার সভাপতিকর্তৃক আয়োজিত সাপ্তাহিক ভোজসভার কথা বলা হচ্ছে। এতে উপস্থিত থাকেন স্থায়ী সমিতি সাতটির অধ্যক্ষবৃন্দ, মহাসচিব ও তাঁর সহকারীগণ, এবং সমিতিগুলির সচিবগণ। এই ভোজসভায় প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির অধ্যক্ষ তাঁর সমিতির কাজের বিবরণ দেন এবং যে সমস্ত সমস্যা সমাধানে পরামর্শের প্রয়োজন সেগুলি উপস্থাপিত করেন। এর পরেই হয় সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা। সাপ্তাহিক ভোজসভার ফলে স্থায়ী সমিতিগুলিতে একই ধরণের প্রথা প্রচলন, প্রয়োজনে কোন বিষয়ের এক সমিতি থেকে অন্য সমিতিতে স্থানান্তর এবং সাধারণ সভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সমিতির সময়সূচী সম্পকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হয়।

সাধারণ সভা মূলতঃ বিতর্কসভা এবং বিতর্কসভার সমস্ত দোষগুণই এতে আছে। প্রশ্ন হলো, সভার বিতর্কের বিষয়বস্তু কি? চার্টারের 10 নম্বর ধারা বলে, সাধারণ সভা "বর্তমান চার্টারের এক্তিয়ারের যাবতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে বা বিষয় সম্পর্কে অথবা বর্তমান চার্টার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-সংঘের যে কোন অঙ্গের কার্য্যসমূহ বা ক্ষমতাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবে।" সভার আলোচনার বিষয়বস্তু এর চেয়ে ব্যাপক হতে পারেনা। অথচ শতাধিক সদস্যবিশিষ্ট আলোচনার এই বিশ্বসভার

কর্মসূচী এবং বক্তা নিরূপণ করা দুরূহ। মহাসচিব সভার প্রত্যেক অধিবেশনের কর্মসূচীর খসড়া জুলাই মাসে করে থাকেন এবং সভার নিয়ম অনুসারে কিছু কিছু বিষয়, যেমন, মহাসচিবের বাৎসরিক প্রতিবেদন, রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য অঙ্গসমূহের প্রতিবেদন, সভার বিগত অধিবেশনের অবশিষ্ট বিষয়সমূহ এবং রাষ্ট্রসংঘের যে কোন সদস্যরাষ্ট্রকর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ সাধারণ সভার কর্মসূচীভুক্ত করতেই হয়। স্পষ্টতঃই সবকিছুই সভার সাময়িক (provisional) কর্মসূচীভুক্ত হয়ে থাকে এবং তার সাথে অতিরিক্ত বিষয়সমূহ (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ফসল) যুক্ত হওয়ার পর "ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই" পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সভার সাময়িক কর্ম-সূচীতে সাধারণতঃ নব্বইটি বিষয়বস্তু স্থান পেয়ে থাকে এবং তার সাথে অতিরিক্ত প্রস্তাবসমূহ যুক্ত হলে মোট বিষয়বস্তুর সংখ্যা সহজেই শতাধিক হয়ে যায়।

প্রথমে সাধারণ সমিতির গোপন বৈঠকে এই কর্মসূচীর খসড়ার পর্য্যালোচনা হয়। এই সমিতি সাধারণতঃ খসড়ার কোন বিষয়বস্তু সরাসরি নাকচ করেনা। তবে বিষয়বস্তুর অধিক্রমণ (overlap) এবং একই বিষয়ের পুনরালোচনা নিবারণের জন্য কর্মসূচীর কোন কোন বিষয়কে নূতন করে সাজানো হয়ে থাকে। অথবা কোন বিষয়বস্তুকে খসড়াভুক্ত একই রকমের অন্যকোন পদের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রচলিত প্রথা এবং নজিরের ভিত্তিতেই সাধারণ সমিতি সুপারিশ করে থাকে এবং তা' সাধারণ সভাকর্তৃক গৃহীত হলেও প্রত্যেক বছরই কিছু কিছু বিভেদমূলক বিষয়বস্তু থেকেই যায়। এগুলি নিয়েই সাধারণ সভায় দীর্ঘ এবং তিক্ততাপূর্ণ বিতর্ক হয়। এধরণের বিতর্কই (যা' অধিবেশনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত গড়িয়ে যায়) নিন্দুকদের সবচেয়ে বড় খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ সভার প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ অনেকেই কর্মসূচী-সংক্রান্ত মতবিভেদকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে থাকেন। এধরণের সমালোচনা যথাযথ নয় কারণ সাধারণ সভার আলোচনার বিষয়বস্তু সভার সার্ব্বভৌম সদস্যরাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর-শীল। এদিক থেকে সাধারণ সভা বৃটিশ সংসদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কর্ম-সূচীসংক্রান্ত বিতর্কের মূলে থাকে সাধারণ সভা অথবা রাষ্ট্রসংঘের ক্ষমতার পরিমাণ নিয়ে দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্বের উপর গ্রহণ-যোগ্য বিধিনিষেধসংক্রান্ত প্রশ্ন। কোন রাষ্ট্রের কাজ সম্পর্কে বিতর্ক করার অর্থই হলো ঐ রাষ্ট্রের কাজের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা।

এতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জাতীয় গৌরবই শুধু ধূলুণ্ঠিত হয়না, অনেক সময় জাতীয় নিরাপত্তাও ব্যাহত হতে পারে (যদি সরকারী প্রচারের ফলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় আবেগে অন্ধ হয়ে পড়ে)। বিশেষ করে জাতিগত বা বর্ণসংক্রান্ত প্রশ্নে এধরণের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ আলজেরীয়া প্রশ্নে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যের নীতির প্রশ্নে সাধারণ সভার বিতর্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। এধরণের বিষয় এত বেশী বিতর্কমূলক বলে "সর্বতোভাবে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারে পড়ে" এমন বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘকর্তৃক হস্তক্ষেপের উপর নিষেধ (চার্টারের 2(7) নম্বর ধারা বলে) সহজেই চার্টারভুক্ত হয়েছে। তবে একদিক থেকে একথাও ঠিক, যেমন ভারতের মিঃ কৃষ্ণ মেনন বলেছিলেন (আলজিরিয়া প্রসঙ্গে, কাশ্মীর প্রসঙ্গে নয়) যে আলোচনার অর্থই হস্তক্ষেপ নয়। আবার এও বলা যেতে পারে যে, সাধারণ সভায় কোন সংশয়মূলক বিষয় উত্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা এবং কোন বিষয়কে সাধারণ সভায় উত্থাপন করতে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশের কার্য্যধারা সম্পর্কে অন্যান্য দেশকর্তৃক সমালোচনার সুযোগ করে দেওয়া।

উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণেই কোন বিষয়কে কর্মসূচীবহির্ভূত রাখার প্রচেষ্টা প্রায়শঃই ফলপ্রসূ হয়না। সাধারণ সভার পরিবেশের দিক থেকে দেখতে গেলে কোন বিষয়কে আলোচনার বাইরে রাখার চেষ্টাকে শুধু সন্দেহের চোখেই দেখা হয়না, মনে হয় যে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কিছু লুকোতে চাইছে অথবা গর্হিত কিছু করে বসে আছে। তাছাড়া, কোন বিষয়কে কর্মসূচীবহির্ভূত রাখার প্রচেষ্টা অর্থহীনও। কারণ কোন কিছুর কর্মসূচীভুক্তি সম্পর্কে যুক্তি-তর্কের অবতারণা উক্ত বিষয়-সম্পর্কে আলোচনারই নামান্তর। তত্ত্বগত দিক থেকে কর্মসূচীর গ্রন্থনার সময় কোন বিষয়ের সারাংশ প্রয়োজনেই এসে পড়ে। ফলে কোন বুদ্ধিমান প্রতিনিধি কোন কিছুর সমালোচনা করতে চাইলে কর্মসূচীর গ্রন্থনার সময়ই করতে পারেন। অতএব কোন বিষয়ের কর্মসূচীভুক্তির প্রশ্নে তীব্র প্রতিবাদ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কর্মসূচীভুক্তি আপত্তিকর ভাষায় যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখাই উচিত। যেমন, "রুরিটানিয়ার বিরুদ্ধে নির্লজ্জ আক্রমণ" এর পরিবর্তে "রুরিটানিয়ার প্রশ্ন" হলে প্রতিবাদ না করাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

কর্মসূচী সম্পর্কে মতৈক্য (অন্ততঃ সমস্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি গ্রহণ-যোগ্য) হওয়ার পর সাধারণ সভা সাধারণ সমিতির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্মসূচীর বিভিন্ন বিষয় সাতটি স্থায়ী সমিতির মধ্যে বন্টন করে দেয়। সাধারণ সভাও ইউরোপীয় সংসদগুলির মত অথবা মার্কিন কংগ্রেসের মত (বৃটিশ সংসদ অবশ্য ব্যতিক্রম) বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সমিতির মাধ্যমেই অগ্রসর হয় এবং শুরু থেকেই কোন বিষয়ের বিবেচনার জন্য সমিতি-গুলির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। জাতিপুঞ্জের নজির অনুসরণ করে প্রস্তুতি কমিশন প্রথমে ছয়টি সমিতির ব্যবস্থা করে। সেগুলি হলো : প্রথম (রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়সংক্রান্ত) সমিতি; দ্বিতীয় (অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়সংক্রান্ত) সমিতি; তৃতীয় (সামাজিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক বিষয়সংক্রান্ত) সমিতি; চতুর্থ (অছিসংক্রান্ত) সমিতি; পঞ্চম (প্রশাসনিক বিষয় ও বাজেটসংক্রান্ত) সমিতি; ষষ্ঠ (আইনসংক্রান্ত) সমিতি।

আপাতঃদৃষ্টিতে এই ব্যবস্থা তখন যথেষ্ট মনে হলেও বাস্তবে এ ব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট হয়নি। দ্বিতীয় সভার সময়েই দেখা যায় যে প্রথম সমিতি কাজের চাপ সামলাতে পারছে না এবং প্রথম সমিতির ভার লাঘব করার জন্য একটি অস্থায়ী সমিতি (Adhoc Committee) গঠিত হয়। এই অস্থায়ী সমিতি পরে স্থায়ী হয়ে যায় এবং এর নাম দেওয়া হয় 'বিশেষ রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত সমিতি' (Special Political Committee)। তবে একে সপ্তম সমিতি বলে নামকরণ করা হয়নি।

সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রগুলি এর প্রত্যেকটি সমিতিতে আছে বলে এই সমিতিগুলিকে বিকল্প সাধারণ সভা বলা যেতে পারে। এই কারণেই আইন প্রণয়ন বিষয়ক এবং পর্য্যবেক্ষণমূলক কাজ (সংসদীয় সমিতির মত) করতে গেলে সাধারণ সভার সমিতিগুলির পারদর্শীতা কমে যায়। এ ছাড়া কোন উপায়ও নেই। কারণ সংসদীয় সমিতি-গুলিকে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কথা ভাবতে হয়, সাধারণ সভার সমিতিগুলিকে শতাধিক সার্বভৌম সদস্যরাষ্ট্রের কথা খেয়াল রাখতে হয়। এ ছাড়াও কারণ আছে। সভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রচুর কাজের চাপ থাকে বলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্ক সমিতি-গুলিতেই হয়ে থাকে। সাধারণ সভাকে এমন একটি সার্কাস বলা যেতে পারে যেখানে আসল খেলা মূল আসরে হয়না। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব

অনুসারে বৈদেশিক মন্ত্রীগণ এবং প্রতিনিধিদলের প্রধানগণ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন থেকে স্থায়ী সমিতিগুলিতে অথবা সমিতি থেকে মূল সভায় যাতায়াত করতে থাকেন। সভার অধিবেশনের শেষের দিকে স্থায়ী সমিতিগুলি যখন মূল সভার নিকট প্রতিবেদন পেশ করে, তখন দেখা যায় যে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিতর্ক প্রায়শঃই যেমন-তেমন ভাবে হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে আদৌ হয়না।

কর্মসূচীর একটি বিষয় সবসময়ই সভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের জন্য সংরক্ষিত থাকে। সেটি হলো 'সার্বজনীন বিতর্ক' (General Debate) এবং এ দিয়েই সভার বাৎসরিক অধিবেশন শুরু হয়। 'সার্বজনীন বিতর্ক' নিঃসন্দেহে সার্বজনীন হলেও একে মোটেই 'বিতর্ক' বলা চলেনা। 'সার্বজনীন বিতর্কে'র ব্যবস্থা জাতিপুঞ্জের নজির অনুসরণ করেই হয়েছে। তখনও মহাসচিবের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে যে কোন সদস্যরাষ্ট্র যে কোন বিষয় (হয় উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বলে নয় উল্লেখ করা হয়নি বলে) উত্থাপন করতো। জাতিপুঞ্জের আমলে যে বিষয়ের আলোচনায় সাতদিন লাগতো, সাধারণ সভায় সে ধরণের বিষয়ে সাধারণতঃ তিন সপ্তাহের কমে হয়না। কারণ সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অন্ততঃ নব্বই শতাংশ যা' খুশী উত্থাপন করার অবাধ অধিকার ভোগ করে থাকে। ফলে সভায় একের পর এক বক্তৃতা চলতে থাকে এবং সেগুলির মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকেনা বললেই চলে। এধরণের বক্তব্য অনেক আগেই সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে ঠিক হয়ে থাকে এবং সাধারণ সভায় পেশ করার আগেই সেগুলিকে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। অতএব এই সমস্ত বক্তব্য সবার আগে শোনার সুযোগ সাধারণ সভায় হয়না। তবে একথা বলা যায় যে, বিরক্তিকর হলেও সার্বজনীন বিতর্কের বাস্তব প্রয়োজনীয়তাও আছে। স্বীকৃতি-সম্পন্ন কোন সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্ররাষ্ট্রকর্তৃক বৃহৎশক্তিসমূহের সমালোচনার সুযোগ 1919 খৃষ্টাব্দে সাহসিকতাপূর্ণ ও অভিনব ব্যাপার ছিল। এখনও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলি বৎসরে একবার বিশ্বসভায় দাঁড়িয়ে নিজেদের বঞ্চনা, কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে পারার সুযোগকে যথার্থভাবেই মূল্যবান বলে মনে করে। মতামত ব্যক্ত করার সুযোগের অভাব বৃহৎশক্তিবর্গের হয়না। কিন্তু ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহের দিক থেকে দেখতে গেলে 'সার্বজনীন বিতর্ক'কে বৃটিশ সংসদে 'রাণীর ভাষণের' উপর সাধারণ বিতর্কের সাথে তুলনা করা চলে। কারণ এই সাধারণ বিতর্কের সময়ই

পিছনের সারির সভ্যগণ তাঁদের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (অন্যথায় তাঁরা এ সুযোগ পেতেন না)। এই বিশ্ব-মিলন মেলায়ও সার্বজনীন বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা এদিক থেকেই। একথা ঠিক যে সার্বজনীন বিতর্কে অংশগ্রহণকারী সদস্যরাষ্ট্রসমূহ বিশ্বমানসে তাদের নিজ নিজ ভাবমূর্তিকে উন্নীত করতে প্রয়াসী হয় বলে একটা কৃত্রিমতা এসে যায়। সার্বজনীন বিতর্কে সবাই নিজ নিজ ঢাক পেটালেও মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, আত্মম্ভরিতাপূর্ণ বক্তব্যেও মতৈক্য লক্ষিত হয় যা অন্যভাবে সম্ভব হতো না। ফলে সার্বজনীন বিতর্কে সবচেয়ে ভারসাম্যহীন বক্তাদের উক্তির মাধ্যমেও মতৈক্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়, যেমন ছিল প্রাচীন গ্রীক্ সেনাপতিদের ব্যবহার-রীতিতে (যাঁরা প্রথমে আত্মসমর্থন করতেন, পরে থেমিষ্টকল্স্‌কে সমর্থন করতেন)। অতএব দেখা যায় যে, নিরস্ত্রীকরণের অগ্রগতির জন্য বিশ্বব্যাপী দাবীই সাধারণ সভার দ্বাদশ অধিবেশনের সার্বজনীন বিতর্কের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়াও, সার্বজনীন বিতর্কের জন্য নির্ধারিত সময় সর্বৈবই মাঠে মারা যায়না। যেহেতু এই বিতর্ক অধিবেশনের গোড়াতেই হয়, বিভিন্ন প্রতিনিধিদল এই সময়েই সারা অধিবেশনের জন্য নিজেদের কর্মকৌশল ঠিক করে নেয়, সম্ভাব্য মিত্র ও বিরোধী রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা করার সুযোগ পায়, রাষ্ট্রসংঘের বহুবিধ কার্য্য সম্পর্কে লম্বা লম্বা প্রতিবেদন পড়ে, অথবা বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সভ্যদের জানবার চেষ্টা করে (এক বৎসর বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সভ্য হয়ে যাঁরা আসেন, তাঁদের সবাই পরের বৎসর আসেন না এবং সেদিক থেকে পরপর দুবৎসর সভার চেহারা কখনও এক হয়না)।

সার্বজনীন বিতর্কের উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রত্যেক প্রতিনিধিদলকে স্বীয় বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া। তবে কোন নির্ধারিত বিষয়ে বিতর্ক-কালে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং সাড়ম্বর বাগ্মীতা না হওয়াই বাঞ্চনীয়। তবে এদিক থেকে সাধারণ সভাকে প্রশংসা করা যায়না। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সাপেক্ষে বক্তৃতার সময় অথবা একই বক্তার বক্তৃতার সংখ্যা সীমিত করা গেলেও অথবা সভার কার্য্যপ্রণালীতে আলোচনা অবসানের বিধান থাকলেও বাস্তবে খুব একটা লাভ হয়না। বিভিন্ন সমিতিতে যথার্থভাবে বিবেচিত বিষয়সমূহের উপর সভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে দীর্ঘ বক্তৃতা বন্ধ করার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। অতএব দেখা যায় যে, একই বক্তা একই বক্তব্য উপসমিতিতে, স্থায়ী

সমিতিতে এবং সভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে রাখতে খুব একটা কুণ্ঠা বোধ করেন না।

উদাহরণস্বরূপ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে একজন বক্তার উক্তি উদ্ধৃত করা যায়ঃ "একই প্রতিনিধি একই বিষয়ের উল্লেখ বার বার করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যৌক্তিকতা বৃদ্ধি পায় কিনা আমি জানিনা, তবুও সেই সমস্ত প্রতিনিধি যাঁরা আমার বক্তব্য প্রথমে উপসমিতিতে, আবার সমিতিতে শুনেছেন, তাঁদের সম্মুখে সেই বিষয়ে পুনরায় বক্তব্য রাখতে হবে বলে আমি লজ্জিত"। তবে কঠোর উপায়ে এর সমাধান বিধেয় নয় কারণ প্রতিনিধিগণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসাবে (সংসদ সদস্যের ভূমিকায় নয়) সাধারণ সভায় সমবেত হয়ে থাকেন। একথা অবশ্য বলা যায় যে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের অনেকেই স্বদেশের সংসদে বিতর্ক নিয়ন্ত্রণে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেন না। সভার বিতর্কে সভাপতির উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই বললেই চলে। কারণ সভার কার্য্য-প্রণালী অনুসারে সভাপতির কর্তব্য হচ্ছে "বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য-পেশের ইচ্ছাপ্রকাশের ক্রম অনুসারে বক্তাকে আহ্বান করা।" অর্থাৎ সুষম আলোচনার খাতিরে অথবা পুনরালোচনা বন্ধ করার প্রয়োজনে বক্তা নির্বাচনে তাঁর কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাই নেই। বৃটিশ কমন্স্ সভার অধ্যক্ষের মত ক্ষমতা নেই বলে যথার্থ কারণেই মিঃ স্পাক্ (এক সময় সাধারণ সভার সভাপতি) আক্ষেপ করেছিলেন। তবে তিনি এও জানতেন যে সাধারণ সভা সেই পর্য্যায়ে পৌঁছয়নি। কিছু কিছু ক্ষমতা কাগজে-কলমে অবশ্য সভাপতির আছে। যেমন, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা না করতে কোন বক্তাকে বলা। দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিছু কিছু সভাপতি এধরণের ক্ষমতার ব্যবহারও করেছেন। তবে সব সভাপতিই সমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। তাছাড়াও কোন সভাপতিকর্তৃক এধরণের ক্ষমতা ব্যবহারের ফলে কোন সদস্যরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হলে বরং অধিকতর ক্ষতি হতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে অনুরোধ করে, পরামর্শ দিয়ে অথবা তাদের শুভবুদ্ধির প্রতি আবেদন করে এবং দিনের কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তাদের সাথে আলোচনা করেই বিভিন্ন সভাপতি বেশী সুফল পেয়েছেন। আবার এও ঠিক যে, রাষ্ট্রসংঘের সদস্যসংখ্যা এবং সভার কর্মসূচীভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় সভাপতিকে অধিকতর ক্ষমতা দিতেই হবে। চতুর্থ সাধারণ সভার প্রাক্কালে

যুগোশ্লাভিয়া নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার সময় সোভিয়েৎ প্রতিনিধি মিঃ ভিসিনিস্কি প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। সভাপতির নির্দেশ সত্ত্বেও এই প্রতিবাদ চলতে থাকলে জেনারেল রমুলো 'ব্যাখ্যার রীতি' (interpretation system) তুলে দেওয়ার হুমকী দিয়ে তা বন্ধ করেন। বস্তুতঃ সভার কাজে বাধা দেওয়ার কৌশল কোন প্রতিনিধিই সর্বান্তঃকরণে প্রয়োগ করতে চাইবেন বলে মনে হয়না কারণ এর ফলে বৃহৎ সংখ্যক সভ্যরাষ্ট্রের বিরক্তিই উৎপাদিত হয়, লাভ বড় একটা কিছুই হয়না। সমবেত প্রতিনিধিবর্গের বাগ্মীতাপ্রিয়তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, যতই অধিবেশন এগুতে থাকে, ততই প্রতিনিধিবর্গ আপোষ ও সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়ে সভার কাজ সহজ করে দেন। একে অনেকটা ভ্রমণের আগে গোছগাছের সাথে তুলনা করা চলে। যতক্ষণ সময় পাওয়া যায় ততক্ষণই গোছগাছ করে নেওয়া হয়। (সভার নিয়মিত অধিবেশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিউইয়র্ক থেকে বড়দিনের আগে শেষ জাহাজ ছাড়ার সাথে অধিবেশনের সমাপ্তির যোগাযোগ থাকে কেননা বড়দিনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ যাতে স্বদেশে পৌঁছতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়)। অধিবেশনের সমাপ্তি যতই ঘনিয়ে আসে ততই অধিকতর সময় ধরে সম্মেলন চলে, আলোচনা আরও বাস্তবানুগ হয়, কোন সূত্র গ্রহণ করার দিকে আগ্রহ বাড়ে এবং চুলচেরা বিচারের প্রবৃত্তি কমে আসে। এবং ভোটের মাধ্যমেই ত্বরান্বিত ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে বড়দিনের আগেই সভার অধিবেশন শেষ করার নিয়ম অন্ধভক্তিসম্ভূত নয়। 1956-57 খৃষ্টাব্দে সুয়েজ নিয়ে, 1961-62 খৃষ্টাব্দে কঙ্গো নিয়ে যেমন হয়েছিল, তেমন সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে সভার অধিবেশন বরং বড়দিন ছাড়িয়ে নববর্ষ পর্য্যন্ত চলতে থাকে। এছাড়াও, মার্চ-এপ্রিল মাসে অথবা নিউইয়র্কের প্রচণ্ড গরমের সময় অধিষ্ঠিত জরুরী অধিবেশনের নজির বেড়েই চলেছে।

সার্বজনীন বিতর্কের কথা বাদ দিলে সাধারণ সভার আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রস্তাব গ্রহণ। সেদিক থেকে সভার আলোচনায় অবাধ স্বাধীনতাভোগের সুযোগ নেই, চার্টারই আলোচনার গণ্ডী বেঁধে দেয়। তবে এও ঠিক যে সীমিত ক্ষমতা নিয়ে শুরু হলেও ইতিমধ্যে সাধারণ সভার ক্ষমতার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে। সোভিয়েৎ সরকার গোড়ার দিকে রাষ্ট্রসংঘকে বৃহৎশক্তিবর্গকর্তৃক পরিচালিত নিরাপত্তা সংস্থা হিসাবেই

ধরে নিয়েছিল বলে সাধারণ সভাকে অপ্রয়োজনীয় সংযোজন মনে করে একে গৌণভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখার কথা ভেবেছিল। কিন্তু সাধারণ সভার ভূমিকার প্রাথমিক রূপদান হয় ডাম্বারটনওক্স প্রস্তাবে। ঠিক হয় যে, সাধারণ সভা রাষ্ট্রসংঘ-ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অঙ্গ হবে, সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদসহ অন্যান্য অঙ্গসমূহের প্রতিবেদন গ্রহণ ও বিবেচনা করবে, বাজেট ও সচিবালয় নিয়ন্ত্রণ করবে এবং রাষ্ট্রসংঘের ব্যয় নির্বাহের জন্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক দেয় চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করবে। তবে সাধারণ সভাকে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যমণি করাটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়; আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে উপদেশ ও পরামর্শদানের সীমিত ক্ষমতা সাধারণ সভার থাকলেও প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদকেই দেওয়া হয়েছে; দীর্ঘকালধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজেই সাধারণ সভার ভূমিকার উপর বেশী করে জোর দেওয়া হয়েছে (যেসমস্ত কাজকে সোভিয়েৎ সরকার গুরুত্বহীন এবং ক্ষতিকর নয় বলে মনে করতো)। কিন্তু সান্‌ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের একটা বড় অংশের নিকট সাধারণ সভার এই ভূমিকা যথেষ্ট মনে হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই ক্ষুদ্ররাষ্ট্র-সমূহ সভার হাতে অধিকতর ক্ষমতার পক্ষপাতী ছিল; কিন্তু বৃহৎ-শক্তিগুলিরও (বিশেষকরে মার্কিন সরকারের) ধারণা হয়েছিল যে বৃহৎশক্তিবর্গের সম্ভাব্য মতৈক্যের উপর খুব বেশী নির্ভর করা ঠিক হবেনা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর অবশিষ্ট দেশগুলিকে একত্রিত করার পথও উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। ফলে চার্টার প্রণয়নের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে সাধারণ সভার রাজনৈতিক ভূমিকা যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। সান্‌ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনেই স্থিরীকৃত হয় সভার ব্যাপক বিচরণক্ষেত্র। ফলে 10 নম্বর ধারা বলে সাধারণ সভা বর্তমান চার্টারের এক্তিয়ারভুক্ত "যে কোন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা" করতে পারে; 11(3) নম্বর ধারা বলে "আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে এমন সমস্ত পরিস্থিতির প্রতি সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে"; এবং 14 নম্বর ধারা বলে অত্যন্ত ব্যাপক সুপারিশমূলক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে। 10 নম্বর ধারার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে 14 নম্বর ধারার এক্তিয়ারে আসে এমন বিষয়সমূহের তালিকা করার দরকার হয়না। তবে আমরা আগেও দেখেছি যে চার্টার প্রণয়নে যুক্তির চেয়ে রাজনৈতিক

কারণকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং রাজনৈতিক কারণেই 14 নম্বর ধারা চার্টারভুক্ত হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, "যে কোন পরিস্থিতি, তার উৎস যা-ই হোক না কেন, যা' সাধারণ কল্যাণ, অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ব্যাহত করতে পারে অথবা বর্তমান চার্টারের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ সম্পর্কিত বিধানাদি ভঙ্গের জন্য যে পরিস্থিতির উদ্ভব, সে সমস্ত পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 12 নম্বর ধারার বিধানাদিসাপেক্ষে (অর্থাৎ কোন বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ কাজ চালিয়ে যেতে থাকলে সে বিষয়ে সাধারণ সভা সুপারিশ করতে পারেনা) সাধারণ সভা কার্য্যক্রম সুপারিশ করতে পারবে।" 10 নম্বর ধারার অন্তর্নিহিত অর্থকে এরকমভাবে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল "চুক্তি পরিবর্তন" (revision of treaties) কথাটি উল্লেখ না করে (পাছে ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিক দায় এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়) স্থিতাবস্থার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা বলা।

একথা ঠিক যে 1945-46 খৃষ্টাব্দেও সাধারণ সভাকে অর্পিত ব্যাপক ক্ষমতা কেবল সম্ভাবনাসূচকই ছিল। নিরাপত্তা পরিষদ প্রত্যাশিত উপায়ে কর্তব্যপালনে অক্ষম হলেই সাধারণ সভাকর্তৃক এই ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্ন উঠতো। 12 নম্বর ধারাকর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধ থেকেই তা বোঝা যায়। তবে পরিস্থিতির দিক থেকে বলা যায় যে, গোড়া থেকেই সাধারণ সভা স্বীয় চেষ্টাবলে রাজনৈতিক ভূমিকায় সক্রিয় হতে পারতো। আমরা অবশ্য দেখেছি যে 1947 খৃষ্টাব্দ থেকেই নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থা বিদ্যমান থাকার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত (যেগুলি পরিষদ আলোচনা করতে সমর্থ হয়নি) বৃহৎশক্তিগুলিই সাধারণ সভার দ্বারস্থ হয়েছে।

সাধারণ সভার বিভিন্ন রকমের কাজের মধ্যে সভা বাঁধাধরা ছকে পার্থক্য বজায় না রাখলেও (সমালোচকগণ এ ব্যাপারে বারবার চার্টার-ভঙ্গের অভিযোগ তুললেও এবং অক্ষরে অক্ষরে চার্টারের বিধান মেনে চলার প্রয়োজনের দিকে তাঁরা অঙ্গুলি নির্দেশ করলেও) সাধারণ সভার কার্য্যাবলীকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করাই সুবিধাজনক। সাধারণ সভা যদি আইনসভা হতো তবে ওয়াল্টার বেজহট্‌কে অনুসরণ করে এর কার্য্যাবলীর প্রথম শ্রেণীকে বলা যেত 'শিক্ষাদানমূলক' (teaching) কাজ। অর্থাৎ সাধারণ নীতি নির্ধারণের কাজ।

চার্টারের 11(1) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে: "সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের নীতি-সমূহসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাধারণ নীতিসমূহ বিবেচনা করতে পারবে এবং উক্ত নীতিসমূহের ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কাছে বা নিরাপত্তা পরিষদের কাছে অথবা উভয়ের কাছেই সুপারিশ পেশ করতে পারবে।" এদিকে লক্ষ্য রেখেই শান্তিরক্ষার সমস্যা নিয়ে সাধারণ সভায় বারবার বিতর্ক হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 1949 খৃষ্টাব্দে গৃহীত "শান্তির জন্য অপরিহার্য্য বিষয়"-সংক্রান্ত প্রস্তাব (Essentials of Peace), 1957 খৃষ্টাব্দে গৃহীত "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত ঘোষণা" (Declaration Concerning Peaceful Co-existence) প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ছাপার অক্ষরে এধরণের প্রস্তাবকে পাপ না করার জন্য নৈতিক আবেদন (বিদ্রূপার্থে) বলে মনে হয়। এধরণের প্রস্তাব গ্রহণকালে বিতর্কেও দেখা যায় যে সভায় স্বাভাবিকতা থাকেনা, বিতর্কে ভণ্ডামি, কৃত্রিমতা ও ফাঁপা কথার (যা' কোন সংগঠনের পক্ষেই হিতকর নয়) ছড়াছড়ি দেখা যায়। অতএব আর যাই হোক এধরণের বিতর্কে সত্যোদ্‌ঘাটন, সত্যপ্রতিষ্ঠা বা সত্যপ্রচারের কিছুই হয়না। সেদিক থেকে এধরণের প্রস্তাবের তেমন কোন মূল্য না থাকলেও সেগুলির গ্রহণকালের বিতর্ক সর্বদাই নিরর্থক হয়না। কারণ এরকমের বিতর্কের ফলেই সভার মতৈক্যের নিবন্ধকরণ সম্ভব হয় বা সভার মেজাজের গতি-প্রকৃতি বোধগম্য হয়।

উপরিউক্ত ভূমিকার আরও সুনির্দিষ্ট সমস্যা (নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে) আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সভার বিতর্ক মোটামুটিভাবে অধিকতর গঠনমূলক হয়েছে। যেমন এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখেছি, নিরস্ত্রী-করণের বিষয়ে শুধু সাধারণ নীতি নির্ধারণের প্রশ্নেই নয়, আলোচনা ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থাপনা গ্রহণেও বারবার, যেমন, 1946 খৃষ্টাব্দে 'আণবিক শক্তি কমিশন', 1952 খৃষ্টাব্দে 'নিরস্ত্রীকরণ কমিশন' এবং 1955 খৃষ্টাব্দে 'আণবিক বিচ্ছুরণের ফলাফল অনুসন্ধান নিমিত্ত বিজ্ঞানী সমিতি' (Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) গঠনে পরিষদকে পরিচালনা করায় (নিরাপত্তা পরিষদের বিবেক এবং চালিকাশক্তি হিসাবে) সাধারণ সভার অবদান অনন্য। অবশ্য শান্তিরক্ষার সাধারণ নীতি নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিতর্কের

তুলনায় নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সভার বিতর্ক অনেক বেশী অর্থবহ এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে নিশ্চিত হওয়ার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা অত্যন্ত জরুরী, এ বিষয়ে অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্রই আপেক্ষিকভাবে নিস্পৃহ (বৃহৎশক্তিগুলিই অধিকাংশ এবং মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের অধিকারী বলে), এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ বড় বেশী বাস্তব এবং মূর্ত (concrete)। ফলে সংশ্লিষ্ট বৃহৎশক্তিগুলিকে সবসময় নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন রাখা ছাড়াও উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে সুচিন্তিত এবং বাস্তবানুগ প্রস্তাব গ্রহণ সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত কার্য্যাবলী অনেকাংশে আইনসভাকর্তৃক আইন প্রণয়ন জাতীয় কার্য্যকলাপের মত। চার্টারের 13 (1) নম্বর ধারা বলে সাধারণ সভাকে এই ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ সভা মনোনিবেশে উদ্যোগী হবে এবং সুপারিশ করবে :

(a) ....আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমান্বিত উন্নতি ও উহাকে লিপি-বদ্ধ করার ব্যাপারে উৎসাহদান ;

(b) ....জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা আদায় করার ব্যাপারে সাহায্য করা।

অবশ্য এই ধারা বলে সাধারণ সভাকর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের আইন-গত বাধ্যবাধকতা নেই। এই ধরণের প্রস্তাবকে "আইনের মত" (quasi-legislative) বলা চলে এবং এগুলি কাঠামোগতভাবে আইনের সাথে তুলনীয় হলেও আইনের ন্যায় এগুলি বাধ্যবাধক নয়। এই ধারার প্রথমাংশ চার্টারভুক্ত হয়েছিল কারণ সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে অনেক রাষ্ট্রেরই (বিশেষ করে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলির) ধারণা হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে আন্তর্জাতিক আইনকে যথার্থ স্থান ডাম্বারটনওক্স প্রস্তাবে দেওয়া হয়নি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ যে প্রেরণার ফলে গঠিত হয়েছে সেই প্রেরণার ফলেই 13 নম্বর ধারার দ্বিতীয়াংশ চার্টারের স্থান পেয়েছে এবং উক্ত পরিষদের কার্য্যাবলীর মাধ্যমে শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সাধারণ সভা প্রণীত 'আইন' যথার্থ অর্থে আইন নয়। যাই হোক্, আইন-প্রণয়নসংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণ সভা মোটামুটি তিনভাবে অগ্রসর হয়েছে। প্রথমতঃ 1948 খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক আইন কমিশন গঠন করা হয়। আন্তর্জাতিক আইনে পনেরোজন পারদর্শী ব্যক্তিকে নিয়ে এই কমিশন (এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা পঁচিশ) প্রথমে

গঠিত হয়। এতে প্রত্যেক সদস্য পাঁচ বৎসরের জন্য বেসরকারী পরিচয়ে (তাঁর দেশীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে নয়) কাজ করেন। এই কমিশনের কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন লিপিবদ্ধকরণের জন্য এবং ঘোষণার জন্য খসড়া প্রস্তুত করে সাধারণ সভার নিকট পেশ করা। এগুলির ভিত্তিতেই সাধারণ সভা উপরিউক্ত ক্ষেত্রে এর দ্বিতীয় কাজ হিসাবে আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন নীতির অস্তিত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ 'ন্যুরেমবার্গ বিচার সভার আইন' (Charter of the Nuremberg Tribunal) এবং উক্ত বিচার সভার রায়ের মধ্যে নিহিত নীতিসমূহের কথা বলা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের সহায়তা ছাড়াই সাধারণ সভা বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্য্য-কলাপের যথাযথ মাপকাঠি (আইনের অর্থে) হিসাবে 'রীতি' (convention) এবং 'ঘোষণা' (declarations) প্রস্তুত ও গ্রহণ করতে পারে; এবং এগুলিকে অনুমোদন করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় জাতীয় আইন প্রণয়ন করে এগুলিকে বাস্তবরূপ দান করার জন্য সাধারণ সভা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বলতে পারে। এর নমুনা হিসাবে 1948 খৃষ্টাব্দে গৃহীত 'কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিলোপসাধন নিবারণ সংক্রান্ত রীতি' (Genocide Convention), (যার ফলে দলহত্যাকে বে-আইনী করা হয়েছে), অথবা 1965 খৃষ্টাব্দে গৃহীত 'জাতিগত কারণে সর্বপ্রকার ভেদ-নীতি দূরীকরণ সংক্রান্ত রীতির' (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) উল্লেখ করা যায়।

উপরিউক্ত ক্ষেত্রে সাধারণ সভার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি; এ ব্যাপারে লীগ সভার কৃতিত্বই বরং বেশী ছিল। সাধারণ সভার অসাফল্যের কারণও আছে। আন্তর্জাতিক আইনের উন্নতির পক্ষে (কোন বাঁধাধরা ব্যবস্থাপনার মাধমে) 1945 খৃষ্টাব্দের বৎসরগুলি তেমন সহায়ক হয়নি। কোন বৈপ্লবিক এবং বিক্ষুব্ধ যুগে আন্তর্জাতিক ব্যবহারের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণযোগ্য রীতি-নীতির নিয়মিত উন্নতি সাধন না হওয়ারই কথা। জাতিপুঞ্জের যুগও অশান্তিপূর্ণ ছিল। তবে সে যুগে পৃথিবীতে ইউরোপের প্রাধান্য থাকায় আইন-কানুন সম্পর্কে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণাই গ্রহণ-যোগ্য ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্র পাশ্চাত্ত্যের শোষণের (বাস্তব অথবা কাল্পনিক) বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বলে একটি বিষয়ে তারা স্থির মস্তিষ্কে ভাবতে পারছেনা। সেটি হলো আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা

বজায় রাখতে কতখানি সহায়ক হবে অথবা তাদের পূর্বতন মনিবদের সুবিধা বজায় রাখতে কতখানি সহায়ক হবে। বৃহৎশক্তিবর্গও সার্বভৌমত্ব ও নিজেদের মধ্যে কলহের কারণে সাধারণ সভাকে যথার্থ নেতৃত্ব দিতে পারেনি। ফলে সাধারণ সভার মত সমাবেশে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হয়েছে। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক আইনের উন্নতির নামে রাজনৈতিক দর-কষাকষিই বেশী হয়েছে অথবা সর্বৈব রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে আইনের সমাধানের ব্যর্থ পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। 'আগ্রাসী যুদ্ধের' (aggression) সংজ্ঞা খুঁজে বার করার ব্যর্থ* এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টার বেদনাদায়ক উদাহরণকে উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক আইন কমিশনে এবং সাধারণ সভার ষষ্ঠ (আইন সংক্রান্ত) সমিতিতে অধিবেশনের পর অধিবেশনে বার বার একই ধরণের চুল-চেরা যুক্তি-তর্কের অবতারণা হয়েছে।

উপরে আলোচিত দুই শ্রেণীর কাজের চেয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করে শান্তি বজায় রাখার অঙ্গ হিসাবে সাধারণ সভার ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণ সভা এই ভূমিকায়ই সর্বাধিক পরিচিত শুধু তাই নয়, সাধারণ সভাও এই রাজনৈতিক ভূমিকাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এর জন্য সর্বাধিক কালক্ষেপ করে থাকে, এবং এই ভূমিকায়ই সভা অনন্য সাফল্যের গৌরব অর্জন করেছে।

অথচ আমরা আগেই দেখেছি যে, সভাকে কোন রাজনৈতিক ভূমিকা দেওয়ার অভিপ্রায় গোড়ার দিকে চার্টার প্রণেতাগণের ছিল না। শুধু শান্তি বলবৎমূলকব্যবস্থা গ্রহণেই যে নিরাপত্তা পরিষদকে সর্বৈব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাই নয়; 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকী এমন বিবাদ বা পরিস্থিতির' ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদকে (12 নম্বর ধারা বলে) অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যদিও 35 নম্বর ধারা বলে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ বা পরিস্থিতি নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সাধারণ সভার নিকট উপস্থাপিত করা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন, তবুও 1945 খৃষ্টাব্দে ধারণা হয়েছিল (বিশেষ করে বৃহৎশক্তিবর্গের) যে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী বিষয়গুলি পরিষদের নিকট এবং অবশিষ্ট

---

* আগ্রাসী যুদ্ধের একটি সংজ্ঞা অবশ্য 1974 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ সভায় গৃহীত হয়েছে।

বিষয় সাধারণ সভার নিকট আনা হবে। ইরাণ ও সিরিয়ার অভিযোগ নিয়ে (যেগুলির জন্য শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার তেমন সম্ভাবনা ছিল না) নিরাপত্তা পরিষদ বুঁদ হয়ে থাকাতে এবং ভেটোর অপব্যবহারের ফলে বিভিন্ন বিবাদ এবং পরিস্থিতির প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রেণীবিভাগ এবং পরিষদ ও সভার মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিভাজন ব্যবস্থা গোড়াতেই ভেঙে পড়েছিল এবং যেসমস্ত বিবাদ এবং পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকী-স্বরূপ ছিল সেগুলি মোকাবিলা করার যোগ্যতা পরিষদ হারিয়ে ফেলেছিল। ভেটোজনিত অচলাবস্থার সম্ভাবনা আগে থেকেই ধরে নিয়ে 1947 খৃষ্টাব্দ নাগাদ যখন গ্রীক্ (বল্‌কান) প্রশ্ন এবং কোরীয় স্বাধীনতার প্রশ্নের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাধারণ সভায় উত্থাপিত হয় তখন একটুও অস্বাভাবিক মনে হয়নি। ঐ বৎসরই অন্তর্বর্তীকালীন সমিতি (Interim Committee অথবা Little Assembly) গঠিত হওয়ায় এই প্রক্রিয়া আরও জোরদার হয়। এই সমিতি ঠিক মত কাজ করতে পারলে পরিষদের কাছ থেকে অনেকখানিই ছিনিয়ে নিতে পারতো কারণ পরিষদের বিশেষ দুটি সুবিধা—কমসংখ্যক সদস্য এবং ক্রমাগত অধিবেশন—এরও ছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সমিতি অবশ্য ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু সুনির্দিষ্ট সঙ্কটের মোকাবিলার উপায় হিসাবে সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন (যেমন 1951-52 খৃষ্টাব্দে হয়েছিল) এবং ক্রমাগত অধিবেশনের ব্যবস্থা থেকেই গেছে এবং ইদানীংকালে সভার অধিবেশন শুধু শরৎ-কালের মধ্যেই বড় একটা সীমাবদ্ধ থাকেনা। তাছাড়া 12 নম্বর ধারা বলে আরোপিত নিষেধের কার্য্যকারিতাও আর নেই। এখন প্রথা হয়েছে যে, পরিষদের কর্মসূচী থেকে কোন বিষয় সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে ভেটো প্রযোজ্য নয়। এছাড়াও, ওকালতী বুদ্ধির প্রয়োগের ফলে এখন পরিষদ ও সভা একই সঙ্গে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে; শুধু দেখাতে হবে যে একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক (aspects) নিয়ে (পরিষদে আলোচনা চলছে এমন দিক নিয়ে নয়) সভা আলোচনা করছে। কোন বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে কর্মসূচীভুক্ত না করলেই (যেমন, 'প্যালেস্টাইন প্রশ্ন') এটা সম্ভব। এর ফলে পরিষদ কি করছে না করছে লক্ষ্য না করেই সভা যেকোন বিষয়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা ভোগ করতে পারে।

সর্বোপরি, উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে 1950 খৃষ্টাব্দের "শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাবের" (Uniting for Peace Resolution)

উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রস্তাবের বলে চার্টারের সপ্তম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়, অর্থাৎ, 'শান্তির প্রতি হুমকী, শান্তিভঙ্গ এবং আগ্রাসী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ', (যা' নিঃসন্দেহে পরিষদের জন্যই রাখা হয়েছিল) সাধারণ সভারও এক্তিয়ারে আনার প্রচেষ্টা হয়েছিল। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, 'নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্যের জন্য পরিষদ (শান্তিরক্ষার) প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে' সাধারণ সভা (শান্তিভঙ্গ অথবা আগ্রাসী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থাসহ) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বা পুনরুদ্ধারকল্পে প্রয়োজনীয় যৌথ-ব্যবস্থার জন্য 'উপযুক্ত সুপারিশ' করতে পারবে। নিরাপত্তা পরিষদের যেকোন সাতটি সদস্যরাষ্ট্রের (1965 খৃষ্টাব্দ থেকে নয়টি) ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তের বলে (সভা অধিবেশনে না থাকলে) অথবা সাধারণ সভার সদসরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তের বলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এতদুদ্দেশ্যে সভার অধিবেশন আহ্বান করা যায়। এভাবে সভা আহূত হলে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (যদি ভিন্ন ধরণের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সভায় না হয়) সাধারণ সভা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনার জন্য সরাসরি অগ্রসর হয়।

রাজনৈতিক বিষয়সমূহে সাধারণ সভার ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে (চার্টারের ভাষায়) 'আন্তর্জাতিক বিবাদ এবং পরিস্থিতির নিষ্পত্তি ও সামঞ্জস্য বিধান' থেকে আরম্ভ করে 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা' পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ে সাধারণ সভা কার্য্যপ্রণালীর দিক থেকে কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলেনি দেখে অবাক হতে হয় যে, কোন বিষয়ে সুপারিশ করতে গিয়ে সভা অনেক সময় জেনেশুনেই চার্টারের বিধানের অথবা আইনের সূক্ষ্মতার প্রতি উদাসীন থেকেছে। বৈধতার প্রতি অবহেলাই শুধু এর কারণ তা নয়, বৃহত্তর ঐক্যের খাতিরেই সূক্ষ্মতা ও আইনের চুলচেরা হিসাব এড়িয়ে প্রস্তাব করতে হয়। 1958 খৃষ্টাব্দের লেবানন ও জর্ডান সঙ্কটের সময় যখন অচলাবস্থা-কবলিত নিরাপত্তা পরিষদ থেকে উক্ত সঙ্কটের আলোচনা সাধারণ সভায় স্থানান্তরিত করার প্রশ্ন ওঠে, তখন পরিষদের সিদ্ধান্তে (যে সিদ্ধান্তের বলে ঐ বিষয় বিবেচনার জন্য সভার অধিবেশন আহ্বান করা হয়) 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাবের' উল্লেখমাত্র করা হয়নি কারণ সোভিয়েৎ সরকার সর্বদাই এই প্রস্তারের বৈধতা অস্বীকার করেছে বলে বিপক্ষে ভোট দিতে

বাধ্য হতো। একই কারণে সাধারণ সভাকেও কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তির খাতিরে সঙ্গতিপূর্ণতা অথবা নজিরের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই অগ্রসর হতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নিরাপত্তা পরিষদ যেসমস্ত পন্থা (এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত) অবলম্বন করে থাকে, সাধারণ সভাকেও সেই সমস্ত পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। 'তদন্তের' (Investigation) ব্যবস্থা প্রায়ই সাধারণ সভাকে করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ 'প্যালেস্টাইন সম্পর্কিত বিশেষ সমিতি' (Assembly's Special Committee on Palestine) যাকে প্যালেস্টাইন সমস্যার সাথে জড়িত সমস্ত প্রশ্ন ও বিষয় অনুসন্ধান করার জন্য অত্যন্ত ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, অথবা 1957 খৃষ্টাব্দে গঠিত 'হাঙ্গেরী সংক্রান্ত সমিতির' (Committee on Hungary) উল্লেখ করা যেতে পারে। 'মধ্যস্থলে উপস্থিতির' (Interposition) পন্থা অবলম্বন করেও (যেমন সুয়েজ ও সিনাইয়ে রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীর অবস্থানের মাধ্যমে) সাধারণ সভা একাধিক প্রশ্নে প্রশংসাযোগ্য সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। বৃহদাকারের জন্য সাধারণ সভা 'অনুরঞ্জনের' (Conciliation) ভূমিকা নিজে সরাসরি গ্রহণ না করে অধীনস্থ কোন অঙ্গের উপর ন্যস্ত করেছে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কিত বিবাদ নিরসনকল্পে 'মধ্যস্থতা কমিশন' (Good Offices Commission) গঠন করা হয়েছিল। অনেক সময় অনুরঞ্জনের দায়িত্ব বিশেষ যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়। যেমন প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত বিবাদে কাউন্ট বার্ণাডোটকে (Count Bernadotte) এবং পরবর্তীকালে ডঃ বান্চকে (Dr. Bunche) রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতাকারী (U. N. Mediator) নিযুক্ত করা হয়েছিল। এধরণের কাজে সহাসচিবের সাহায্য নেওয়ার ঘটনা কিছুকাল যাবৎ বেড়েই চলেছে। অন্যায় কার্য্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে অথবা বিবাদ মীমাংসা করে নিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নিকট সাধারণ সভা 'সুপারিশ' (Recommendations) বহুবার রেখেছে এবং সে সমস্ত 'সুপারিশের' অনেকগুলিই (যেমন সুয়েজ এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য বৃটেন, ফ্রান্স ও ইজরায়েলের নিকট অথবা হাঙ্গেরী থেকে সৈন্য অপসারণ করা এবং হাঙ্গেরীতে অবৈধ কার্য্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার জন্য সোভিয়েৎ সরকারের নিকট করা হয়েছিল) আরও শক্তিশালী 'আবেদনের' (Appeals) রূপ পরিগ্রহ করেছে। (চতুর্থ অধ্যায়েই আমরা দেখেছি যে 'আবেদন' কথাটি

গতানুগতিক অর্থে ধরা হয়না, বরং একে প্রচ্ছন্ন আদেশই বলা চলে)। 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাবের' বলেও সাধারণ সভা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসমূহকে বাঞ্ছনীয় পথে অগ্রসর হতে বলা ছাড়া কিছুই করতে পারেনা এবং এই প্রস্তাবের জীবনকালের গোড়ার দিকেই সাধারণ সভা এই প্রস্তাব-বলে সর্বাধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। একমাত্র কোরীয় সঙ্কটেই সাধারণ সভা উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী অভিহিত করে সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রসংঘকে সমস্ত রকম সম্ভাব্য সাহায্য দিতে বলেছিল এবং উত্তর কোরিয়ায় গোলাগুলি প্রেরণ বন্ধ করার সুপারিশ করেছিল। সুয়েজ অথবা হাঙ্গেরীর প্রশ্নে সাধারণ সভা এতটা করেনি। ষাটের দশকে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলনের ধাক্কায় সাধারণ সভা অবশ্য আদেশব্যঞ্জক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অতএব আমরা দেখতে পাই যে 1965 খৃষ্টাব্দ থেকে উপর্যুপরি অধিবেশনে সাধারণ সভা দক্ষিণ রোডেশিয়া থেকে অবৈধ স্মিথ্ সরকারকে সামরিক শক্তি প্রয়োগে (বৃটেনকর্তৃক) অপসারিত করার জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট এবং পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির জনসাধারণের প্রতি পর্তুগীজ সরকারের আচরণের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে বলে পর্তুগালের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। অনেকেই মনে করেন যে এই সমস্ত প্রস্তাবের বৈধতা সন্দেহজনক। তাছাড়াও বলা যায়, যেসমস্ত রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এইসব প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা সম্ভব ছিলনা সেই সমস্ত রাষ্ট্র এই প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার পরেও ঐগুলি গ্রহণ করে সাধারণ সভা স্বীয় প্রস্তাবসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণই করেছে।

উপরিউক্ত ক্ষেত্রে সাধারণ সভার একটি গঠনমূলক ভূমিকা আছে—যা' নিরাপত্তা পরিষদকে দেওয়া হয়নি। এই ভূমিকাটি সভার কার্য্যাবলীর তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। সেটি হলো নূতন নূতন আইনের ও রাজনৈতিক বিন্যাস (Order) স্থষ্টির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পথে স্থিতাবস্থার পরিবর্তন সাধন করা। এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই সাধারণ সভা প্যালেস্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের বিকল্প হিসাবে প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এর ফলেই ইজরায়েলের স্থষ্টি হয়। প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সাথে অর্থনৈতিক ভিত্তির

প্রশ্ন জড়িত মনে করে সাধারণ সভা প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুদের ত্রাণকার্য্যে, বিশেষ করে 'রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থার' (U. N. Relief and Works Agency) মাধ্যমে, যথাসম্ভব অগ্রসর হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ নূতন নূতন আইনের এবং রাজনৈতিক বিন্যাস সৃষ্টিকল্পে সাধারণ সভার প্রয়াসে যথোচিত বাস্তববাদীতার পরিচয় পাওয়া যায়না। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতাসম্ভূত হতাশার বিপরীত প্রতিক্রিয়াই হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ এধরণের হতাশা কাটিয়ে ওঠার জন্য সাধারণ সভা স্বকীয় ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করার ব্যর্থ চেষ্টাই করেছে। বিশেষ করে উপনিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নে সভার ভূমিকা থেকে একথাই মনে হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাণ্ডেট সংক্রান্ত দায় পালনে অস্বীকার করলে 1967 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সাধারণ সভা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার দায়িত্বগ্রহণের জন্য এগারো সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদ গঠন করে; শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগাল উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোটদান করে এবং সমস্ত বৃহৎ-শক্তিসহ ত্রিশটি দেশ ভোটদান থেকে বিরত থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নাম দেওয়া হয় নামিবিয়া (Namibia) এবং 1968 খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে নামিবিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা উক্ত পরিষদকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করে এবং ঐ পরিষদের সদস্যগণ লুসাকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হলেও মাথানীচু করে নিউইয়র্কে ফিরে আসতে বাধ্য হন। সাধারণ সভার প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সভা নিরাপত্তা পরিষদকে শক্তি প্রয়োগ করতে অনুরোধ করলেও পরিষদ তা' প্রত্যাখ্যান করে। তবে নিরাপত্তা পরিষদ 1969 খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের চার তারিখের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসাশন অবসানের দাবী করলেও বাস্তবে কিছুই হয়নি। নির্ধারিত সময় এসেছে, চলেও গেছে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণ আজও অটুট আছে। ফলে লাভ হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অবস্থা সম্পর্কে প্রচার। তবে অন্যান্য বিষয়ের সাথে রাষ্ট্রসংঘের অক্ষমতাও প্রচারিত হয়েছে।

সাধারণ সভার ব্যাপক রাজনৈতিক ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য সৃজনশীলতা এবং নমনীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। নূতন নূতন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ সভাকে সহায়তা করার জন্য নূতন

নূতন পন্থা আবিষ্কারে সভা নিঃসন্দেহে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আস্থা সভার সৃজন-প্রতিভার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। একই বন্দোবস্ত পুনর্বার প্রয়োগ না করে নূতন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সাধারণ সভা নূতন পথের সন্ধান করেছে। অতএব দেখা যায় যে 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' বলে প্রতিষ্ঠিত 'শান্তি পরিদর্শন কমিশন' (Peace Observation Commission) অথবা 'প্যালেস্টাইন অনুরঞ্জন কমিশনের' (Palestine Conciliation Commission) কথা না ভেবে সুয়েজ সঙ্কট মোকাবিলার জন্য সাধারণ সভা মহাসচিবকে এবং সাতটি সদস্যরাষ্ট্রবিশিষ্ট এক উপদেষ্টা সমিতিকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একথা ঠিক যে, 1956 খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সভাকর্তৃক গৃহীত পন্থা যথাসম্ভব বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হয়েছিল। তবুও, এখানে এমন একটি সংগঠনকর্তৃক হঠাৎ কর্মকৌশল পরিবর্তনের প্রশ্ন জড়িত যার রূপরেখা এখনও অনিশ্চিত, যার গতি ও উদ্দেশ্যে দুর্বলতার ছাপ, যার আত্মবিশ্বাস এখনও প্রত্যাশিত ভাবে গড়ে ওঠেনি এবং যার অধীনস্থ সংস্থাগুলিতে প্রয়োজনীয় আস্থা ন্যস্ত করা হয়নি বলে সেগুলি উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য এবং কর্মপদ্ধতিগত ধারাবাহিকতা গড়ে তুলতে পারেনি। এদিক থেকে সাধারণ সভা নিঃসন্দেহে সমালোচনার পাত্র। তবে রূঢ়ভাবে সমালোচনা করার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সভার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এখনও স্বল্প এবং দায়িত্ব বহুবিধ। বৈচিত্র্য শুধু পরিস্থিতির দিক থেকেই হয়না, অন্য কারণেও হয়। একথা ঠিক যে, কোন দুটি পরিস্থিতি একরকমের হয়না, তবে সব ধরণের পরিস্থিতিকে মোটামুটি কয়েকটি বোধগম্য শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব। ব্যক্তি-বিশেষের দিক থেকেই একটি পরিস্থিতির সাথে অন্যটির তুলনা হয়না। একথা সাধারণ সভার ভিতরের ব্যক্তিদের দিক থেকেও সত্য এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবর্গের দিক থেকেও সত্য। তাছাড়াও, স্বকীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রতি সচেতনতাবশতঃ কোন রাষ্ট্রই নজিরের (অতীতের অথবা ভবিষ্যতের) শিকলে বাঁধা পড়তে চায়না। এ সমস্ত কারণেই সভাকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

সাধারণ সভার কার্য্যাবলীর চতুর্থ শ্রেণী হলো পর্য্যবেক্ষণ সংক্রান্ত। জাতিপুঞ্জের আমলে পরিষদই সচিবালয়ের কাজকর্ম পর্য্যবেক্ষণ করতো। লীগ সভার হাতে বাজেট ছিল এবং বাজেটের মাধ্যমেই লীগ সভা

সংগঠনের প্রশাসন পর্য্যবেক্ষণ করতো। জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত বিশেষ ধরণের সংস্থাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও অনুরূপভাবে লীগ সভা ও লীগ পরিষদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের বন্দোবস্ত ভিন্নরূপ। নিরাপত্তা পরিষদের উপর সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ রকমের দায়িত্বাবলী অর্পিত হওয়ায় শুধু সচিবালয়ের উপর নিয়ন্ত্রণই নয়, রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত আলোচনাকারী এবং রাজনৈতিক অঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণসহ সংগঠনের সম্পূর্ণ প্রশাসন-ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণের দায়িত্ব সাধারণ সভার উপরই ন্যস্ত হয়েছে। এজন্যই নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্ এবং অছি পরিষদকে সাধারণ সভার নিকটই প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ সভার সাথে সম্পর্কের দিক থেকে ঐ তিনটি অঙ্গকে একই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। একথা ঠিক যে, চার্টারের 11 নম্বর ধারা বলে সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত সাধারণ নীতির ব্যাপারে এবং সুনির্দিষ্ট প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ করতে পারবে; এবং 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এমন পরিস্থিতির প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।' এ থেকে ধরে নেওয়া ঠিক হবেনা যে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের একটি অপরটি থেকে বেশী অথবা কম ক্ষমতার অধিকারী। পরিষদের এক্তিয়ার চার্টারের বিধান বলেই যথার্থভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং আমরা আগেই দেখেছি যে শান্তিবলবৎ-মূলক ব্যবস্থাগ্রহণের প্রশ্নে পরিষদকে সর্ব্বৈব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং ঐ ব্যাপারে পরিষদকে অন্য কোন অঙ্গের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়না। অতএব 'প্রতিবেদন পেশ' করা পরিষদের কর্তব্য হলেও এবং 'সুপারিশ' করার অধিকার সভার থাকলেও কিছুই এসে যায় না। এবং সাধারণ সভাকে 'আইনসভা' এবং পরিষদকে 'মন্ত্রীসভা' মনে করা কোনক্রমেই ঠিক নয়। সভার নিকট পরিষদের প্রতিবেদন পেশ করা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র এবং পরিষদের প্রতিবেদন সম্পর্কে সভায় প্রায়শঃই কোন বিতর্ক হয়না। যথার্থভাবে কর্তব্য পালনের জন্য পরামর্শ-দান (যেমন ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার না করার জন্য) থেকে আরম্ভ করে কোন বিশেষ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ পর্য্যন্ত বহুবিধ বিষয়ে সাধারণ সভা পরিষদের নিকট প্রচুর সংখ্যক সুপারিশ করেছে। এই সমস্ত সুপারিশের কিছু মান্য করা হয়েছে,

কিছু অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং কিছু সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে (যেমন, 1947 খৃষ্টাব্দে পরিষদ সাধারণ সভাকৃত প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে অস্বীকার করে)।

কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের অন্য দুটি 'পরিষদের' (অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদ) সঙ্গে সাধারণ সভার সম্পর্ক সর্ব্বৈব ভিন্ন ধরণের। যদিও উক্ত পরিষদদ্বয়কে রাষ্ট্রসংঘের 'প্রধান অঙ্গ' বলে বর্ণিত করা হয়েছে এবং চার্টারের 7 নম্বর ধারায় একই সাথে উভয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও চার্টারের 60 নম্বর ধারায়ই বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সাধারণ সভাকে এবং 'সাধারণ সভার অধীনস্থ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে' দেওয়ার কথা এই ধারায় (60 নম্বর) বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে অছি-সংক্রান্ত ব্যাপারেও অছি পরিষদ সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে কাজ করবে বলে 85 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে। এ অনেকটা রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থায় অধীনস্থ সংস্থাকে ক্ষমতা হস্তান্তর (delegation) করার মত এবং এটা স্বাভাবিক কারণেই দরকার হয়। কেননা যেসমস্ত বিষয়ে নিবিড়, পুঙ্খানুপুঙ্খ, পারদর্শী এবং প্রায়শঃ নিরবিচ্ছিন্ন মনোনিবেশের প্রয়োজন হয় সেসমস্ত বিষয়ের প্রতি কোন বৃহৎ এবং অপেশাদার সদস্যসম্বলিত সভা সুবিচার করতে পারেনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিভিন্ন জাতীয় আইনসভার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে অধীনস্থ সংস্থাকে দায়িত্ব হস্তান্তর করা বাঞ্ছনীয় হলেও সর্বদা সম্ভবপর হয়না। দায়িত্ব-বণ্টন এবং দায়িত্বের সীমারেখা নির্ধারণ-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। হস্তান্তরিত ক্ষমতা যথার্থই বিশেষজ্ঞদের বিষয়-সংক্রান্ত (technical) হলেও সেগুলি যথার্থভাবে রাজনৈতিক বিষয়ও। ফলে মূল সংস্থা (সাধারণ সভা) ক্ষমতা হস্তান্তর করলেও অধীনস্থ সংস্থার উপর থেকে নিয়ন্ত্রণের রাশ আল্‌গা করেনা। এটা অনেকটা জলের ধারে না গিয়ে মেয়েকে সাঁতার কাটার অনুমতি দেওয়ার মত। রাষ্ট্রসংঘের দিক থেকে এই ব্যবস্থার সুফল এবং কুফল দুই-ই হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদকে অর্পণ করা বিশেষজ্ঞদের বিষয়-সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও সাধারণ সভা উক্ত পরিষদদ্বয়ের উপর প্রয়োজনীয় আস্থা রাখতে না পেরে বারবার অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপে লিপ্ত হয়েছে। অংশতঃ সংশ্লিষ্ট পরিষদ দুটিকেও (অর্থনৈতিক, ও সামাজিক পরিষদকে অযোগ্যতার জন্য এবং অছি পরিষদকে স্বকীয় কর্মক্ষেত্রের প্রতি অনীহার

জন্য) এর জন্য দায়ী করা চলে। অনুন্নত অঞ্চলসমূহের এবং উপনিবেশের সমস্যা নিয়েই উক্ত দুই পরিষদের প্রায় সমস্ত কাজ বলে এদের কাজে আগ্রহী সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যাও প্রচুর। ফলে সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে ও ক্ষয়প্রাপ্ত অছি পরিষদে এই সমস্ত আগ্রহী রাষ্ট্রের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নয়। এছাড়াও, অনেক সময়ই সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের নিকট 'প্রতিনিধিত্ব' কথাটি নিরর্থক মনে হয় বলে উক্ত দুই পরিষদের কার্য্যকলাপ ও সুপারিশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করার জন্য সর্বদাই সাধারণ সভার উপরে চাপ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এবং এ ব্যাপারে অনুন্নত সদস্যরাষ্ট্রসমূহের ভোটসংখ্যাই অনুপাতে বেশী। ফলে সাধারণ সভার তৃতীয় (সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়-সংক্রান্ত) সমিতির ও চতুর্থ (অছি-সংক্রান্ত) সমিতির কর্মসূচী প্রায়ই ঠাসা থাকে এবং এই দুই সমিতির দীর্ঘ বৈঠক হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, সংশ্লিষ্ট পরিষদদ্বয়কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য যেসমস্ত প্রস্তাব এই দুই সমিতিতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে সেগুলি অনেক সময়ই সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ হয় না।

সচিবালয়ের উপর সাধারণ সভার নিয়ন্ত্রণ অধিকতর পরিচিত এবং সন্তুষ্টিজনক পথে হয়ে থাকে। সংসদীয় বন্দোবস্তের সাথে এক্ষেত্রেও কিছু কিছু সামঞ্জস্য থাকলেও সরাসরি তুলনা করা নিরাপদ নয়। অতএব দেখা যায় যে, মহাসচিব সভার নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও তিনি সভার বিবেক এবং পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করতে পারেন। তবে একথাও ঠিক যে সচিবালয় নিয়ন্ত্রণ করার সমস্ত চাবিকাঠি সভার হাতে আছে। স্বকীয় কার্য্যকলাপ এবং সাংগঠনিক বিষয়ে পুরোপুরি এবং নিয়মিত প্রতিবেদন সচিবালয়কে সভার নিকট পেশ করতে হয় এবং সেগুলির যথার্থ বিবেচনায় সভাকে সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্তও রয়েছে। সভাকর্তৃক গঠিত 'প্রশাসনিক ও বাজেটসংক্রান্ত প্রশ্নে উপদেষ্টা সমিতি' (Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions) বৃটিশ কমন্‌স্ সভার এস্টিমেট্‌স্ কমিটি ও পাবলিক একাউণ্ট্‌স্ কমিটির দ্বৈত ভূমিকাই শুধু পালন করেনা, বলা যায় বৃটিশ অর্থ-মন্ত্রকের (Treasury) মত প্রশাসন নিয়ন্ত্রণেও আগ্রহী। বারোজন সদস্যবিশিষ্ট (আগে নয়জন) এই উপদেষ্টা সমিতির সদস্যগণ 'বিশ্বের প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিত্বের প্রতি লক্ষ্য সাপেক্ষে এবং ব্যক্তিগত পারদর্শীতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে' তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। এঁরা

পুনর্নির্বাচিতও হতে পারেন। এই বারোজন সদস্যের মধ্যে অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শীতার জন্য প্রসিদ্ধ এমন দুজনকে (অন্ততঃ) রাখতেই হয়। এই সমিতির সদস্যপদে উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে; এম. আঘনাইড্‌স্‌ (M. Aghnides) শুরু থেকে (1946 খৃষ্টাব্দ) 1964 পর্য্যন্ত এই সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন শুধু তাই নয়, জাতিপুঞ্জের কর্মচারী-রূপে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাও তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। মহাসচিব পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়ের খসড়া এই উপদেষ্টা সমিতির নিকট পেশ করেন। সমিতি এই সমস্ত প্রস্তাব খুঁটিয়ে দেখে, প্রস্তাবিত ব্যয়ের সম্ভাব্য সংকোচন, পুনর্বিন্যাস অথবা সচিবালয়ের সম্ভাব্য সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস অথবা বিস্তারের জন্য সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এর পরে মহাসচিবের পেশ করা ব্যয়ের প্রস্তাবের খসড়া এবং সমিতি-কৃত প্রতিবেদন সাধারণ সভার পঞ্চম স্থায়ী সমিতির (প্রশাসনিক বিষয় ও বাজেটসংক্রান্ত) নিকট উপস্থাপিত করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উপদেষ্টা সমিতির মোটামুটি সমস্ত সদস্যই পঞ্চম স্থায়ী সমিতিরও সদস্য। বলা যেতে পারে যে, এই স্থায়ী সমিতিতে সচিবালয়ের কাজের এবং ব্যয়ের শুনানী হয়ে থাকে। মহাসচিব ও তাঁর অধস্তন কর্ম-চারীবৃন্দ সচিবালয়ের কাজ ও ব্যয়ের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন এবং পঞ্চম স্থায়ী সমিতি উপদেষ্টা সমিতির অধ্যক্ষের (তিনি অনেকটা বৃটিশ কমপ্‌ট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন) সহায়তায় যথাক্রমে সচিবালয় ও উপদেষ্টা সমিতিকৃত দাবী ও পাল্টাদাবীর যথার্থতা সম্পর্কে মন্তব্য করে থাকে। পঞ্চম স্থায়ী সমিতিতে বাজেট-সংক্রান্ত আলোচনা অনেকটা দড়ি টানাটানির রূপ নেয়। এটা সহজেই অনুমেয় যে পঞ্চম স্থায়ী সমিতিতে মোটামুটি দুই শ্রেণীর সদস্যের সমাবেশ হয়ে থাকে। দরিদ্র সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রসংঘের ব্যয় বাড়ানোর নীতির পক্ষপাতী এবং ধনী দেশগুলির (যাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রসংঘের আয়ের প্রধান অংশ এসে থাকে) প্রতিনিধিগণ ব্যয়সংকোচনের পক্ষপাতী। উপদেষ্টা সমিতির সদস্যমণ্ডলী সাধারণতঃ অমিতব্যয়িতার রাশ টেনে ধরেন; তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ অর্থমন্ত্রকের (Treasury) দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রভাবে অনেক সময়ই তাঁদের ধারণা হয় যে, অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ কম হলেই ব্যয় সঠিকভাবে হয়ে থাকে।

উপরি-উক্ত উপদেষ্টা সমিতির প্রতিরূপ অংশ হিসাবে আয়ের দিকে আছে 'অর্থপ্রদান সম্পর্কিত সমিতি' (Committee on Contributions)।

এই সমিতির গঠন, কার্য্যকাল প্রভৃতি উক্ত উপদেষ্টা সমিতির মতই। এই সমিতিও বারোজন সদস্যবিশিষ্ট। এই বারোজনের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে অর্থপ্রদানকারী সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়। এর কাজ বহুলাংশেই (সর্বতোভাবে না হলেও) প্রয়োগ-বিদ্যাসংক্রান্ত (technical)। এই সমিতির কাজ হলো রাষ্ট্রসংঘকে অর্থ-প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের প্রতি এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্যসংখ্যার বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রকর্তৃক দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা। এ ছাড়াও আরও দু-একটা বিষয় সম্পর্কে একে ভাবতে হয়। যেমন, খুব কম মাথাপিছু আয়বিশিষ্ট সদস্যরাষ্ট্র-সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা, অথবা সকলের চেয়ে বেশী দিলেও সামর্থ্যের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকর্তৃক দেয় অর্থের পরিমাণ কম করে ধরা (যাতে ঐ দেশ রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক বিষয়ে অবাঞ্ছিত প্রাধান্য বিস্তার না করতে পারে)। 'অর্থপ্রদান সম্পর্কিত সমিতি'কর্তৃক নির্ধারিত সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের দেয় অর্থের পরিমাণ প্রত্যেক তিন বৎসরের জন্য বহাল থাকে (যুদ্ধ অথবা অনুরূপ জরুরী কারণবশতঃ কোন সদস্যরাষ্ট্রের অর্থপ্রদানের ক্ষমতা গুরুতরভাবে ব্যাহত হলে আলাদা কথা)। সদস্যরাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ আর্থিক টানাটানির দিকে উক্ত সমিতির দৃষ্টি সাধারণতঃ অসঙ্কোচে আকর্ষণ করলেও ধার্য্য অর্থ প্রদান না করার ব্যাপারে তারা প্রায়শঃই কুণ্ঠাবোধ করে না।

বাজেট ও সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক দেয় অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে পঞ্চম স্থায়ী সমিতির সুপারিশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে খুব একটা পর্য্যালোচনা না করেই সাধারণ সভা গ্রহণ করে থাকে। তার কারণও আছে। পঞ্চম স্থায়ী সমিতি কখনও কখনও বৃহদাকার হলেও এর সদস্যপদে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয় এবং সদস্যগণ পেশাদারী মনোবৃত্তি নিয়ে একজোট হয়ে কাজ করে থাকেন বলে সর্বৈবভাবে রাজনীতিকবলিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের চেয়ে এই সমিতিই অর্থ ও প্রশাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের বিবেচনায় অধিকতর উপযোগী। তাছাড়াও, অধিবেশনের শেষের দিকে পঞ্চম স্থায়ী সমিতির সুপারিশ সভায় পোঁছয় বলে উক্ত সুপারিশ দিয়ে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজনীয় সময় সভার হাতে থাকে না।

রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অঙ্গের সদস্য নির্বাচনের কাজকে সাধারণ সভার দায়িত্বাবলীর পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই দেখেছি যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে (যেমন মহাসচিবের নির্বাচনে,

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের ক্ষেত্রে এবং নূতন সদস্য গ্রহণের প্রশ্নে) সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে নির্বাচনের ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে নূতন সদস্য গ্রহণের প্রশ্নে সাধারণ সভাকর্তৃক এককভাবে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করার (যেমন লীগ সভা করতো) আশা পোষণ করা 1950 খৃষ্টাব্দের পর থেকে অবান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ঐ বৎসরই আন্তর্জাতিক বিচারালয় অভিমত প্রকাশ করেছে যে, সদস্যভুক্তি প্রশ্নে পরিষদে ভেটো প্রয়োগের জন্য সভা হতাশাবোধ করলেও পরিষদের সুপারিশ ব্যতীত সভা এককভাবে কোন্ দেশকে রাষ্ট্রসংঘভুক্ত করতে পারবে না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনের ক্ষমতা এককভাবেই সাধারণ সভার উপর অর্পিত হয়েছে। এদিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যসমূহের (যা' নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে থাকে) নির্বাচন। প্রত্যেক বৎসরই পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদের অর্ধেক খালি হয় এবং কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হওয়া সদস্যরাষ্ট্রসমূহ পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। গোড়ার দিকে প্রত্যেক বৎসর খালি হওয়া তিনটি সদস্যপদ ভোট গ্রহণের পূর্বে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবেই পূরণ করা হতো। কিন্তু 1955 খৃষ্টাব্দের দরকষাকষি পরবর্তী বৎসরগুলির নজির হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন্‌স্‌কে প্রার্থীরূপে দাঁড় করিয়ে যুগোশ্লাভিয়ার (সোভিয়েৎ সমর্থিত) বিরুদ্ধতা করে এবং ফিলিপাইন্‌স্ ও যুগোশ্লাভিয়া পঁয়ত্রিশটি করে (প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের কম) ভোট পেলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। উক্ত অচলাবস্থা অবসানের জন্য বোঝাপড়া হয় যে, এক বৎসরের শেষে পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ থেকে যুগোশ্লাভিয়া পদত্যাগ করবে এবং ফিলিপাইন্‌স্ পরবর্তী বৎসরের জন্য অস্থায়ী সদস্য হবে। আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হয়েছে এবং উপরি-উক্ত ধরণের অচলাবস্থার উদ্ভব হচ্ছে। ফলে দুই বৎসরের কার্য্যকালকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার রীতিই উদ্ভূত অচলাবস্থা অবসানের একমাত্র কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হলেও 1965 খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্য্যন্ত (যখন অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে দশ করা হয়) কিছুই হয়নি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কোন সদস্যপদ সংরক্ষণ বা বন্টনের প্রশ্নে চার্টার আরোপিত কোন আনুষ্ঠানিক নিয়ম নেই। তবে বাস্তবে দেখা যায় যে, চীন ছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের অন্য চারটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র প্রতিবারই নির্বাচিত হয়েছে। (অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে সদস্যদের কার্য্যকাল তিনবৎসর এবং পুনর্নির্বাচনে কোন বাধা নেই)। অবশিষ্ট তেরোটি সদস্যপদ সমস্ত আগ্রহী দেশগুলির (বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলির) দাবী মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি বলে এই পরিষদ সম্প্রসারণের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং 1965 খৃষ্টাব্দে সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে সাতাশ করা হয়েছে। (1971 খৃষ্টাব্দে কৃত সংশোধনের বলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে চুয়ান্ন করা হয়)।

অছি পরিষদের সদস্যসংখ্যা গোড়ায় চৌদ্দটি ছিল এবং সাতটি সদস্যপদ অছিধারী নয় এমন সদস্যরাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত থাকতো। কিন্তু অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে অছিধারী রাষ্ট্রের সংখ্যাও হ্রাস পায়। ফলে অছি পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা কমে ছয় হয়েছে। এরমধ্যে অছিধারী সদস্য হলো দুটি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়া)। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহ পদাধিকারবলে অছি পরিষদের সদস্য। অতএব চীন, ফ্রান্স, বৃটেন ও সোভিয়েৎ ইউনিয়নও এই পরিষদে আছে।

উপরি-উক্ত অঙ্গসমূহে (এবং সাধারণ সভাকর্তৃক গঠিত প্রচুর অস্থায়ী কমিশনে) নির্বাচনের সময় মনে হয় যে জাতীয় সংসদের মত সাধারণ সভারও রাজনৈতিক দল আছে। সভায় বিদ্যমান বিভিন্ন গোষ্ঠীকে (bloc) রাজনৈতিক দলের সাথে তুলনা করা চলে। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, জাতিগত এবং আদর্শগত কারণে ঐক্যবদ্ধ একাধিক রাষ্ট্রকে গোষ্ঠী বলা যায়। রাষ্ট্রসংঘে গোষ্ঠীভিত্তিক ভোটদানের কথা কারও অবিদিত নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এও একটা বাস্তব দিক। (অনেক সময়ই আন্তর্জাতিক সংগঠনের ব্যর্থতার জন্য অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীকে দায়ী করা হয়ে থাকে)।

সাধারণ সভার প্রধান গোষ্ঠীগুলির আকৃতি নিয়ে দ্বিমত নেই বললেই চলে। উপরন্তু বলা যায় যে, সভার সাধারণ সমিতির বৈঠকে বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের জন্য আসন নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের 126টি* সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর গঠন নিম্নরূপ :

আরব দেশগুলি— চৌদ্দ।

আফ্রিকার দেশগুলি— (আফ্রিকার আরব দেশগুলিসহ এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে বাদ দিয়ে)— চল্লিশ।

এশিয়ার দেশগুলি— (এশিয়ার আরব রাষ্ট্রসমূহসহ এবং ইজরায়েলকে বাদ দিয়ে)— ছাব্বিশ।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলি—(কিউবাকে যদি ধরা হয়)— কুড়ি।

পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি—(যুগোশ্লাভিয়াকে বাদ দিয়ে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে আছে ইউরোপের চারটি নিরপেক্ষ দেশসম্বলিত একটি স্বতন্ত্র দল)— উনিশ।

সোভিয়েৎ গোষ্ঠী— (চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাদ দিয়ে)— দশ।

কমন্‌ওয়েল্‌থের দেশসমূহ—(দক্ষিণ আফ্রিকাকে বাদ দিয়ে, কিন্তু অন্যান্য গোষ্ঠীতে ধরা হয়েছে এমন কয়েকটি দেশসহ)— আটাশ।

ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার দিক থেকে উপরি-উক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির গোষ্ঠীর (যে গোষ্ঠীকে সবচেয়ে সংঘবদ্ধ মনে করা হয়) মধ্যেও ফাটল ধরে গেছে। রুমানিয়া ও আল্‌বেনিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আরব গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘবদ্ধতা বজায় রাখার জন্য সাংগঠনিক বন্দোবস্ত এবং আলোচনার ব্যবস্থা থাকলেও (এবং আপাতঃদৃষ্টিতে এই গোষ্ঠীকে আদর্শগতভাবে সুসংবদ্ধ মনে হলেও) আরবগোষ্ঠী একযোগে ভোটদানের যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয় (বাইরের চাপ প্রতিহত করার জন্য)। আফ্রিকা ও এশিয়ার অবশিষ্ট দেশগুলির সাথে আরবগোষ্ঠী একযোগে কাজ করতেও পারে, না-ও পারে। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি সীমিতসংখ্যক বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একযোগে কাজ করলেও এই দুই মহাদেশের কিছু কিছু রাষ্ট্রের মধ্যে অত্যন্ত তিক্ততা আছে। কমন্‌ওয়েল্‌থের দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তরে পারস্পরিক আলোচনার জন্য সাংগঠনিক বন্দোবস্ত না রাখলেও এই দেশগুলি নিয়মিত বৈঠকের

* এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদের সময় মোট সদস্যসংখ্যা 146 হয়েছে।

মাধ্যমে ভাব ও সংবাদের আদান-প্রদান করে থাকে। আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ কিছু কিছু বিষয়ে নিঃসন্দেহে এই সংস্থাকর্তৃক প্রভাবিত হয়ে থাকে; তবে একথাও ঠিক যে কমন্‌ওয়েল্‌থের আদি সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যেও অনেক সময়ই মতপার্থক্য হয়। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির অধিকাংশই তাদের সাধারণ সমস্যা (সাধারণ সভার অধিবেশন সংক্রান্ত) নিয়ে আলোচনা করে থাকে, তবে দল বেঁধে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে খুব একটা তৎপরতা দেখা যায়না। অবশ্য ইদানীং কালে উপনিবেশের প্রশ্নে এই দেশগুলির মধ্যে গুরুতর বিভেদ (পূর্বে যা' ছিলনা) পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের সংস্থার (OAS) মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হলেও এবং জোট বেঁধে ভোট দেওয়ার (আন্তর্জাতিক সংগঠনে) ঐতিহ্য থাকলেও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে নানা প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবাপন্ন বলে বিভিন্ন প্রশ্নে এই দেশগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা প্রায়ই সম্ভব হয়না।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্তমান গতি-প্রকৃতির প্রতিফলন হিসাবে উপরি-উক্ত গোষ্ঠীগুলির উৎপত্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সংগঠনের কাজের ভিত্তি হিসাবে এগুলি অপরিহার্য্য। এই গোষ্ঠীগুলি না থাকলে শতাধিক সদস্যবিশিষ্ট সাধারণ সভায় স্থিতিশীলতা থাকতো না, ভোটের ফলাফল সম্পর্কে কিছুই আঁচ করা যেতো না। গোষ্ঠীবিহীন সাধারণ সভাকে এমন একটি সংসদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যেখানে প্রত্যেক সদস্য প্রতিটি আলাদা প্রশ্নে ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী ভোটদান করার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন। এর ফল সহজেই অনুমেয়। বাস্তবপক্ষে এ ধরণের গোষ্ঠীর পরোক্ষ স্বীকৃতি চার্টারেই পাওয়া যায় (যখন চার্টারে 'বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকার ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের' এবং অনুরূপ ধরণের কথার উল্লেখ করা হয়েছে)। বলা যায় যে, রাষ্ট্রসংঘের কাজের ভিত্তি হিসাবে চার্টার প্রণেতাগণ এ ধরণের গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা তত্ত্বগতভাবেই ধরে নিয়েছিলেন। এবং সাধারণ সভার নির্বাচনসংক্রান্ত দায়িত্বের ক্ষেত্রেই চার্টার-স্বীকৃত এই সত্যের চূড়ান্ত প্রতিফলন হয়েছে। নির্বাচনের প্রশ্নেই বিভিন্ন গোষ্ঠীকে মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ এবং সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে দেখা যায়।

তবুও আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটি ধারণা আছে যা'

সর্বৈব দূরীভূত করা দুঃসাধ্য। সে ধারণাটি (রুশো যে ধারণার ধারক ছিলেন) হলো এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের উচিত নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে সাধারণ কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকটি আলাদা প্রশ্নে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়া। সাধারণ সভা (যার সদস্য-সমূহ সার্বভৌমরাষ্ট্র) স্পষ্টতঃই এধরণের আদর্শের সামিল হতে পারেনা। অথচ মজার কথা এই যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে আমরা অবাক হই। অথচ দেখা যায় যে ভোটদানের স্বাভাবিক (গোষ্ঠীভিত্তিক) পন্থা ছেড়ে বিকৃত পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে এবং সুফলের চেয়ে কুফলই হয় বেশী। বলা যায় যে, একবার আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নির্বাচনের সময় ভোট কেনা-বেচা হয়েছে। এর ফলে সম্ভাব্য বিচারপতিদের যোগ্যতার প্রশ্ন সর্বৈবভাবে অবজ্ঞা করা হয় এবং অন্ততঃ একজন প্রার্থীর নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। আরও দেখানো যেতে পারে যে, সাধারণ সভার পঞ্চম স্থায়ী সমিতি, উপদেষ্টা সমিতি ও মহাসচিবের বিরোধীতা সত্ত্বেও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, আরব জোটের সদস্য-সমূহ এবং অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রের মিলিত চাপের ফলে 1948 খৃষ্টাব্দে স্পেনীয় ভাষাকে সাধারণ সভার কাজের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের বাজেটের অত্যন্ত সাধারণ বিষয়েও (যেমন সচিবালয়ে কর্মচারী নিয়োগ বা কোন বিষয়ে ব্যয় বৃদ্ধি) দেখা যায় যে রাজনৈতিক বিবেচনাবশতঃ জোটবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী অথবা সদস্যরাষ্ট্র আস্বাভাবিক (হানিকর) পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

এসব অস্বীকার করার উপায় নেই। এবং এসবের জন্য যে নিন্দুকের সুবিধা হয় তাও স্বীকার করতে হয়। তবে এও ঠিক যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সাধারণ সভার কোন গোষ্ঠীই ভোটের গতি-প্রকৃতি এতটা বিকৃত করতে সমর্থ হয়নি যার ফলে সর্বৈব ভিন্ন ফলাফল হয়েছে। নির্বাচন, সচিবালয়ে কর্মচারী নিয়োগ, বাজেট—সমস্ত বিষয়েই বিনিময়ে কিছু পাওয়া গেলে যেকোন সদস্যরাষ্ট্র সম্মতিসূচক ভোট দিয়ে থাকে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রই স্বীয় জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভোটদান করে থাকে। অবশ্য বলা হচ্ছে না যে, এধরণের প্রশ্নে কোন বাধা-নিষেধই কাজ করেনা। তবে সেসমস্ত বাধা-নিষেধ চার্টার বহির্ভূত, অর্থাৎ, রাষ্ট্রসংঘের বা সাধারণ সভার কোন সমিতির সদস্যপদসম্ভূত নয়।

আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে সদস্যসংখ্যা চমকপ্রদভাবে বেড়ে যাওয়ায় এই দুই মহাদেশ থেকে আগত সদস্যরাষ্ট্রসমূহের ভোটেই দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্ভব। পক্ষান্তরে, গুটিকয়েক দেশ (যেখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার নামমাত্র অংশ বাস করে এবং যে দেশগুলি বিশ্বের ধনসম্পদের এক দশমাংশের অধিকারী) বিরাট সংখ্যক সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের দাবীদাওয়া ব্যর্থ করে দিতে পারে। এ ছাড়াও, অবিশ্বাস্য-রকমের ছোট কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্র আছে (যেমন রুরিটানিয়া, এলডোরাডো ইত্যাদি) যাদের ভোটাধিকার অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রের মতই, অথচ বাস্তব অর্থে যাদের ভোটাধিকারকে যথার্থ মনে করা যায়না। উপরি-উক্ত সমস্ত কারণের জন্যই প্রস্তাব উঠেছে যে বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের ভোটের বিভিন্ন রকম মূল্য ('weighted' voting) হওয়া উচিত। তবে নিশ্চিত-ভাবেই বলা চলে যে, এধরণের প্রস্তাব কোনদিনই গ্রাহ্য হবেনা। ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহ (রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্রই ক্ষুদ্র) মরিয়া হয়ে এরকম প্রস্তাবের বিরোধীতা করবে, কেননা ব্যক্তির মত রাষ্ট্রেরও অনুভূতি আছে (ডঃ জেসাপের মতে)। আবার, লোকসংখ্যার ভিত্তিতে ভোটের মূল্যায়ন করার প্রস্তাবও গ্রাহ্য হতে পারেনা। 'প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকবে'—এই নীতি একদিক থেকে অবাস্তব হলেও এই নীতিই সবচেয়ে রূঢ় বাস্তবের প্রতিফলন। কারণ সদস্যরাষ্ট্রসমূহ সার্বভৌম। বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের ভোটের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য হলে সদস্য-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে। এধরণের কোন পন্থা বিশ্বসরকার প্রতিষ্ঠার পথে সহায়ক হলেও চার্টারপ্রণেতাগণ রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন। অর্থাৎ, সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্বগত সাম্যের নীতিকেই রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তি করা হয়েছে।

সাধারণ সভায় ভোটদানের ব্যাপারকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই অনেকে গোষ্ঠীভিত্তিক ভোটদান সম্পর্কে অতিরিক্ত শঙ্কা প্রকাশ করে থাকেন। অবশ্য সাধারণ সভায় সমবেত প্রতিনিধিদলসমূহের উপর সম্ভাব্য ভোট-সংখ্যার সম্মোহনী প্রভাবে ক্ষতিই হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণের নীতির (জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে যা' ছিল) পরিবর্তে সংখ্যা-গরিষ্ঠতার নীতি অবলম্বন করার ফলে প্রতিনিধিদলসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রকৃতির পরিবর্তে আকৃতির দিকে এবং মতৈক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রচেষ্টার পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করে থাকে। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে, সাধারণ সভাকর্তৃক

গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সুপারিশ ছাড়া কিছুই নয়। অতএব প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কৃত্রিম অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবাদে মোটামুটি সমস্ত ধরণের মতের সমন্বয় হওয়াও অপরিহার্য্য। অবশ্য একথাও ঠিক যে, কৃত্রিম উপায়ে অর্জিত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ফলে কখনও কখনও স্বল্পকাল স্থায়ী সুবিধা হতে পারে। যেমন কোন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে, সচিবালয়ের সাংগঠনিক প্রশ্নসংক্রান্ত বিভেদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে অর্জিত দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের বলে গৃহীত প্রস্তাবের কথা বলা যেতে পারে (এধরণের প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য পরে আর সাধারণ সভার দ্বারস্থ হতে হয়না বলে)। কোন প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত গুণের ভিত্তিতে যদি প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায় না করা হয়, তবে পরবর্তীকালে ঐ ধরণের প্রস্তাব তিক্ততার উদ্রেক করে থাকে এবং তা' অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়া বিচিত্র নয়। যাই হোক্, এ সমস্তই হচ্ছে ছোটখাট ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত বিষয়ে (যেমন, হাঙ্গেরী, সুয়েজ অথবা কোরিয়া প্রশ্নে) সংশ্লিষ্ট ভোটসংখ্যার চেয়ে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের অন্তর্নিহিত বিশ্বজনমতসম্ভূত শক্তিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। মিঃ হ্যামারস্কশোল্ডও একবার তাঁর নিয়োগকর্তাদের (সদস্যরাষ্ট্রসমূহ) বলেছিলেন যে, সার্বভৌম সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত বলে, বিভিন্ন সরকারের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা এবং চার্টার-বর্ণিত উদ্দেশ্যপূরণের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার সমন্বয়সাধন করা রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য বলে সাধারণ সভায় ভোট অর্জনের চেয়ে যথার্থ সম্মতির ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য নিষ্পত্তির পথ অধিকতর বিধেয়।

সাধারণ সভাকে আপাতঃদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী বস্তুর সমষ্টি বললে অত্যুক্তি হয়না। যে কোন আইনসভার মত সাধারণ সভাও বিতর্ক এবং বিতর্ক শেষে ভোটের মাধ্যমেই অগ্রসর হয়। অথচ এও ভুললে চলবে না যে, কোন সমস্যা সমাধানে বিতর্ক ও ভোটের প্রকৃত মূল্য সামান্য। বিতর্ক ও ভোটের মাধ্যমে কোন সমস্যার প্রচার হতে পারে, কিন্তু সমাধানের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন আলোচনা ও পরামর্শ (আনুষ্ঠানিক নয়) সর্বদাই অপরিহার্য্য। সাধারণ সভার কাঠামো আইনভিত্তিক হলেও এর কার্য্য নির্বাহ হয় রাজনীতির পথে। সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন রকমের

সংস্থার অভিজ্ঞতা সাধারণ সভার গঠন ও কার্য্যবিধির মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়েছে। তবে সাধারণ সভা পুরোপুরি অন্য কোন সংস্থার মত নয়। আপন বৈশিষ্ট্যে সাধারণ সভা অনন্য।

এজন্যই সাধারণ সভায় স্বতন্ত্র ধরণের গুণ ও দৃষ্টিভঙ্গী আবশ্যক। বিতর্ক সভা হিসাবে এখানে বাগ্মী ও পারদর্শী সংসদ-সদস্যের মত ব্যক্তির প্রয়োজন হলেও বিশ্বের কোন সংসদের (সাধারণ সভার পরিবেশ নিবিড় ও অন্তরঙ্গ নয়; বিভিন্ন জাতীয় সংসদের মতো সাধারণ সভায় এখনো ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি) সাথেই এর তুলনা চলেনা। সমাবেশের দিক থেকে সাধারণ সভা অতি বিশাল এবং সাধারণ সভার শ্রোতৃবর্গ দুই শ্রেণীর—যাঁরা সভাকক্ষে উপস্থিত এবং যাঁরা সশরীরে সভাকক্ষে উপস্থিত নন (বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ)। সাধারণ সভায় যদিও ন্যূনতম ভঙ্গীও পবিলক্ষিত হয়ে থাকে, তবুও সাধারণ সভা প্রচারবিমুখতার পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। এখানে প্রত্যেক প্রতিনিধিকেই দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। একটা হলো জাতীয় ভূমিকা (যার জন্য তিনি তাঁর স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন) এবং অপরটি হলো আন্তর্জাতিক ভূমিকা (যা' ছাড়া তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হলেও ভুল বোঝাবুঝি বা ক্ষোভের শিকার হতে পারে)। সাধারণ সভায় যা' হয়, বিতর্ক তার একটা অংশমাত্র। আরও গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ হলো নিরবিচ্ছিন্ন এবং বহুপাক্ষিক (multilateral) আলোচনা (আনুষ্ঠানিক নয়)। সভার কাজের এই অংশকে অনেকে 'বহুপাক্ষিক কূটনীতি' (multilateral diplomacy) বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ-ধরণের আলোচনা (যা' চিরাচরিত অর্থে কূটনীতিবিদ্‌দের কাজ) সাধারণ সভার প্রত্যেক অধিবেশনেই (পরিবেশ অবশ্যই চিরাচরিত নয়) হয়ে থাকে। একথা খানিকটা সত্য যে সাধারণ সভাকে বাৎসরিক ও দীর্ঘ অধিবেশনে আহূত বিশ্ব-সম্মেলন বলা চলে। তবে তার চেয়ে বড় সত্য এই যে, সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে যা' হয় তার চেয়ে গোপন বৈঠকের আলোচনা ও দরকষাকষি কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সাধারণ সভার কার্য্যকলাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গোপন আলোচনা, আইনসভার মত বিতর্ক এবং কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রতিনিধিদলকর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বনের প্রক্রিয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে ডঃ জেসাপ্ 'সংসদীয় কূটনীতি' ('Parliamentary diplomacy) কথাটির উদ্ভাবন করেছেন। আন্তর্জাতিক সমাজের হয়ে আইন প্রণয়নের

কাজ, অথবা কোন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ, অথবা কোন পরিস্থিতি বা বিবাদের (যাতে অনেক সদস্যরাষ্ট্র আগ্রহী) ক্ষেত্রে মীমাংসার পথ নির্ধারণ—সাধারণ সভা যাই করুক না কেন, সভার ভূমিকা মূলতঃ রাজনৈতিক। সভার মুখ্য কাজ হচ্ছে যতদূর সম্ভব মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধন করা। ফলে চিরাচরিত কূটনীতিতে যেগুলি অপরিহার্য্য সেগুলি ছাড়াও সমস্তরকমের কলাকৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। প্রচার ও গোপনীয়তা, মিত্রসুলভ মনোভাব ও অপরের দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি, রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসমূহে আস্থা ও স্বকীয় জাতীয় স্বার্থের প্রতি আনুগত্য—সবকিছুই অপরিহার্য্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়

একই অধ্যায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় নিয়ে আলোচনা বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পারে। স্বকীয় গুরুত্ব ও কাজের পরিধির দিক থেকে দেখতে গেলে এগুলির প্রত্যেকটিকে নিয়ে পৃথক পৃথক পুস্তক রচনা সম্ভব। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলির প্রত্যেকটির বিশেষ একটি দিকের প্রতি, অর্থাৎ, এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি আলোকপাত করা। রাষ্ট্রসংঘের বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসাবে উপরিউক্ত সংস্থাগুলির তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য। এবং তার জন্য এগুলির মূল্য অথবা সাফল্যসম্পর্কে মন্তব্যের চেয়ে মূল সংগঠনের সঙ্গে এগুলির সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়াই অধিকতর বিধেয় মনে করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যপদ্ধতির কথা ভাবতে গেলে মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের বৃটিশ সংসদ সম্পর্কে বেজহটের উক্তির কথা মনে হয়। তিনি বলেছিলেন: "আমাদের আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি নিন্দার্হ এবং সেই পদ্ধতি স্থিরীকরণের ব্যবস্থাপনা জঘন্য"। রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্য্যাবলী সম্পর্কে চার্টারে প্রচণ্ড বাগাড়ম্বর, পুনরাবৃত্তি এবং পরিব্যাপ্তি লক্ষিত হয়। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, 1945 খৃষ্টাব্দে অনেক সদস্যরাষ্ট্রই রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদির প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি বলে এসমস্ত বিষয়ে চার্টারের গ্রন্থনা যথেষ্ট নিষ্ঠা সহকারে করা (একান্তই রাজনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে যা' করা হয়েছে) হয়নি। ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা গোড়া থেকেই অস্পষ্ট থেকে গেছে। রাষ্ট্রসংঘের জন্মের সময়েই কিছু বিশেষজ্ঞ সংস্থা ছিল বলে ঐগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক

পরিষদকে। তাছাড়াও, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চার্টার বর্ণিত অবশিষ্ট সমস্ত কার্য্যাবলীসহ অন্য কিছু কিছু বিষয়ও (যেগুলিকে রাজনৈতিক বিষয় বলে গণ্য করা উচিত, যেমন, 'মানবিক অধিকারের উন্নয়ন') এই পরিষদের দায়িত্বভুক্ত করা হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের যন্ত্র ও নিজেই সমন্বয়সাধনের বিষয়বস্তু (ডঃ লাভ্ডের বক্তব্য অনুসারে) হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে একদিকে নিজেই বিশেষজ্ঞ সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় এবং অন্য দিকে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সংস্থার খবরদারি করার দায়িত্বযুক্ত হওয়ায় এই পরিষদের সাথে সাধারণ সভার সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণ সন্তোষজনক হয়নি। যদিও চার্টারে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ "সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে" কাজ করবে (60 নম্বর ধারা), তবুও কোন সীমিত এবং সাধারণ সভার অধীনস্থ ক্ষেত্রে একে স্বাধীনতাও দেওয়া হয়নি, আবার সভার নির্দেশানুসারে সুনির্দিষ্ট কার্য্য সমাধার দায়িত্বও দেওয়া হয়নি। এর ফলে সাধারণ সভার দ্বিতীয় স্থায়ী সমিতি (অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত) এবং তৃতীয় স্থায়ী সমিতি (সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত) সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে সাধারণ নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন না করে (যার জন্য এগুলি গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে) হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নয় এর সমরূপ (duplicate) সংস্থা হিসাবে কাজ করছে।

বলা যেতে পারে যে, 1946 খৃষ্টাব্দেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় যখন পরিষদের কার্য্যনির্বাহক কমিশনগুলি বেসরকারী বিশেষজ্ঞের পরিবর্তে (জাতিপুঞ্জের প্রযুক্তি সংক্রান্ত সমিতিগুলির ক্ষেত্রে যেমন ছিল) সরকারী প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠন করার (চার্টার এ ব্যাপারে অবশ্য নীরব) সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তি দেখানো হয় যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়সমূহের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে ঐ সমস্ত বিষয়ে উপদেষ্টা, পরিকল্পনাকারী এবং পর্য্যবেক্ষকের ভূমিকায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ব্যক্তিদের পরিবর্তে সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধিই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের স্থায়ীসমিতিগুলিকে পরিষদের অনেক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে এবং পরিষদের পূর্ণাঙ্গ

অধিবেশনের পূর্বে এই সমিতিগুলি বৈঠকে মিলিত হয়। আন্তঃসরকারী সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনার্থে 'আলোচনা সমিতি' (Committee on Negotiations) পরিষদের সভাপতি এবং এগারোজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। আরম্ভের বৎসরগুলিতে এই সমিতির কর্মতৎপরতা খুব বেশী থাকলেও বর্তমানে কালেভদ্রে একে কর্মব্যস্ত দেখা যায়। চার্টারের 57, 58 এবং 63 নম্বর ধারায় বর্ণিত কাজের দায়িত্ব এই সমিতিকে দেওয়া হয়েছে এবং এই কাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় 'শর্তাবলী নির্ধারণ' সাপেক্ষে.... 'চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্রসংঘের সাথে সম্পর্কযুক্ত করার' কথা বলা হয়েছে। 63 ও 64 নম্বর ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে মোটামুটি অসতর্ক ভাষার মাধ্যমেই অর্পণ করা হয়েছে। 63 নম্বর ধারা অনুসারে "অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ....আলোচনা ও সুপারিশের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির কাজের সমন্বয়সাধন করতে পারবে।" 64 নম্বর ধারার বক্তব্য হলো : "বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির নিকট থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন আদায় করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করতে পারবে।" বস্তুতঃ চার্টারের এধরণের ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার (যার অনেকগুলিই রাষ্ট্রসংঘের জন্মের আগের থেকেই ছিল) স্বাধীনতার প্রতি সমীহ প্রকাশ করা হয়েছে। এগুলির প্রত্যেকটিরই স্বকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অঙ্গ, বাজেট এবং সচিবালয় আছে। এই সমীহবশতঃই ঐ সমস্ত সংস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের শর্তাবলী চার্টারেই সুনির্দিষ্ট না করে পরবর্তীকালে আলোচনাসম্ভূত চক্তির মাধ্যমে স্থির করার ব্যবস্থা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে চার্টারের ঢিলেঢালা ভাষায় উৎসাহিত হয়ে এবং প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ও বিভিন্ন সমিতি ও কমিশন গঠনের মাধ্যমে অনেক কিছু সম্ভব এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্তরকম উদ্দেশ্যপূরণের প্রচেষ্টা গোড়া থেকেই চালিয়ে যায়। 1952 খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নিকট প্রতিবেদন পেশ করতো এমন চৌদ্দটি অধীনস্থ কমিশন ও কার্য্যকরী সংস্থা, এগারোটি কার্য্যনির্বাহক কমিশন ও অধস্তন কমিশন, তিনটি আঞ্চলিক কমিশন, এগারোটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং বিবিধরকমের আরও আটটি

সংস্থার জন্ম হয়েছে। এরপরে উপরিউক্ত সংস্থাগুলির কিছু কিছু ছেঁটে ফেলা হলেও কিছু কিছুর সম্প্রসারণও হয়েছে। ফলে পুরো কাঠামোটি আগের মতই জটিল রয়ে গেছে। এজন্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজের যথাযথ ও প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য। তবুও সাংগঠনিক ও কার্য্যপদ্ধতির দিক থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের রূপরেখা মোটামুটি নিম্নরূপ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাতাশটি* সদস্যরাষ্ট্র তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। এর অধিবেশন বৎসরে দুবার হয়ঃ প্রথমে মে ও জুন মাসে নিউইয়র্কে এবং দ্বিতীয় অধিবেশন জুলাই মাসে জেনেভায় শুরু করে মুলতুবী রাখা হয় এবং মুলতুবী অধিবেশন অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভার মত এই পরিষদেও প্রত্যেক বৎসর একজন সভাপতি (কোন বৃহৎশক্তির প্রতিনিধি নন) নির্বাচিত হন। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই (সাধারণ সভার মত দুই-তৃতীয়াংশ নয়) এখানে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত করার কথা বলা হয়েছে।

'আলোচনা সমিতি' প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ সম্পর্কিত চুক্তি করলেও অনুমোদনের জন্য সেগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও সাধারণ সভার নিকট পেশ করা হয়। খুঁটিনাটির দিক থেকে এই সমস্ত চুক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সেগুলির প্রকৃতি মোটামুটিভাবে একই ধরণের। বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির প্রতিনিধিবর্গ-কর্তৃক পরিষদের বৈঠকে ও পরিষদের প্রতিনিধিগণকর্তৃক বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির বৈঠকে অংশগ্রহণ করার (ভোটদানের অধিকার ব্যতীত) ব্যবস্থাসহ দলিলপত্র ও তথ্যাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদ ও অছি পরিষদের সাথে সহযোগিতা করে থাকে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নিকট স্বীয় কার্য্যকলাপের প্রতিবেদন পেশ করে থাকে (বিশ্বব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক অর্থকোষের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়) এবং পরীক্ষা ও সুপারিশের জন্য প্রশাসনিক বাজেট সাধারণ সভার নিকট পেশ করে থাকে। একথা মনে হতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয়-সাধনই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু আমরা

---

* সাধারণ সভার এক প্রস্তাব বলে (1971 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের 20 তারিখে গৃহীত) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা 54 করা হয়। 1973 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের 24 তারিখ থেকে এই প্রস্তাব বলবৎ হয়েছে।

আগেই দেখেছি যে, এ ধরণের সমন্বয়সাধনের সুযোগ শুধু সীমিতই নয়, এক্ষেত্রে বেশীরভাগ দায়িত্বই হয় সাধারণ সভাকে নয়তো সচিবালয়কে (অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে নয়) দেওয়া হয়েছে। অতএব দেখা যায় যে, বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির প্রশাসনিক বাজেট সাধারণ সভাকর্তৃক গঠিত "প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত প্রশ্নে উপদেষ্টা সমিতি" (Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions) পরীক্ষা করে এবং এ সম্পর্কে এই উপদেষ্টা সমিতির মন্তব্য ও সুপারিশ সভার (এই সমিতি শুধু সুপারিশই করতে পারে) পঞ্চম স্থায়ী সমিতির (প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত) নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির দৈনন্দিন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের (ব্যাপক নীতির নয়) মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব (বস্তুতঃ এগুলির উপরই ব্যাপক নীতির নব্বই শতাংশ নির্ভর করে) একদল আন্তর্জাতিক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত। এটাই হলো 'প্রশাসনিক সমন্বয় সমিতি' (Administrative Committee on Co-ordination)। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব এই সমিতির অধ্যক্ষ এবং এর অন্যান্য সদস্য হলেন বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের সচিবগণ। এই সমিতি অনেকটা আন্তর্জাতিক মন্ত্রীসভার মত। তবে পার্থক্য হলো এই যে, এই মন্ত্রীসভার প্রত্যেক মন্ত্রী আলাদা আলাদা সংসদের নিকট দায়ী। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশক্রমে 1946 খৃষ্টাব্দে এই সমিতি গঠিত হয়। উক্ত পরিষদ ঠিকই বুঝেছিল যে, গোটা বারো স্বাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থার দৈনন্দিন কাজের সমন্বয়সাধন করা কর্মব্যস্ত পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য একথাও ঠিক যে 'প্রশাসনিক সমন্বয় সমিতি' জোর করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, যুক্তিসাপেক্ষে কেবল বোঝানোর চেষ্টাই করতে পারে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নিকট ও বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির নিকট প্রেরণকল্পে এই সমিতির সুপারিশাদি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হতে হবে। এর ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছুই বলা হয়নি। বিশেষ করে সাহায্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ের সমন্বয়সাধনের দায়িত্বযুক্ত 'আন্তঃসংস্থা আলোচনা পর্ষদের' (Inter-Agency Consultation Board)* সঙ্গে এই সমিতির ক্ষমতার পৃথকীকরণ খুবই অস্পষ্ট।

পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে

---

* সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দুটি সমিতির উল্লেখ করতে হয়। প্রথমটি হলো পরিষদের অধিবেশন সংক্রান্ত অথবা পরিষদকর্তৃক ব্যবস্থা করা বৈঠকাদির সময় ও কর্মসূচী নির্ধারণের দায়িত্বযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন সমিতি (Interim Committee on Programme of Conferences)। এই সমিতির সদস্য-সংখ্যা চার। দ্বিতীয়টি হলো পরিষদের সঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারী আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংগঠনসমূহের (71 নম্বর ধারায় উল্লিখিত) সংযোগরক্ষার্থে 'বেসরকারী সংস্থা সংক্রান্ত সমিতি' (Committee on Non-Governmental Organizations)। এই সমিতির সদস্য সংখ্যা তেরো।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে উপরিউক্ত স্থায়ী সমিতিগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত। পরিষদের মূল কর্তব্য সমাধা হয় কতকগুলি কার্য্যনির্বাহক কমিশনের মাধ্যমে। বর্তমানে ছটি কার্য্যনির্বাহক কমিশন ও একটি অধস্তন কমিশন আছে। সেগুলি হলো :

চব্বিশজন সদস্যবিশিষ্ট 'পরিসংখ্যান কমিশন' (Statistical Commission);

সাতাশজন সদস্যবিশিষ্ট 'জনসংখ্যা কমিশন' (Population Commission;

বত্রিশজন সদস্যবিশিষ্ট 'সামাজিক উন্নয়ন কমিশন' (Commission for Social Development);

বত্রিশজন সদস্যবিশিষ্ট 'মানবিক অধিকার কমিশন' (Commission on Human Rights); এবং

ছাব্বিশজন সদস্যবিশিষ্ট 'পক্ষপাতমূলক ব্যবহার নিবারণ ও সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়সমূহের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধস্তন কমিশন' (Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities);

বত্রিশজন সদস্যবিশিষ্ট 'মহিলাদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশন' (Commission on Status of Women);

চব্বিশজন সদস্যবিশিষ্ট 'মাদক ঔষধাদি সংক্রান্ত কমিশন' (Commission for Narcotic Drugs)।

'মানবিক অধিকার কমিশনে' এবং 'মহিলাদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশনে' সদস্যদের কার্য্যকাল তিন বৎসর। অন্যান্যগুলিতে সদস্যদের কার্য্যকাল চার বৎসর।

উপরিউক্ত কমিশনগুলির (অধস্তন কমিশনটিসহ) সদস্যপদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোন কথা নেই (বাস্তবে তা' থাকেও না)। তবে বিশেষজ্ঞ না হলেও প্রত্যেক সদস্যকেই তাঁর নিজের দেশের সরকারী প্রতিনিধি হতে হবে। একবার তাকালেই বোঝা যাবে যে, এই কমিশনগুলির মধ্যে প্রচুর প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে।

এগুলির কিছু কিছু পেশা বা প্রযুক্তি এবং তথ্য সংক্রান্ত (যেমন, পরিসংখ্যান কমিশন)। কতকগুলির বিষয়বস্তু সর্বৈবই দ্বন্দ্বমুক্ত (যেমন, মাদক ঔষধাদি সংক্রান্ত কমিশন)। অবশিষ্ট কিছু কমিশনের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তীর্ণ (যেমন, সামাজিক উন্নয়ন কমিশন) এবং কোনটির কর্মসূচী প্রায় সর্বতোভাবেই রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত (যেমন মানবিক অধিকার কমিশন)।

কেবল পরামর্শ দান করার ক্ষমতাসম্বলিত এই সমস্ত কমিশন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নিকট বহুবিধ রকমের সুপারিশ পেশ করেছে। কোনটি খুব বাস্তবধর্মী হয়েছে (যেমন 1958 খৃষ্টাব্দে মাদক ঔষধাদি সংক্রান্ত কমিশনকৃত সুপারিশ)। আবার কোনটির প্রকৃতি এমন যে তা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া পরিষদের পক্ষে মোটে সম্ভব হয়নি (মহিলাদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের প্রতিবেদন)।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে কার্য্যনির্বাহক কমিশনগুলির চেয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকর্তৃক গঠিত আঞ্চলিক কমিশনগুলিই অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখের অবকাশ রাখে 1947 খৃষ্টাব্দে গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ একত্রিশ সদস্যবিশিষ্ট 'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন' (Economic Commission for Europe)। জেনেভায় সাধারণতঃ বৎসরে একবার এই কমিশনের বৈঠক হয়। তবে এর পূর্ণাঙ্গ বৈঠক ছাড়াও কৃষি, কয়লা, বিদ্যুৎ, গৃহসংস্থান, শিল্প, পরিবহন, ইস্পাত, কাঠ এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে এই কমিশনের বিভিন্ন সমিতি কাজ করে থাকে। ডঃ গুনার মিরড্যালের (Dr. Gunner Myrdal) নেতৃত্বে জেনেভায় এই কমিশনের একটি স্থায়ী সচিবালয় আছে এবং এই সচিবালয় কমিশনের বৈঠকাদির ব্যবস্থা করা ছাড়াও গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। এই কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও রাষ্ট্রসংঘের এক্তিয়ার বহির্ভূত দুটি সংগঠনের কারণে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন অনেকাংশেই ম্লান হয়ে গেছে। তার একটি হলো 'ইউরোপে

অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য সংগঠন' (Organization for European Economic Cooperation) এবং অপরটি হলো এর উত্তরসূরী—অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংগঠন' (Organization for Economic Cooperation and Development)।

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশনের আদর্শে আরও তিনটি সংগঠন হয়েছে। 'এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক কমিশন' (Economic Commission for Asia and Far-East) 1974 খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। সাতাশ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনে তিনটি উপসদস্যও আছে। সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ ছাড়াও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স্ (এই এলাকায় যে সমস্ত দেশের স্বার্থ স্বীকৃত) এই কমিশনের সদস্য। এই কমিশনের সদর-দপ্তর ব্যাঙ্ককে হলেও এর বাৎসরিক অধিবেশন এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে হয়েছে। 1948 খৃষ্টাব্দে 'লাতিন আমেরিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশন' (Economic Commission for Latin America) গঠিত হয়। ঊনত্রিশ সদস্য এবং দুই উপসদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনের সদর-দপ্তর স্যাণ্টিয়াগোতে স্থাপিত হলেও এর বাৎসরিক অধিবেশন (এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক কমিশনের মতই) পালা করে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে হয়ে থাকে। সর্বশেষে, 'আফ্রিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশনের' (Economic Commission for Africa) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 1958 খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট এই কমিশন তদানীন্তন কালে আফ্রিকার নয়টি স্বাধীন দেশ (রাষ্ট্রসংঘের সদস্য), আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে অছিধারী ছয়টি রাষ্ট্র এবং বেশ কিছু স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলকে উপসদস্য হিসাবে নিয়ে গঠিত হয়। এর সদস্যসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। উপসদস্যগুলিকে বাদ দিয়েই এর সদস্যসংখ্যা এখন বিয়াল্লিশ* ছাড়িয়ে গেছে। এই কমিশনের সদর-দপ্তর আদ্দিস্আবাবায়। আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত বলে এই কমিশনগুলিতে ঐক্য ও সুসঙ্গতি আছে (যা' অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে নেই বললেই চলে)। উপরিউক্ত কমিশন তিনটি যেসমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলি বাস্তব (প্রচারের মাধ্যমে সৃষ্ট নয়) এবং এই কমিশনগুলি সর্বতোভাবে স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতেই সুপারিশ করে থাকে। নিজেদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নিকট

---

* 1971 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হিসাব দেওয়া হয়েছে। এরপর আরও বেড়েছে।

প্রতিবেদন পেশ করলেও এই তিনটি কমিশনই সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে। এই পদ্ধতি স্বাভাবিক এবং যথাযথ মনে হলেও সর্বৈব সমস্যামুক্ত নয় এবং উদ্ভূত সমস্যা-সমাধানেও সক্ষম হয়নি। এই পদ্ধতির ফলে সমন্বয়সাধনের অসুবিধা দেখা দেয়। তাছাড়াও, এই কমিশনগুলি স্থানীয় সমস্যার অতিরঞ্জনে প্রয়াসী হয় এবং স্থানীয় প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য (যেমন, কারিগরী সাহায্যের ক্ষেত্রে) চাপসৃষ্টিকারী সংস্থার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আরও কিছু সাংগঠনিক সৃষ্টি আছে যেগুলিকে পূর্ববর্তীগুলির মত সহজেই শ্রেণীভুক্ত করা যায়না। এধরণের সংগঠনের মধ্যে অস্থায়ী সমিতি থেকে শুরু করে কিছুটা পরিমাণে পরিষদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত তথাকথিত বিশেষ সংস্থা (Special bodies) পর্য্যন্ত আছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মানবকল্যাণধর্মী 'শিশু তহবিল' (United Nations Children's Emergency Fund)। একজন প্রশাসনিক অধিকারকের (Executive Director) নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত এই সংগঠন বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থদ্বারা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী শিশুকল্যাণজনিত প্রশংসমান কার্য্যসম্পাদনে ব্রতী। উপরি-উক্ত পর্য্যায়ভুক্ত ভিন্ন ধরণের একটি সংস্থা হলো এগারো সদস্যবিশিষ্ট 'আন্তর্জাতিক মাদক ঔষধাদি নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ' (International Narcotics Control Board)। এই পর্ষৎ 1964 খৃষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জের আমলের 'মাদকদ্রব্যাদি সংক্রান্ত স্থায়ী কেন্দ্রীয় পর্ষৎ' (Permanent Central Narcotics Board) এবং 'ঔষধাদি পর্য্যবেক্ষণ সংস্থার' (Drug Supervisory Board) স্থলাভিষিক্ত হয়।

এত বিচিত্রধরণের সমস্ত সংস্থাকৃত বহুবিধ কাজের ছকে-বাঁধা বিবরণ ঠিক না হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজে কিছু কিছু গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায় এবং তৎসম্পর্কে মোটামুটি ধরণের কিছু মন্তব্যও সম্ভব। পূর্বেই দেখা গেছে যে, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের ভূমিকায় এই পরিষদ বিফল হয়েছে। তবে এ বিষয়ে একটা কথা বলা দরকার। কিছু কিছু সদস্যরাষ্ট্র স্বদেশে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অধিক্রমণ (overlap) মেনে নিলেও রাষ্ট্রসংঘের অনুরূপ ধরণের ত্রুটির অতিরঞ্জনে প্রয়াসী হয়। এসব রাষ্ট্রের ধারণা এই যে, রাষ্ট্রসংঘে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয়সাধন

হলে অপ্রয়োজনীয় সংস্থাগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হবে এবং ফলে (খরচ কমে যাবে বলে) রাষ্ট্রসংঘকে কম টাকা দিতে হবে।

পর্য্যবেক্ষণের কাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রচুর সময় ব্যয় হয়। রাষ্ট্রসংঘের কাজের এবং সচিবালয়ের সময়ের অনেকটাই কারিগরী সাহায্য, মাদক ঔষধাদি নিয়ন্ত্রণ, বা মানবিক অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতিতে নিয়োজিত হয়, অথচ এগুলির পর্যবেক্ষণ বা উন্নয়ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকেই করতে হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, এসমস্ত কাজে সাফল্য অনেকাংশেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। অতএব দেখা যায় যে, সামাজিক বিষয়ের চেয়ে অর্থনৈতিক বিষয়ে, বিশ্বব্যাপী কর্মসূচীর চেয়ে আঞ্চলিক পর্য্যায়ে এবং (স্বাভাবিকভাবেই) সীমিত অর্থ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বণ্টনের চেয়ে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কাজ ভালো হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজে অনেক সময়ই তথ্যসংগ্রহ এবং সেগুলির বিন্যাস ছাড়া কিছুই দেখা যায়না। এর বাস্তবমূল্য অবশ্য কম নয়। যখন অচলাবস্থার জন্য (বিশেষ করে রাজনৈতিক কারণে) সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব হয়না, কোন সমিতিতে কর্মসূচী সম্পর্কে ঐক্য অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নিকট অন্ততঃ গবেষণা সংক্রান্ত কোন কিছু, কোন জরীপ সম্পর্কে প্রতিবেদন অথবা অনুরূপ কিছু পাঠানো যেতে পারে। যখন সোজাসুজি উপায়ে অচলাবস্থার অবসান অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর অবস্থা রাতারাতি পরিবর্তিত হবে, এমন মনে করার কারণ নেই। কিন্তু এসমস্ত ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যসংগ্রহের মূল্য (আন্তর্জাতিক ও জাতীয়, উভয় পর্য্যায়েই) অস্বীকার করা যায়না।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহকে বিতর্কের মাধ্যমেই অগ্রসর হতে হয়। তবে এই সমস্ত বিতর্কের হুবহু বিবরণী পড়া অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। সেগুলি বড় একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর। আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে আদান-প্রদানে সাধারণতঃ বড় বেশী দরকষাকষি হয়ে থাকে। তবে দেখা যায় যে, কোন সংস্থা বা কার্য্যনির্বাহক কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আলোচনার নামে প্রত্যেক সদস্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বদেশের সরকারী মন্তব্যের উপস্থাপনা ছাড়া কিছুই করেননা।

এসমস্ত ক্ষেত্রে চার্টারের বিধানাদি অথবা আন্তর্জাতিক জীবনের বিভিন্ন তথ্যের কথা কারও খেয়ালে থাকেনা, এবং কোন সদস্যরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ সম্পর্কে চার্টারের নিষেধ প্রায় সব সময়ই অবজ্ঞা করা হয়ে থাকে। কোন প্রস্তাবের বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা সেদিকে লক্ষ্য না রেখে প্রায়ই কথার ফুলঝুরি ছোটানো হয়। এসবের কারণেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে অধিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কও অনেক সময় নিন্দিত হয়েছে। বিশেষ করে মানবিক অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সান্‌ফ্রান্সিস্কোর দিনগুলিতে সব দেশই আদর্শগতভাবে মানবিক অধিকারের ধ্বজা উড্ডীয়মান রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে দেখতে গেলে কোন দেশই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, সোভিয়েৎ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, বৃটেনসহ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি সকলের কথাই বলা চলে) গ্লানিমুক্ত নয়। একদিকে আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যরাষ্ট্রসমূহ মানবিক অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বদ্ধপরিকর এবং অন্যদিকে এই সংকল্প-রক্ষায় তারাই আইনভঙ্গকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। বস্তুতঃ মানবিক অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের কর্তব্যনির্ধারণের সময় যুক্তিযুক্ততা অথবা অভিজ্ঞতার কোন মূল্যই দেওয়া হয়নি। বাস্তবে যা' অসম্ভব (অনেক রাষ্ট্রই মানবিক অধিকার রক্ষায় যথার্থই ইচ্ছুক নয় বলে তা' যথাযথ বলবৎ করা কোন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়), তাই রূপায়ণের জন্য অন্তঃসারশূন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। 1948 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভায় 'মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা' (Declaration of Human Rights) অনুমোদিত হয়। এই অনুমোদনকে রাষ্ট্রসংঘের ইতিহাসে চরম অবাস্তবতার নজির বলা যেতে পারে। এবং এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সবচেয়ে বড় শিকার হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। মানবিক অধিকারের প্রশ্নে এই পরিষদ সাধারণ সভা ও মানবিক অধিকার কমিশনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কাজ করলেও বিফলতার জন্য পরিষদকেই দায়ী করা হয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ইদানীংকালে বাস্তবধর্মী হওয়ার চেষ্টা করার ফলে সংগঠনগত বিভিন্ন অসুবিধা এবং রাষ্ট্রসংঘের কাঠামোয় পরিষদের স্থান-সংক্রান্ত (পরিষদের সীমিত ক্ষমতার অর্থে) অসুবিধা সত্ত্বেও সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে সরকারী দপ্তরের সঙ্গে তুলনা করলে 'বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ সম্মেলনকে, (U. N. Conference for Trade and Development) চাপসৃষ্টিকারী সংগঠন বলতে হয়। এই সম্মেলনের (UNCTAD) ভূমিকা সম্পর্কে জানতে গেলে এর ইতিহাস জানা দরকার। 'বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তির' (GATT) অস্তিত্ব সত্ত্বেও অনুন্নত সদস্যরাষ্ট্রসমূহের শঙ্কা (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাদের ভূমিকা এবং তাদের অর্থনৈতিক অবনতির প্রশ্নে) ক্রমশঃ বাড়ছিল। মিলিতভাবে এই শঙ্কা প্রকাশ করার জন্য 1964 খৃষ্টাব্দে জেনেভায় 'বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ সম্মেলন' (UNCTAD) আহূত হয়। লাতিন আমেরিকার অর্থনৈতিক কমিশনের পূর্বতন প্রশাসনিক সচিব, আর্জেন্টিনার মিঃ রাউল প্রেবিশ্ (Mr. Raul Prebisch) এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা হলেও এতে একশো কুড়িটি দেশ থেকে দুহাজার প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনের ফল হিসাবে শিল্পোন্নত দেশগুলির সাথে (বিশেষ করে পাশ্চাত্যের) বাণিজ্যিক বিষয়ে যৌথভাবে আলোচনা করার জন্য সাতাত্তরটি অনুন্নত সদস্যরাষ্ট্র-সম্বলিত একটি গোষ্ঠী (অনেকটা শ্রমিক সংগঠনের মত) গঠিত হয়। বাণিজ্যিক বিষয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলির উপর মিলিতভাবে চাপসৃষ্টি করাই এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। একতা ও সৃষ্টচাপ বজায় রাখার জন্য এই গোষ্ঠীকে 1965 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভার অধস্তন অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং যদিও চিরাচরিত অর্থে এটা সম্মেলন না, তবু তখন থেকে এই গোষ্ঠীর নাম হয়ে যায় 'বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ সম্মেলন' (UNCTAD)।

বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের' (UNCTAD) সদর-দপ্তর জেনেভায় এবং এর অধিবেশন প্রতি তিন বৎসর অন্তর হয়ে থাকে। সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্গত কিছু সংস্থার প্রতিনিধিগণ এই 'সম্মেলনের' সদস্য। মূল 'সম্মেলনের' দুটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতি বৎসর দুবার 'বাণিজ্য ও উন্নয়ন পর্ষদের' (Trade and Development Board) বৈঠক হয় (একবার জেনেভায় ও আরেকবার নিউইয়র্কে)। মূল সম্মেলন-কর্তৃক নির্বাচিত পঞ্চান্নজন সদস্য নিয়ে এই পর্ষৎ গঠিত। এই পর্ষৎ সরাসরি মূল 'সম্মেলনের' (UNCTAD) নিকট এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে সাধারণ সভার নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কাজ চালানোর জন্য এই

পর্ষৎ চারটি অধস্তন অঙ্গ গঠন করেছে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করার জন্য বড় একটি সচিবালয়ও আছে।

বলা যেতে পারে যে, 'বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ সম্মেলন' কোনকিছু করার চেয়ে যা' করা হয়নি (উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে সঙ্গত সর্তের ভিত্তিতে বাণিজ্য) তা' প্রকাশ করার জন্যই গঠিত হয়েছে। 'রাষ্ট্রসংঘের শিল্পোন্নয়ন সংস্থা' (United Nations Industrial Development Organization) সম্পর্কেও মোটামুটি একই ধরণের উক্তি করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাহায্যদানের প্রশ্নে উন্নত দেশগুলির নিকট অনুন্নত দেশগুলির দাবী এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত গবেষণার্থে সংস্থার জন্য উন্নত দেশগুলির দাবীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন হিসাবে 1966 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভাকর্তৃক 'রাষ্ট্রসংঘের শিল্পোন্নয়ন সংস্থা' (UNIDO) গঠিত হয়েছে। এই সংস্থার কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে সাধারণ সভার স্বভাবসিদ্ধ অস্পষ্টতা বিদ্যমান। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন' (ILO) এবং বিশ্বব্যাঙ্কের (World Bank) মত শক্তিশালী সংগঠন থাকা সত্বেও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব এই সংস্থাকে পালন করতে হয়। কেননা, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত গবেষণার কাজ ছাড়াও এই সংস্থা কারিগরী সাহায্য প্রকল্পেও নিযুক্ত (এই প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ হয় রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থে)।

'শিল্পোন্নয়ন সংস্থার' (UNIDO) প্রধান অঙ্গ হচ্ছে সাধারণ সভা-কর্তৃক নির্বাচিত পঁয়তাল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট 'শিল্পোন্নয়ন পর্ষৎ' (Industrial Development Board)। এই পর্ষদের কর্তব্য হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা এবং 'শিল্পোন্নয়ন সংস্থার' কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা। পর্ষদের সদর-দপ্তর ভিয়েনায় অবস্থিত হলেও এতে অনুন্নত দেশগুলির প্রাধান্যই বেশী। এই পর্ষদের সদস্যগণ তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং বৎসরে একবার (এপ্রিল-মে মাসে) এর বৈঠক হয়।

যে সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও চাপের ফলে অছি পরিষদ গঠন করা হয়েছে সেগুলি এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। প্রথমে এগারোটি অছিভুক্ত এলাকা ছিল : অষ্ট্রেলিয়ার অছিভুক্ত নিউগিনি ও নাওরু; বেলজিয়ামের অছিভুক্ত রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি; ফ্রান্সের অছিভুক্ত

ক্যামেরুন্‌স্‌ ও টোগোল্যাণ্ড; ইটালীর অছিভুক্ত সোমালিল্যাণ্ড; নিউজিল্যাণ্ডের অছিভুক্ত পশ্চিম সামোয়া; বৃটেনের অছিভুক্ত ক্যামেরুন্‌স্‌, টোগোল্যাণ্ড ও টাঙ্গানীকা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অছিভুক্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ (মারিয়ানাস্‌, মার্শাল্‌স ও ক্যারোলিনাস্‌ দ্বীপপুঞ্জ)। একমাত্র সোমালিল্যাণ্ড ছাড়া বাকি সবগুলিই জাতিপুঞ্জের ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থাভুক্ত ছিল। জাতিপুঞ্জের ম্যাণ্ডেটধারী দক্ষিণ আফ্রিকা তার ম্যাণ্ডেটভুক্ত এলাকাকে (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা) অছি-ব্যবস্থাভুক্ত করতে অস্বীকার করে। এ বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কাজের বৈধতা নিয়ে অনেক বিতর্ক হলেও 1950 খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক বিচারালয় অভিমত দিয়েছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অছি-ব্যবস্থার অধীনে উপস্থাপিত করতে আইনগতভাবে বাধ্য নয়, তবে জাতিপুঞ্জের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকা যেমন প্রতিবেদন পেশ করতো, তেমন রাষ্ট্রসংঘের নিকটও প্রতিবেদন পেশ করাও দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তব্য। (দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাণ্ডেট নাকচ করে সাধারণ সভা-কর্তৃকগৃহীত প্রস্তাব ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশাসন প্রত্যাহারের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের দাবী সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকা কোন প্রতিবেদন পেশ করেনা)।

এগারোটি অছিভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে চারটি (বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড, ফরাসী ক্যামেরুন্‌স্‌, ফরাসী টোগোল্যাণ্ড এবং ইটালীর অছিভুক্ত সোমালিল্যাণ্ড) 1960 খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে, দুটি (টাঙ্গানীকা ও পশ্চিম সামোয়া) পরের বৎসর স্বাধীনতা লাভ করে এবং ঐ সময়ে রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি ও দক্ষিণ ক্যামেরুন্‌স্‌-এর (বৃটেনের অছিভুক্ত) স্বাধীনতাও সমাসন্ন হয়ে পড়ে। 1968 খৃষ্টাব্দে নাওরু দ্বীপও স্বাধীনতা লাভ করেছে।* এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে অছি পরিষদের সদস্যসংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে † এবং পরিষদের তৎপরতাও কমে গেছে। এখন বৎসরে দুবারের পরিবর্তে একবার (সাধারণতঃ মে অথবা জুন মাসে) নিউইয়র্কে অছি পরিষদের বৈঠক হয়।

প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে অছিচুক্তিবলে অছিভুক্ত করা হয়। এ চুক্তি অছিধারী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি নয়।

---

* কিছুদিন পূর্বে নিউগিনিও স্বাধীনতা লাভ করেছে।

† পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

79 নম্বর ধারা অনুসারে এমন চুক্তির 'শর্তাবলী....প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সকল রাষ্ট্রকর্তৃক স্বিরীকৃত হবে।' এই ধারার প্রতিপাদ্য বিষয়কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধরে নিয়েছিল যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জকে অছিভুক্ত করার ব্যাপারে (জাতিপুঞ্জের সময় জাপানের ম্যাণ্ডেটভুক্ত) মার্কিন সরকারই সমস্ত শর্তাবলী স্থির করার অধিকারী এবং সোভিয়েৎ সরকারের মতানুসারে বিভিন্ন অছিচুক্তির শর্তাবলী নির্ধারণে যথার্থ এক্তিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের (এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সোভিয়েৎ প্রতিনিধি 1948 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অছি পরিষদের সমস্ত বৈঠকই বর্জন করেছিলেন)। অছিধারী রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশই মনে করতো যে, "প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সকল রাষ্ট্র" বলতে অছিভুক্ত অঞ্চলের 'প্রতিবেশী' রাষ্ট্রসমূহকে বোঝায় (এই 'প্রতিবেশী' রাষ্ট্রসমূহ প্রায়ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল)। অছি পরিষদ ও সাধারণ সভা সোমালিল্যাণ্ড সম্পর্কিত অছিচুক্তির খসড়া করার ফলে এক নজির সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন অছিচুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সকল অছিচুক্তিকেই চার্টারের 76 নম্বর ধারায় বর্ণিত অছি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অথবা অছিধারী রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য নিয়মকানুনের সাথে সঙ্গতি সাপেক্ষে হতে হবে। অছিচুক্তির বলেই অছিধারী রাষ্ট্র শাসনক্ষমতা লাভ করে এবং রাষ্ট্রসংঘ পর্য্যবেক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। সমস্ত অছিচুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ সভার অনুমোদন প্রয়োজন এবং 'সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা' সংক্রান্ত অছিচুক্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অছিভুক্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জই কেবল পরোক্ত শ্রেণীভুক্ত। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এই যে, সংশ্লিষ্ট অছিধারী রাষ্ট্র এধরণের এলাকায় রাষ্ট্রসংঘের পর্য্যবেক্ষকদের প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য নয়।

অছি পরিষদের ক্ষমতা মোটামুটি তিন রকমের (87 ও 88 নম্বর ধারা দ্রষ্টব্য)। প্রথমতঃ অছি পরিষদ প্রশ্নমালা (Questionnaire) প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট অছিধারী রাষ্ট্রকর্তৃক পেশ করা প্রতিবেদন গ্রহণ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কোন অছিভুক্ত এলাকা থেকে অভিযোগ-পত্রাদি গ্রহণ করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সেগুলি পরীক্ষা করতে পারে। তৃতীয়তঃ অছি পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরিদর্শনের সময় সম্পর্কে একমত হয়ে মাঝে মাঝে বিভিন্ন অছিভুক্ত অঞ্চলের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে

পারে। এবং এসমস্ত ব্যাপারে বিতর্ক করা এবং সুপারিশমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করার ক্ষমতাও অছি পরিষদের আছে। 1946 খৃষ্টাব্দে কাজ আরম্ভ করার সময় থেকেই অছি পরিষদ নিজের ক্ষমতা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে। অছি পরিষদের প্রশ্নমালার বিন্যাস যথেষ্ট বিশদ করা হয় এবং 1947 খৃষ্টাব্দে 247-টি প্রশ্ন সম্বলিত এক প্রশ্নমালা (বারোটি অংশে বিভক্ত এর সঙ্গে তেরোখণ্ডে বিভক্ত পরিসংখ্যানগত একটি অতিরিক্ত অংশও যুক্ত ছিল) অনুমোদিত হয়। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের (সংশ্লিষ্ট অছিধারী রাষ্ট্রের দেওয়া) ভিত্তিতেই পরে শুনানী (লিখিত ও মৌখিক) হতো। এসবের ভিত্তিতেই পরিষদের বিতর্কও সাধারণ সভার নিকট পেশ করার জন্য বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত হতো। কোন অছিভুক্ত অঞ্চলের অভিযোগপত্র সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিষদকে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। এমন অভিযোগপত্র সরাসরি পরিষদের কাছে দেওয়া যেতে পারে অথবা অছি পরিষদকর্তৃক প্রেরিত পরিদর্শনরত দলও অভিযোগকারীদের সঙ্গে দেখা করতে পারে অথবা অভিযোগপত্র গ্রহণ করতে পারে। 1947 খৃষ্টাব্দে অছি পরিষদ পশ্চিম সামোয়ায় এবং পরের বৎসর রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি ও টাঙ্গানীকায় পরিদর্শকদল প্রেরণ করে। এধরণের পরিদর্শকদলে সাধারণতঃ তিন-চারজন সদস্য থাকেন এবং পরিদর্শকদলের প্রতিবেদনে শুধু সংগৃহীত তথ্যাদিই থাকেনা, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের জন্য সুপারিশও থাকে। অনেক সময় (যেমন 1954 খৃষ্টাব্দে টাঙ্গানীকার ক্ষেত্রে হয়েছিল) পরিদর্শকদল পর্য্যবেক্ষণ ও প্রশাসনের মধ্যের পার্থক্য অবজ্ঞা করে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর বিধেয় পন্থা চাপিয়ে দিয়েছে। এধরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদও করেছে।

অছি পরিষদে অছিধারী ও অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে রেষারেষির ফলে সুফলও হয়েছে। এরফলে একদিকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে নিজেদের অছিভুক্ত অঞ্চলে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে এবং অন্যদিকে অছিধারী নয় পরিষদের এমন সদস্যদেরও শুধু ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জিগির ছেড়ে অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে হয়েছে। পরিষদের কার্য্যকলাপ সর্বতোভাবে রাজনৈতিক বিবেচনামুক্ত না হলেও এর সম্মুখে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকায় সদস্যগণকে নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়েছে। অবশ্য অছি-ব্যবস্থা সম্পর্কে এটাই শেষ কথা নয়।

আমরা জানি যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মত অছি পরিষদও সাধারণ সভার 'কর্তৃত্বাধীনে' কাজ করে। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির (যে দেশগুলিকে 'অনুন্নত', 'প্রাক্তন উপনিবেশ' এবং 'ঔপনিবেশিকতা বিরোধী' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে) ক্রমবর্ধমান আত্মসচেতনতার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণ সভার কাছ থেকে প্রচুর চাপ এবং দাবী অছি পরিষদে এসে পৌঁছে থাকে। সাধারণ সভায় এই সমস্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত প্রাধান্য থাকলেও অছি পরিষদের ক্ষুদ্রাকৃতির ফলে সেখানে এদের যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নেই। ফলে সাধারণ সভার চতুর্থ স্থায়ী (অছি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত) সমিতির মাধ্যমে এই সমস্ত দেশগুলি ক্রমাগতভাবে অছি পরিষদের কর্মনীতির পর্য্যালোচনা করে থাকে। তাছাড়াও, বিভিন্ন অছিভুক্ত অঞ্চলে সাধারণ সভা নিজেই পরিদর্শকদল প্রেরণ করেছে, চতুর্থ সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন অছিভুক্ত অঞ্চলের অভিযোগ শুনেছে এবং অভিযোগকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, এবং বিভিন্ন অছিভুক্ত অঞ্চলে নির্বাচন পরিদর্শনের জন্য (যেমন 1958 খৃষ্টাব্দে টোগোল্যাণ্ডে) পরিদর্শকদল প্রেরণ করেছে।

সাধারণ সভা অবশ্য আরও ব্যাপক ক্ষেত্রের (অছি-ব্যবস্থাবহির্ভূত কিন্তু অছি পরিষদের সাথে সম্পর্কযুক্ত) উপর চাপসৃষ্টি করেছে। চার্টারের একাদশ অধ্যায়ে আছে 'স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলসমূহ সম্পর্কিত ঘোষণা' এবং এই ঘোষণা সমস্ত উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চার্টারের 73(e) নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন উপনিবেশ সম্পর্কে (অছিভুক্ত নয়) রাষ্ট্রসংঘকে খবরাখবর দেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সদস্য-রাষ্ট্রসমূহকে দেওয়া হয়েছে। গোড়া থেকেই এই 'ঘোষণা' এবং সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির ধারণা অনুসারে এই ঘোষণা শুধু 'কথার কথা' (Charter), পথনির্দেশ অথবা নৈতিক পরওয়ানা ছাড়া কিছুই নয়। এই দেশগুলির মতে এদের জাতীয় সংসদ ছাড়া অন্য কারো নিকট কোন দায়-দায়িত্বই নেই এবং তাদের সংশ্লিষ্ট উপনিবেশ সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের নিকট অরাজনৈতিক বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করা গেলেও রাজনৈতিক খবরাখবর দিতে এরা বাধ্য নয় এবং এ বিষয়ে আলোচনা করার কোন ক্ষমতা (সুপারিশ করার ক্ষমতা দূরের কথা) রাষ্ট্রসংঘের নেই। কিন্তু ঔপনিবেশিকতাবিরোধী রাষ্ট্র-গুলি অছিভুক্ত অঞ্চলের মত বিভিন্ন উপনিবেশ সম্পর্কেও রাষ্ট্রসংঘের ক্ষমতা (অনুরূপ ধরণের) প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয় এবং 73 (e) নম্বর

ধারাকে পন্থা হিসাবে ব্যবহার করে। এই দুই বিরুদ্ধ মতের দ্বন্দ্বের বেশীর ভাগই হয় ‘স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলসমূহ সম্পর্কিত তথ্যাদি সংক্রান্ত সমিতিতে’ (Committee on Information from Non-Self-Governing Territories)। 1946 খৃষ্টাব্দে গঠিত একটি অস্থায়ী সমিতি ও 1947 খৃষ্টাব্দে তিন বৎসরের জন্য গঠিত ‘বিশেষ সমিতি’ (Special Committee) থেকেই উপরিউক্ত সমিতির জন্ম। পরে এই সমিতি সাধারণ সভার একটি শক্তিশালী এবং স্থায়ী অঙ্গ হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। এর গঠনশৈলী অছি পরিষদের মতই, অর্থাৎ, এতে শাসকরাষ্ট্র (ঔপনিবেশিক) ও শাসক নয় এমন সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা সমান, এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য আদর্শ (Standard) প্রশ্নমালাও আছে। রাজনৈতিক বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করার, আলাদা আলাদা উপনিবেশ সম্পর্কে সুপারিশ করার, এবং কখন কোন উপনিবেশ আর ‘স্বায়ত্বশাসনহীন’ থাকছেনা (অর্থাৎ স্বয়ংশাসিত হয়েছে) তা’ নির্ধারণ করার ক্ষমতা এই সমিতি বারবার ব্যবহার করতে চেয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ে সমিতিকর্তৃক ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্নে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র (এই সমিতির সদস্য) তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং বারবার হুমকী দিয়েছে যে, এই সমিতির উপর সাধারণ সভা অবৈধ (এই রাষ্ট্রগুলির মতে) ক্ষমতা অর্পণ করলে তারা সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করবে। (পর্তুগাল এক অভিনব যুক্তির অবতারণা করে। 1961 খৃষ্টাব্দে এই সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের বিরুদ্ধে পর্তুগাল যুক্তি দেখিয়েছে যে, মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলসমূহ এককেন্দ্রীক সরকারাধীন পর্তুগালেরই প্রদেশ, উপনিবেশ নয়)।

অছি পরিষদের পাশাপাশি উপরিউক্ত সমিতির অস্তিত্বের মাধ্যমে দেখা যায় যে, নূতন পরিস্থিতি মোকাবিলায় অভিনবপন্থা উদ্ভাবনে সাধারণ সভা সমর্থ। ‘স্বায়ত্বশাসনহীন’ অঞ্চলসমূহের ব্যাপারে সাধারণ সভার তৎপরতার এখানেই শেষ নয়। 1960 খৃষ্টাব্দে আফ্রিকা থেকে সদস্যসংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে ঐ বৎসর ‘পরাধীন দেশ ও জাতিসমূহকে স্বাধীনতাদান সম্পর্কিত ঘোষণা’ (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে (ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি ভোটদানে বিরত থাকে) গৃহীত হয়েছে। এই ঘোষণার ফলে ঔপনিবেশিকতা অবৈধ বলে পরিগণিত হয় এবং কোন পরাধীন দেশ স্বায়ত্বশাসনের

ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়নি বলে ঔপনিবেশিক শক্তিকর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর পিছিয়ে দেওয়ার কৌশলের নিন্দা করা হয় এবং সমস্ত উপনিবেশকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই সমিতিকে ভিত্তি করে আরও চাপসৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে। একে অবজ্ঞা করা হচ্ছে বলে সমিতির তৎপর সদস্যরাষ্ট্রসমূহ আরও একটি সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করে। অত্যন্ত লম্বা একটি নাম (The Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) এই নূতন সমিতিকে দেওয়া হলেও "চব্বিশ সদস্যের সমিতি" (Committee of 24) নামেই এটি সমধিক পরিচিত। কাঠামোর দিক থেকে এই সমিতিতে অছি পরিষদ গঠনের নীতি বর্জন করা হয়েছে, অর্থাৎ এতে অর্ধেক সদস্যপদ শাসকরাষ্ট্রসমূহকে দেওয়া হয়নি। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিকে এই সমিতির পাঁচটি আসন এবং অবশিষ্ট উনিশটি আসন সোভিয়েৎ গোষ্ঠী ও তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে দেওয়া হয়েছে। উপনিবেশ-প্রথার অবসানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ সাধারণ সভা এই সমিতিকে দেয় এবং 1963 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভা এই সমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠিত অন্যান্য সমিতির (স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলসমূহ সম্পর্কিত তথ্যাদি সংক্রান্ত সমিতিসহ) দায়িত্বগ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করে। বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ঘোষণা (স্বাধীনতাদান সংক্রান্ত) প্রয়োগ করা হয়নি বলে এই সমিতি অভিযোগ করে এবং দক্ষিণ রোডেশিয়া প্রশ্নে যথেষ্ট পরিমাণে চাপও সৃষ্টি করা হয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন পরাধীন দেশে এর প্রকাশ্য বৈঠক হয়ে থাকে (ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্যই)। এর ফলে অবশ্য বিভিন্ন উপনিবেশ রাতারাতি স্বাধীন হয়নি। তবে একথাও ঠিক যে, আফ্রিকার বিভিন্ন পরাধীন দেশের স্বাধীনতা লাভে এই সমিতির অবদান একেবারে নগণ্য নয়।

বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের (Specialized Agencies) মধ্যে 'কার্য্যভিত্তিক আন্তর্জাতিকতার' (যা' নিয়ে এ পুস্তকের প্রথম দিকেই খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে) প্রতিফলন দেখা যায়। 'কার্য্যভিত্তিক আন্তর্জাতিকতার' (Functional Internationalism) মধ্যে নিহিত দৃষ্টিভঙ্গীর সারকথা হলো এই যে, আন্তর্জাতিক পর্য্যায়েই সমাধান সম্ভব

এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলিকে রাজনীতিমুক্ত রেখে (এবং তা' সম্ভব) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহকর্তৃক গঠিত আলাদা আলাদা সংগঠনের মাধ্যমে (এমন সমস্ত সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ থাকতেও পারে) মোকাবিলা করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন সংস্থার কাঠামো বাঁধাধরা ছক অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে, এমন নয়। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিভিন্ন সংস্থার কাঠামোর প্রকৃতি স্থির হবে। তবুও, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থার মধ্যে কাঠামোগত কিছু কিছু সামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রত্যেকটিরই স্থায়ী সচিবালয়, ব্যাপক নীতিনির্ধারণের জন্য আলোচনা সভা এবং পরিষদ অথবা পর্ষৎ আছে। আলোচনা সভায় সংস্থার সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রেরই প্রতিনিধিত্ব থাকে, কর্মপরিষদ আনুপাতিকভাবে ক্ষুদ্র হয় এবং সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে।

বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের মধ্যে 'আন্তর্জাতিক তার ও বেতার যোগাযোগ সংস্থা' (International Telecommunication Union) সবচেয়ে প্রাচীন। 1865 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক তারবার্তা সংস্থা (International Telegraph Union) থেকে এর উৎপত্তি। তিন বৎসর পরে বার্ণ শহরে (Berne) এই সংস্থার দপ্তর স্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক তার ও বেতার যোগাযোগ সংস্থার বর্তমান সদর-দপ্তর জেনেভায়। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের মন্ত্রীপর্য্যায়ের সম্মেলন (Plenipotentiary Conference) হয় এবং অন্তবর্তীকালে সংস্থার পর্য্যবেক্ষণের দায়িত্ব পূর্ণ সম্মেলনকর্তৃক নির্বাচিত পঁচিশজন সদস্যবিশিষ্ট প্রশাসনিক পরিষদের (Administrative Council) উপর ন্যস্ত। বৎসরে একবার এই পরিষদের বৈঠক হয়। এই পরিষদই সংস্থার বাজেট অনুমোদন করে এবং এর সাধারণ সচিব (Secretary General) মনোনীত করে। এই পরিষদই বেতার স্পন্দনের দ্রুততা (Radio Frequency) সম্পর্কে সুপারিশ করে (খুব একটা সাফল্য সহকারে নয়), তথ্যাদি প্রচার করে এবং কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা করে।

ঐতিহ্যের দিক থেকে 'আন্তর্জাতিক ডাক যোগাযোগ সংস্থা'ও (Universal Postal Union) পিছিয়ে নেই। 1874 খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক ডাক সম্মেলনের' (International Postal Congress) ফলে 'সাধারণ ডাক সংস্থার' (General Postal Union) জন্ম হয়। 1878 খৃষ্টাব্দে 'আন্তর্জাতিক ডাক সম্মেলনের' দ্বিতীয় অধিবেশনে 'সাধারণ ডাক সংস্থার' নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম, অর্থাৎ, 'আন্তর্জাতিক ডাক সংস্থা' (UPU)

রাখা হয়। আন্তর্জাতিক ডাক সংস্থার পূর্ণাঙ্গ সভার বৈঠক প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর হয়ে থাকে। সংস্থার মূল দলিলের (Convention) সংশোধন, ডাকের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে। অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত হয়। কুড়িটি সদস্যরাষ্ট্রসম্বলিত (পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনকর্তৃক নির্বাচিত) 'প্রশাসনিক ও যোগাযোগকারী সমিতিকে' (Executive and Liaison Committee) অন্তবর্তীকালে সংস্থার কাজ দেখাশুনা করতে হয়। সুইটজারল্যাণ্ডদেশীয় একজন অধিকারকের নেতৃত্বে বার্ণ শহরে এই সংস্থার আন্তর্জাতিক দপ্তর (International Bureau) আছে। এই দপ্তরই আন্ত-র্জাতিক ডাক সংস্থার সচিবালয়। পূর্ববর্তী সংস্থা দুটির ন্যায় সর্বৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নিযুক্ত ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের উর্ধে আরেকটি সংস্থা হলো 'বিশ্ব আবহাওয়া পূর্বাভাষ সংস্থা' (World Meteorological Organization)। 1878 খৃষ্টাব্দে গঠিত (প্রায় বেসরকারী) 'আন্তর্জাতিক আবহাওয়া পূর্বাভাষ সংস্থা' (International Meteorological Organization) থেকে 'বিশ্ব আবহাওয়া পূর্বাভাষ সংগঠনের' উৎপত্তি। প্রতি চার বৎসর অন্তর এই সংগঠনের বিশ্বসম্মেলন হয় এবং এর একটি কর্মপরিষদ আছে। বৎসরে একবার এই কর্মপরিষদের বৈঠক হয়। বিশ্বসম্মেলনকর্তৃক একজন সাধারণ সচিব (Secretary General) নির্বাচিত হন। 'বিশ্ব আবহাওয়া পূর্বাভাষ সংগঠনের' সদর-দপ্তর জেনেভায়।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের (ILO) কর্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃতভাবে ব্যাপক। 'আফিং পর্ষদের' (Opium Board) কথা বাদ দিলে আন্ত-র্জাতিক শ্রমিক সংগঠনই জাতিপুঞ্জসৃষ্ট একমাত্র বিশেষজ্ঞ সংস্থা। এই সংস্থা জাতিপুঞ্জের আমল থেকেই স্বকীয়তা বজায় রেখেছে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের অগ্রগতিতে এর প্রভাব অনস্বীকার্য্য। 1919 খৃষ্টাব্দে জাতি-পুঞ্জের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রকে নিয়ে এই শ্রমিক সংগঠন গঠিত হয়। কিন্তু তারপর থেকে জাতিপুঞ্জের অবনতি হলেও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের ক্রমাগত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ না করলেও এই সংগঠনের সদস্য হয় এবং এর প্রথম অধিকারক, মিঃ অ্যালবার্ট টমাসের (Mr. Albert Thomas) প্রশংসনীয় নেতৃত্বে এই সংগঠন সারা পৃথিবীতেই শ্রমিকদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধনে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা সামলে স্বকীয় অস্তিত্ব অক্ষত রাখতে সমর্থ হয়। সংগঠনের নীতি নির্ধারণ হয় দুটি অঙ্গের মাধ্যমে। একটি হলো সমস্ত

সদস্যরাষ্ট্রবিশিষ্ট 'সাধারণ সম্মেলন' (General Conference); এর অধিবেশন বৎসরে একবার হয়। অপরটি হলো চল্লিশজন সদস্যবিশিষ্ট কর্মপরিষদ (Governing Body); এই পরিষদের ত্রৈমাসিক বৈঠক হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব তিন পর্য্যায়ের হয়ঃ 'সাধারণ সম্মেলনে' প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র থেকে দুজন সরকারী প্রতিনিধি প্রেরিত হন। কর্মপরিষদের চল্লিশজন সদস্যের মধ্যে কুড়িজন সরকারী প্রতিনিধি, দশজন মালিকদের প্রতিনিধি ও অবশিষ্ট দশজন শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকেন। এর ফলে বলা যেতে পারে যে, এর সাংগঠনিক ও আন্তর্জাতিক দিক জোরদার হয়েছে এবং সংগঠনে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের মধ্যে পার্থক্য জাতিভিত্তিক না হয়ে স্বার্থভিত্তিক হয়েছে। 'সাধারণ সম্মেলনে' দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত হয়। যদিও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন এখনও চিরা-চরিত বিষয়েই (যেমন শ্রমিকদের কাজের সময়, বেতন-হার, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি) মূলতঃ আগ্রহশীল, তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই সংগঠনের কর্মক্ষেত্র ব্যাপকতর হয়েছে এবং এ সংগঠন এখন সামাজিক নিরাপত্তা, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতিতেও আগ্রহ প্রদর্শন করছে। এর ফলে রাষ্ট্রসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনের যোগাযোগ আরও নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সংস্থার সাথে একযোগে অথবা এককভাবে কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা করার গুরুদায়িত্ব এখন এই সংগঠনকে বহন করতে হচ্ছে। ডেভিড্ মোর্স্ (David Mores) 1948 খৃষ্টাব্দ থেকে 1970 খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে এক নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উত্তর-সূরী হলেন বৃটিশ নাগরিক উইলফ্রেড্ জেঙ্ক্স্ (Wilfred Jenks)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা' (FAO) গঠনের উদ্যোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রহণ করা হয়। এর পিছনে যে শুধু জাতি-পুঞ্জের আমলের মানবপ্রেমীদের (যেমন এফ. এল. ম্যাক্ডুগাল) প্রেরণাই ছিল তা' নয়, এই সংস্থার মাধ্যমেই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট্ যুদ্ধোত্তরকালে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় মার্কিন অংশগ্রহণের সম্ভাব্য সাফল্য বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থার' উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যোৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা এবং বিশ্বমানবের জীবনমান ও পুষ্টির পর্য্যায় উন্নীত করা। তথ্যসংগ্রহ ও কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা এবং

আন্তজাতিক পণ্যচুক্তির বন্দোবস্তই এই সংস্থার কাজের হাতিয়ার। বলা যেতে পারে, 'বিশ্ব খাদ্যসূচী'র (World Food Programme) সমন্বয়-সাধনই এপর্য্যন্ত 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থার' সবচেয়ে মূল্যবান অবদান। সংস্থার সদর-দপ্তর রোমে অবস্থিত হলেও আরও আটটি রাজধানীতে এর আঞ্চলিক দপ্তর আছে। এই সংস্থার পূর্ণাঙ্গ বৈঠক, অর্থাৎ, 'সম্মেলন' (Conference) প্রতি দুই বৎসরে একবার হয়। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট আছে এবং অপেক্ষাকৃত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এবং অন্যান্য বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ণ 'সম্মেলন'কর্তৃক নির্বাচিত চৌত্রিশজন সদস্য-বিশিষ্ট কর্মপরিষদের বৈঠক বৎসরে দুবার হয় এবং এই পরিষদে সংখ্যা-গরিষ্ঠের ভোটেই সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে।

1944 খৃষ্টাব্দের ব্রেটন্ উড্স্ সম্মেলনে দুটি অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয় এবং এ দুটিই গঠিত হয় 1946 খৃষ্টাব্দে। এর একটি হলো 'আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন ব্যাঙ্ক' (International Bank for Reconstruction and Development) এবং অপরটি হলো 'আন্তর্জাতিক অর্থকোষ' ((International Monetary Fund)। উৎপাদনমুখী লগ্নীর উৎসাহদান এবং উন্নয়নই এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য এবং এর মূলধনের ব্যবস্থা হয়েছে ব্যাঙ্কের সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক প্রদত্ত (নিজ নিজ জাতীয় সম্পদ ও বাণিজ্য অনুপাতে) অর্থে। অনুরূপভাবে 'অর্থকোষের' অর্থের ব্যবস্থা হয়েছে এর সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক প্রদত্ত (আনুপাতিক হারে ধার্য্য) অর্থের ভিত্তিতে এবং এই অর্থকোষের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত (অর্থসংক্রান্ত) সহায়তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে (আথিক) আদান-প্রদান ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্থিতিশীলতা আনয়ন করা। এই দুই সংস্থার কাঠামো একই রকমের। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র একজন করে 'পরিচালক' (Governor) প্রেরণ করে এবং বৎসরে একবার 'পরিচালকমণ্ডলীর' (Board of Governors) বৈঠক হয় এবং প্রত্যেক পরিচালক তাঁর স্বদেশকর্তৃক প্রদত্ত অর্থের অনুপাত অনুসারে ভোট দিয়ে থাকেন (আন্তর্জাতিক অর্থকোষের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কড়াকড়িভাবে এবং ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে পালিত হয়)। 'ব্যাঙ্ক' ও 'অর্থকোষের' নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার দেখাশুনা করেন 'প্রশাসনিক পরিচালকবর্গ' (Executive Directors)। 'ব্যাঙ্কে' আঠারোজন এবং 'অর্থকোষে' সতেরোজন প্রশাসনিক পরিচালক

থাকেন। প্রত্যেক প্রশাসনিক পরিচালক তাঁর নির্বাচনকারী রাষ্ট্রসমূহের ভোটাধিকার ব্যবহার করে থাকেন এবং যেকোন সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই গৃহীত হয়। 'ব্যাঙ্কের' প্রশাসনিক পরিচালকবর্গ ব্যাঙ্কের জন্য একজন 'সভাপতি' (President) নির্বাচন করেন এবং অনুরূপভাবে 'অর্থকোষের' জন্যও একজন 'ব্যবস্থাপক পরিচালক' (Managing Director) নির্বাচিত হন। এই দুই সংস্থারই সদর-দপ্তর ওয়াশিংটনে।

আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকেই 1956 খৃষ্টাব্দে 'আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানে'র (International Finance Corporation) জন্ম। পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলসমূহে নিজে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে লগ্নী করে (সাধারণতঃ মোট লগ্নীর পঞ্চাশ শতাংশের বেশী নয়) উক্ত অঞ্চল-সমূহে বেসরকারী লগ্নীর উৎসাহদানই এই অর্থ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই অর্থ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সাথে এক-যোগে কাজ করে এবং এর কাঠামোও একই ধরণের। বস্তুতঃ 'ব্যাঙ্কের' 'পরিচালকমণ্ডলী' এবং 'প্রশাসনিক পরিচালকবর্গ' আন্তর্জাতিক অর্থ-প্রতিষ্ঠানেরও (IFC) 'পরিচালকমণ্ডলী' ও 'প্রশাসনিক পরিচালকবর্গরূপে' কাজ করে থাকেন।

একইরকম ভাবে 'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা'ও (International Development Association) 1961 খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থায় পরিণত হয়। প্রধানতঃ অল্প হারের সুদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের মাধ্যমে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়াসী।

'শিক্ষানৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা' (UNESCO) 1946 খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সংগঠনের দিক থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এই সংস্থাকে অনুরূপ কোন সংস্থার উত্তরসূরী বলা চলেনা। স্বকীয় লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিলনা বলে গোড়ার দিকে এই সংস্থা খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্রথমে ভেবে পায়নি কি করা উচিত: বোমা বিধ্বস্ত বিদ্যালয় পুনর্গঠনে সাহায্য করা, অথবা ডিউয়ি (Dewey) বর্ণিত 'গণতান্ত্রিক শিক্ষা' সম্পর্কে (Democratic Education) প্রচার করা। এ সংস্থা প্রথমে ঠিক করতে পারেনি শান্তিপ্রচারকের এবং মানুষের মন থেকে যুদ্ধের মূলোৎপাটনকারীর (যেহেতু যুদ্ধের সূত্রপাত মানুষের মনেই হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়) ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত কিনা। নিজের উদ্দেশ্যসমূহের কোনগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত স্থির করতে না পারার জন্য 'শিক্ষানৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক

সংস্থা' অন্য সমস্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে স্বীয় কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা থেকেও এই সংস্থা বঞ্চিত হয়েছে এবং এতে বহু গুণী লোকের সমাবেশ সত্ত্বেও এর কার্য্যকলাপে দক্ষতা প্রকাশ সম্ভব হয়নি।

1958 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে 'শিক্ষানৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার' স্থায়ী সদর-দপ্তর স্থাপিত হওয়ার পর এর কাজে সৌষ্ঠব এসেছে। বর্তমানে এই সংস্থা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনশিক্ষার কৌশল, শিক্ষক-শিক্ষণ ও বিদ্যালয় নির্মাণ, সাংস্কৃতিক মূল্যসম্পন্ন স্তম্ভাদি (যেমন সিম্বেলের প্রস্তর মন্দির) এবং আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান প্রভৃতি বাস্তব উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। প্রতি দুই বৎসরে একবার সংস্থার 'সাধারণ সম্মেলন' (General Conference) হয়। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র পাঁচজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে এবং 'শিক্ষানৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার' সংশ্লিষ্ট জাতীয় কমিশনের সঙ্গে অথবা এধরণের জাতীয় কমিশন না থাকলে এই সংস্থার কর্মক্ষেত্রের মত অনুরূপ বিষয়ে নিয়োজিত জাতীয় সংগঠনসমূহের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। ত্রিশজন সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কর্মপর্ষৎ' (Executive Board) আছে। এবং এই 'কর্মপর্ষদের' বৈঠক বৎসরে দুবার হয়।

1947 খৃষ্টাব্দে গঠিত হলেও 'আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার' (International Civil Aviation Organization) সূত্রপাত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে। মূলতঃ প্রযুক্তি সম্পর্কিত হলেও সদস্যরাষ্ট্রসমূহের স্বার্থের বিভিন্নতার জন্যই এই সংস্থা কঠোর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা অবলম্বনে সমর্থ হয়নি। অসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কিত চুক্তির (Convention) শর্তাবলী যাতে মান্য করা হয় সেদিকে এই সংস্থা লক্ষ্য রাখে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি প্রচার করে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে সংস্থার সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রসম্বলিত 'সভার' সম্মেলন বৎসরে একবার হয় এবং সংস্থার সাধারণ নীতি নির্ধারণের জন্য প্রতি তিন বৎসরে একবার উক্ত সভার সম্মেলন হয়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ সভাকর্তৃক নির্বাচিত সাতাশজন সদস্যবিশিষ্ট কর্মপরিষদের (Council) বৈঠক প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলতে থাকে। এই পরিষদই 'আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার' সাধারণ সচিব (Secretary General) নির্বাচিত করে। এর সদর-দপ্তর মণ্ট্রিলে অবস্থিত।

'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাই' (WHO) রাষ্ট্রসংঘের নিজের সৃষ্ট বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির প্রথম। স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়ে জাতিপুঞ্জের সাফল্য এবং রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার (সর্বজনস্বীকৃত) প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ প্রথম অধিবেশনেই একটি সমিতি গঠন করে। এই সমিতিই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমস্ত আগ্রহশীল দেশগুলির এক সম্মেলনের আয়োজন করে (আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলন)। 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার' গঠনতন্ত্র (Constitution) 1946 খৃষ্টাব্দের 22শে জুলাই স্বাক্ষরিত হলেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিস্ময়কর রকমের সন্দেহপরায়ণতা (রাজনৈতিক) ও রেষারেষির কারণে 1948 খৃষ্টাব্দের পূর্বে উক্ত গঠনতন্ত্রের অনুসমর্থন (Ratification) সম্ভব হয়নি। এই সংস্থার সদর-দপ্তর জেনেভায় হলেও বলা যেতে পারে যে, 'বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা' অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার চেয়ে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার (Regionalism) প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করেছে। তার কারণ এই সংস্থা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশ (সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলসমূহ) এবং ইউরোপের জন্য আলাদা আলাদা সংগঠনের ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক্তিয়ারের প্রশ্নে 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থার' সঙ্গে 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার' গণ্ডগোল হয়ে থাকে। সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রসম্বলিত 'সভা' (Assembly) সংস্থার সাধারণ নীতি ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই 'সভার' অধিবেশন বৎসরে একবার হয়। 'সভা'কর্তৃক নির্বাচিত চব্বিশজন সদস্যবিশিষ্ট 'প্রশাসন পর্ষদের' (Executive Board) বৈঠক বৎসরে দুবার হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 'মুখ্য পরিচালক' (Director General) প্রশাসন পর্ষদের মনোনয়ন সাপেক্ষে সংস্থার 'সভা'কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

'আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা' (International Atomic Energy Agency) 1957 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে গঠিত হয়। আরম্ভের সময়ই এই সংস্থার সদস্যরাষ্ট্রসংখ্যা প্রচুর (সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি-সহ) হয় এবং এর আইনকানুনের খসড়া পূর্বেই (1956 খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। এর সদর-দপ্তর ভিয়েনায় অবস্থিত এবং আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য উৎসাহদান এবং গবেষণাই এর উদ্দেশ্য।

মর্য্যাদার (Status) দিক থেকে দেখতে গেলে এই সংস্থাকে দুই বিরুদ্ধ মতের (একদল রাষ্ট্র এই সংস্থাকে স্বাধীন সংস্থারূপে গঠন করতে চেয়েছিল এবং অন্য একদল রাষ্ট্র একে সর্বৈব রাষ্ট্রসংঘের কর্তৃত্বাধীনে রাখতে চেয়েছিল) আপোষ বলা চলে। অতএব দেখা যায় যে, বিশেষজ্ঞ সংস্থার প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য এর থাকলেও এই সংস্থাকে চূড়ান্ত অর্থে বিশেষজ্ঞ সংস্থা বলা যায়না। 'আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা' সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ। সমস্ত সদসরাষ্ট্রসম্বলিত 'সাধারণ সম্মেলনের' (General Conference) উপর আলোচনা করা, সুপারিশ করা এবং সংস্থার বাজেট নিয়ন্ত্রণ করার মোটামুটি ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলেও এর প্রকৃত পরিচালন-ক্ষমতা 'পরিচালকমণ্ডলীর' (Board of Governors) হাতে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 'এই পরিচালকমণ্ডলীতে' আণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশগুলির প্রতিনিধিদের জন্য মোটামুটি স্থায়ী আসন সংরক্ষিত আছে। 'পরিচালকমণ্ডলীর' সদস্যসংখ্যা একুশ থেকে পঁচিশের (বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকার প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনের উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল) মধ্যে থাকে। 'পরিচালকমণ্ডলীর' সদসদ্যদের মোটামুটি অর্ধেক নির্বাচিত হন সংস্থার 'সাধারণ সম্মেলন'কর্তৃক এবং অবশিষ্ট অর্ধেক নির্বচিত হন অবসরগ্রহণকারী 'পরিচালকমণ্ডলী'কর্তৃক। 'পরিচালকমণ্ডলী'কর্তৃক মনোনয়নের ভিত্তিতে সংস্থার 'মুখ্যপরিচালক' (Director General) 'সাধারণ সম্মেলন'কর্তৃক নির্বাচিত হন।

বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির মধ্যে সবার শেষে গঠিত হয়েছে 'বাণিজ্য-জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত আন্তঃসরকারী আলোচনা সংস্থা' (Intergovernmental Maritime Consultative Organization)। 1948 খৃষ্টাব্দে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকর্তৃক আহূত এক সম্মেলনে এর গঠনতন্ত্র (Convention) প্রস্তুত হলেও প্রয়োজনীয় অনুসমর্থনের অভাবে এই সংস্থা 1958 খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হতে পারেনি। ঐবৎসর জাপান উক্ত গঠনতন্ত্র অনুসমর্থন করায় এই সংস্থা কার্য্য আরম্ভ করে। অসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে 'আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার' যে ভূমিকা, সামুদ্রিক (বাণিজ্য) জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে 'বাণিজ্য জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত আন্তঃসরকারী আলোচনা সংস্থার'ও (IMCO) সেই ভূমিকা। এই সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টার কাজই করে থাকে। এর সদর-দপ্তর লণ্ডনে।

এই অধ্যায়ে আলোচিত বারোটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে একটা বিশেষ জগৎ গড়ে তুলেছে এবং দেখা যাচ্ছে যে, এই জগতের অর্ধেক রাষ্ট্রসংঘের মূল অংশের ভিতরে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক রাষ্ট্রসংঘের বাইরে। এই সংস্থাগুলির কর্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ, এগুলির সম্মিলিত বাজেট রাষ্ট্রসংঘের কেন্দ্রীয় বাজেটের সমান এবং এই সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত মোট কর্মচারীর সংখ্যা মহাসচিবের অধীনস্থ রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারীবৃন্দের সংখ্যার চেয়েও বেশী। এই সংস্থাগুলির সদস্যরাষ্ট্রসংখ্যা রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের চেয়ে বেশী এবং বলা যেতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রসমূহ এই সংস্থাগুলিকে অধিকতর সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি সরাসরি সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে (যেগুলি সার্বভৌম) এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে থাকে। এর ফলে অবশ্য শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং শৃঙ্খলার খাতিরেই অনেকে বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলিকে সর্বৈবই রাষ্ট্রসংঘের এক্তিয়ারভুক্ত করে সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা বলেন যে, বর্তমান শৃঙ্খলাবিহীন ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োজনীয়তাও আছে এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির বিশেষ ধরণের কার্যকলাপের সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের (মূলতঃ) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গাঁটছড়া বাঁধলে বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির উদ্দেশ্যাবলীর সমূহ ক্ষতি হবে এবং রাষ্ট্রসংঘের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াও লাভবান হবেনা।

উল্লেখযোগ্য অন্য একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা হলো 'শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি' (General Agreement on Tariffs and Trade)। ব্রেটন উডের প্রস্তাব অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ সুগম করার জন্য বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থকোষ ছাড়াও একটি তৃতীয় সংস্থার সূত্রপাত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক লগ্নী, পণ্যচুক্তি, সংরক্ষণশীল নীতিভিত্তিক বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই এই সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। 1947-48 খৃষ্টাব্দের হ্যাভানা সম্মেলনে 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার' (International Trade Organization) জন্য একটি গঠনতন্ত্র (Charter) রচিত হলেও মার্কিন সংসদের সংরক্ষণ-শীল নীতি, বৃটেনের সীমিত (Restrictive) বাণিজ্য নীতি এবং অন্যান্য উন্নত দেশের প্রতিক্রিয়ার জন্য এই সংস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

ফলে 1947 খৃষ্টাব্দে জেনেভায় স্বাক্ষরিত অস্থায়ী বন্দোবস্তকেই (GATT) স্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয়। ব্যবস্থা হয় একটি সচিবালয়ের (1955 খৃষ্টাব্দে স্থায়ী করা হয়), বার্ষিক সম্মেলনের এবং বৎসরে পাঁচ-ছয়বার বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য একটি পরিষদের (Council) এবং সর্বোপরি ব্যবস্থা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে অধিকার ও দায়িত্বসম্বলিত এক ব্যবহারবিধির। এই সংস্থার (GATT) ভিত্তি হলো পক্ষপাতহীনতা ও পরিপূরকতার নীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রথম পঁচিশ বৎসরে এই সংস্থাকে কেন্দ্র করেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার হয়। এপর্য্যন্ত আশীটি রাষ্ট্র এর সদস্য হয়েছে।

এবারে 'আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের' (International Court of Justice) কথায় আসা যাক। রাষ্ট্রসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় অঙ্গ হিসাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয় 1946 খৃষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জের আমলের 'স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের' (Permanent Court of International Justice) স্থলাভিষিক্ত হয়। এর ফলে ধারাবাহিকতা প্রায় অবিচ্ছিন্নই রয়ে গেছে। এই দুই বিচারালয়ের 'বিধি' (Statute) প্রায় একই। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দপ্তর হেগ্ শহরের সেই পুরোণো ভবনেই অবস্থিত এবং এই বিচারালয় নিজের রায় ও অভিমতের মত 'স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের' রায় এবং অভিমতের উল্লেখ দ্বিধাহীন ভাবেই করে থাকে। বস্তুতঃ পুরোনো বিচারালয়ের দুজন বিচারপতি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের নির্বাচন-প্রণালী এবং এই নির্বাচনে সাধারণ সভার বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়েই খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এই বিচারালয় গঠনসংক্রান্ত কিছু তত্ত্ব (যেমন, একই সময়ে দুজন বিচারপতি একই দেশের নাগরিক হতে পারবেন না) এবং বিচারপতিদের নির্বাচনকালে পরিলক্ষিত কিছু কিছু কার্য্যকলাপ যেকোন বিচারালয়ের ভাবমূর্ত্তি বিরোধী (কারণ আশা করা হয়ে থাকে যে, বিচারপতিগণ নিজেদের জাতীয় আনুগত্যের ঊর্ধে উঠে কেবল আইনের সেবাই করবেন), তবুও বলা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণ উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছেন। বিচারপতিদের নির্বাচনকালে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নকে অবজ্ঞা করার সময় এখনও আসেনি। বস্তুতঃ আমেরিকার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের (Supreme Court) গঠনেও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে ম্যাসন-

ডিক্‌সন্‌ রেখার (Mason-Dixon Line) দক্ষিণের প্রদেশগুলির অথবা মিসিসিপি নদীর পশ্চিমের প্রদেশগুলির দাবী অবজ্ঞা করা যায়না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পনেরোজন বিচারপতিদের মধ্যে প্রত্যেক বৃহৎশক্তি থেকে (চীন ব্যতীত) একজন, তাছাড়াও ইউরোপ থেকে আরও তিনজন (পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে একজন ও পশ্চিম ইউরোপ থেকে দুজন), এশিয়া থেকে তিনজন, আফ্রিকা থেকে তিনজন এবং লাতিন আমেরিকা থেকে দুজন করে বিচারপতি আছেন। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হলেও আলাদা অথবা বিরুদ্ধ অভিমত নিবন্ধকৃত হয়ে থাকে। নিজস্ব নজির মেনে চলতে এই বিচারালয় বাধ্য নয় বলে পরবর্তীকালের মামলায় নিবন্ধকৃত আলাদা অথবা বিরুদ্ধ অভিমতের প্রভাব পড়তেও পারে।

এই বিচারালয় উচ্চমানসম্পন্ন হলেও সান্‌ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের সময়ে এবং এর পরেও কিছু কিছু মহলে এর সম্পর্কে যে আশা পোষণ করা হতো তা' পূর্ণ হয়নি। বরং বলা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের চেয়ে স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল। বর্তমান বিচারালয়ে মামলাও তুলনামূলকভাবে কম আসে এবং স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নিকট আনীত বিভিন্ন মামলার তুলনায় সেগুলির গুরুত্বও কম। পুরোনো বিচারালয়ের ন্যায় বর্তমান বিচারালয়ের ব্যবস্থায়ও কিছু কিছু দোষত্রুটি আছে। (যেমন, কেবল রাষ্ট্রসমূহই কোন মামলার শরিক হতে পারবে। এর ফলে রাষ্ট্রসংঘসহ সমস্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন মামলা নিয়ে এই বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারেনা)। তবে আরও মারাত্মক ত্রুটি হলো এই যে, এই বিচারালয়ের এক্তিয়ার রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের (সেই সুবাদে আন্তর্জাতিক বিচারালয়েরও সদস্যরাষ্ট্র) উপর বাধ্যতামূলক নয়। পুরোনো বিধির (Statue) মত নূতন বিধিতেও অবশ্য 'ঐচ্ছিক ধারা' (Optional Clause) আছে। এই ধারার প্রতিপাদ্য বিষয়ের এধরণের নামকরণ (ঐচ্ছিক ধারা) সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিধির 36 নম্বর ধারায় এই 'ঐচ্ছিক ধারার' কথা বলা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে বিভিন্ন রাষ্ট্র অনুরূপ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুনির্দিষ্টকৃত প্রশ্নাদি সম্পর্কে আইন-বিষয়ক বিবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ারকে স্বতন্ত্র চুক্তি ছাড়াই আপনা-আপনি (ipso facto) বাধ্যতামূলক

বলে স্বীকার করতে পারে। এই 'ঐচ্ছিক ধারার' তাৎপর্য্য হলো এই যে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাষ্ট্র অনুরূপ দায় গ্রহণ করলে 'ইচ্ছা' প্রকাশকারী (ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী) রাষ্ট্র বিচারালয়ের এক্তিয়ার সর্বৈবই মেনে নেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে এর ফল হয়েছে বিপরীত। বিভিন্ন রাষ্ট্র 'ঐচ্ছিক ধারা' সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিছু বিষয় ব্যতিরেক হিসাবে (এই সমস্ত সংরক্ষিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ার থাকবেনা) রেখেছে। দেখা যায় যে, এই ধরণের ব্যতিরেককে (সংরক্ষিত এলাকা) হয় নির্দিষ্টকৃত প্রশ্নাদি সম্পর্কে করা হয়েছে অথবা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে (যেমন, 'সর্বতোভাবে আভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারভুক্ত প্রশ্নাদি সম্পর্কে' আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কোন ক্ষমতা থাকবেনা)। উভয় ধরণের ব্যতিরেক (সংরক্ষিত এলাকা) নির্ধারণ করার মালিক সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র নিজেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ঐচ্ছিক ধারা' সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেও আভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়াদি ব্যতিরেক হিসাবে (অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রশ্নে বিচারালয়ের কোন ক্ষমতা থাকবেনা) সংরক্ষিত রেখেছে। বৃটেন নূতন নূতন বিষয়কে ব্যতিরেক হিসাবে (সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে) রাখার অধিকার সংরক্ষিত রেখেছে। এর ফলে মহাসচিবকে সংবাদ প্রদানসাপেক্ষে বৃটেন যেকোন সময় যেকোন বিষয়কে (যেসমস্ত বিষয় সম্পর্কে মামলায় বৃটেন শরিক হতে পারে) আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ার বহির্ভূত (সংরক্ষিত) রাখতে পারে। সন্দেহ নেই যে, বিভিন্ন বিষয়কে সংরক্ষিত রাখার (বিচারালয়ের এক্তিয়ার বহির্ভূত) ব্যবস্থার ফলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় এর পূর্বসূরীর মত দুর্বল হয়েছে। একথা ঠিক যে, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আস্থা ইদানীংকালে হ্রাস পেয়েছে। এই উক্তির সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, 'স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের' সময় পঁয়তাল্লিশটি দেশ 'ঐচ্ছিক ধারার' শরিক হলেও 'আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের' ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সংখ্যা উনচল্লিশেই সীমাবদ্ধ।

বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দুর্দশার কারণ উক্ত বিচারালয়ের প্রতি রাষ্ট্রসংঘের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্রসংঘ বিচারালয়ের সম্মুখে মামলার শরিক হিসাবে উপস্থিত হতে না পারলেও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের আইন-বিষয়ক বিবাদের ক্ষেত্রে এবং চার্টারের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত অসংখ্য প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক বিচারা-

লয়ের উপদেশমূলক অভিমতের (Advisory Opinion) জন্য অনুরোধ করতে পারে। কিন্তু এই সুযোগ যতখানি গ্রহণ করা যেত, রাষ্ট্রসংঘ তা' করেনি। যেসমস্ত প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘ বিচারালয়ের উপদেশমূলক অভিমত চেয়েছে, তার কিছু হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ 1949 খৃষ্টাব্দের 'ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার' (Reparation for Injuries Case) কথা বলা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে আন্তর্জাতিক বিচারালয় অভিমত দেয় যে, রাষ্ট্রসংঘের কর্তব্যে নিযুক্ত থাকাকালীন কোন ব্যক্তি আহত হলে বা প্রাণ হারালে রাষ্ট্রসংঘ দায়ী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। যেসমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উপদেশমূলক অভিমত চেয়েছে, তার দুটি হচ্ছে সদস্যপদদান সংক্রান্ত এবং চারটি হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সংক্রান্ত (পূর্বেই দেখা গেছে যে, এবিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা বিচারালয়ের অভিমতে কর্ণপাত করেনি)। চার্টারের 17 (2) নম্বর ধারার ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্নে 1962 খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক বিচারালয় অভিমত দেয় যে, 'কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘ-বাহিনী (ONUC) এবং রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীর' (UNEF) খরচ রাষ্ট্রসংঘেরই খরচ বলে ঐ খরচের টাকা সদস্যরাষ্ট্রসমূহ-কর্তৃক দেয়। অবশ্য আমরা আগেই দেখেছি যে (তৃতীয় অধ্যায়ে) বিচারালয়ের এই অভিমতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের নিরসন সম্ভব হয়নি। আলবেনিয়া ও বৃটেনের বিবাদের (কোর্ফু খালে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজের উপর আলবেনিয়াকর্তৃক গুলীবর্ষণজনিত) নিষ্পত্তির জন্য নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়ার সুপারিশ করে এবং বিচারালয় বৃটেনের অনুকূলে রায় দিলেও আলবেনিয়া এখনও ক্ষতিপূরণের টাকা বৃটেনকে দেয়নি। অ্যাঙলো-ইরাণীয়ান কোম্পানীর জাতীয়করণ সংক্রান্ত বিবাদে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ার আছে কিনা তা' বিচারালয়কর্তৃক নির্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ স্বকীয় পদক্ষেপ (উক্ত বিবাদ মোকাবিলায়) স্থগিত রাখে। (শেষ-পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক বিচারালয় অভিমত দেয় যে, উক্ত প্রশ্নে বিচারালয়ের এক্তিয়ার নেই)। উপরিউক্ত ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উপর রাষ্ট্রসংঘ যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেনি। আইন দ্বারা (চার্টার দ্বারা) নিয়ন্ত্রিত হলেও রাষ্ট্রসংঘ আইনের প্রক্রিয়ার চেয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই স্বকীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথ বার বার বেছে নিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের এই পদ্ধতি সমস্ত রাষ্ট্রের

দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিছু সদস্যরাষ্ট্র আছে (বিশেষ করে ইউরোপীয়) যারা স্থিতাবস্থার প্রতি হুমকীস্বরূপ পরিস্থিতিসমূহের মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে আরও বেশী করে কাজে লাগানোর পক্ষপাতী। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণা হলো এই যে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তিতে বিচারালয়ের আশ্রয়গ্রহণ সবসময় বাঞ্ছনীয় নয়। এরকম ধারণা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। এই সমস্ত রাষ্ট্র স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত না হলেও মনে করে যে, আন্তর্জাতিক আইনের কাজ হচ্ছে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। ফলে সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে মাত্র গোটাপাঁচেক দেশ ঐচ্ছিক ধারার' শরিক হয়েছে। আর যা-ই হোক, আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য এসমস্ত রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়নি। একথা বলা যেতে পারে যে, পরিবর্তনশীল বর্তমান জগতে (যেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ও কৃষ্টিগত পশ্চাৎপট ভিন্ন ভিন্ন) বিভিন্ন প্রশ্ন নিরসনে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উপযোগিতা সন্দেহাতীত নয়। বরং বলা চলে যে, সর্বতোভাবে রাজনৈতিক ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে খুব বেশী টেনে আনলে বিচারালয়কে সাধারণ সভার অধীনস্থ বিচার-বিভাগীয় যন্ত্রে পরিণত করে ফেলার সম্ভাবনা থাকতো। এধরণের ভয়বশতঃই 1966 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক বিচারালয় দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাণ্ডেট সংক্রান্ত প্রশ্নে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার প্রশ্নে লাইবেরিয়া ও ইথিওপিয়ার অধিকার অগ্রাহ্য করে। উক্ত প্রশ্নে লাইবেরিয়া ও ইথিওপিয়ার আবেদন গ্রাহ্য করলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় হয়তো বিচক্ষণতার পরিচয় দিত, তবে এও ঠিক যে, তাতে কিছু সদস্যরাষ্ট্রের চোখে বিচারালয়ের ভাবমূর্তি আরও ম্লান হয়ে যেতো।

সপ্তম অধ্যায়

সচিবালয়

অনেকে মনে করেন যে, ওয়েস্টমিন্স্টারের সাথে হোয়াইট হলের যেরকম সম্পর্ক, রাষ্ট্রসংঘের সাথে ভূগর্ভে ত্রিতলসহ আটত্রিশতলবিশিষ্ট সচিবালয়েরও সেই সম্পর্ক। তবে, এই তুলনা বেশীদূর টানা বিপজ্জনক। নয়হাজার বা তার বেশী সভ্য নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের অসামরিক কর্মীবাহিনী গঠিত যার মধ্যে চারহাজারের কিছু বেশী নিউইয়র্ক শহরেই কাজ করেন। কিন্তু, তাঁদের কাজের প্রকৃতি ও পরিবেশ অনেকাংশেই এত স্বতন্ত্র যে বেশীর ভাগ দেশের আমলাতন্ত্রের সংগে এর তুলনা হয় না।

মোটামুটিভাবে বলতে হয়, রাষ্ট্রসংঘের ছয় ধরণের কাজ আছে। প্রথম কাজটি হলো পরিষদীয় করণিকের মত, তবে কাজের পরিধি অনেক ব্যাপক, বহুভাষাপূর্ণ সংসদের মধ্যে যা' হয়। যেমন, ব্যাখ্যা, অনুবাদ করা, সভার কার্য্যবিবরণী রাখা ও খসড়া রচনা, মূলদলিল পুনর্মুদ্রন, গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধাদান। এছাড়াও আছে উচ্চপর্য্যায়ের আইনগত ও পদ্ধতিগত সাহায্য যা' লিখিত দলিল থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির প্রয়োজন হয়। পরিষদীয় কর্মীদের বেশীর ভাগ অংশ ব্যাখ্যা ও অনুবাদের কাজে নিযুক্ত থাকেন। এবং যখন সাধারণ সভার অধিবেশন হয় তখন তাঁদের চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। সর্বোপরি, সচিবালয়ের এক-চতুর্থাংশেরও বেশী কর্মী একভাবে না একভাবে রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলন সম্পর্কিত কাজে সাহায্য করেন।

প্রথম কাজটির সংগে দ্বিতীয় কাজটির পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম, প্রায় ধরাই যায় না। দ্বিতীয় কাজটি হলো তথ্য সরবরাহ। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনের সফল পরিচালনার জন্য প্রতিনিধিবর্গ, বিভিন্ন সমিতি ও কমিশনের প্রচুর কারিগরী ও অন্যান্য তথ্যাদি প্রয়োজন হয়। একথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও অছি পরিষদের মত বিশেষ ধরণের সংস্থার ক্ষেত্রেও সত্য এবং অনেকাংশে সাধারণ সভার কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তাছাড়া, আমরা লক্ষ্য করেছি, তথ্য সংগ্রহ করা ও তার সর্বতো প্রচারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রসংঘ সম্মেলন-কক্ষের বাইরে পৃথিবীর মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলে। সংবাদ সংগ্রহ, সাজানো এবং যেখানে সবচেয়ে প্রয়োজন এবং কার্য্যকরী সেখানে সংবাদ পরিবেশন করাই রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্যতম। এই কাজ মহাফেজখানার সংরক্ষক ও পরিসংখ্যানবিদের কাজের থেকেও বেশী। এটা গভীরভাবে রাজনৈতিক এবং এতে আছে রাজনৈতিক জ্ঞান, দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী ও নিষ্ঠার সমন্বয়। রাষ্ট্রসংঘের কোন একটি বিভাগ সম্পূর্ণভাবে এই কাজে যুক্ত নয়, এটা বরং অছি পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও আইন দপ্তরের (Office of Legal Affairs) বিশেষ দায়িত্ব।

যেকোন দেশের আমলাতন্ত্রের থেকে রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাজ অনেক কম। কারণ, স্পষ্টতঃই রাষ্ট্রসংঘ সরকার নয়। সচিবালয়ের কিছু কিছু সেবামূলক কাজের মধ্যে কারিগরী সাহায্য ও প্রাক্-বিনিয়োগ সাহায্য (Pre-investment Aid) পরিচালনার কাজই বেশী। যদিও কারিগরী সাহায্যদানের কর্মসূচী খুবই ছোট করে শুরু হয়েছিল, প্রেসিডেণ্ট ট্রুমানের প্রেরণায় স্বষ্ট 'চারদফা' (Point Four) কর্মসূচী অনুযায়ী 1949 খৃষ্টাব্দে এই কর্মসূচী উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্যদানে বৃহৎ আকার ধারণ করে। আগে কারিগরী সাহায্য-দানের আদি কর্মসূচী (Original Technical Assistance) থেকে কারিগরী সাহায্যদানের বর্দ্ধিত কর্মসূচীর (Expanded Technical Assistance Programme) পার্থক্য করা হতো। বস্তুতঃ পরবর্তী সংস্থাই কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এর বাৎসরিক ব্যয় পাঁচ কোটি ডলারে এসে পেঁছিয় এবং এই অঙ্ক রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ বাজেটের অংশ নয়। এর ব্যয় রাষ্ট্রসংঘের সভ্যরাষ্ট্রসমূহের, মূলতঃ বৃহদাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিপূরক ঐচ্ছিক দানে নির্বাহ হয়। রাষ্ট্রসংঘ নিজে এই টাকার 20/25 শতাংশের বেশী ব্যয় করেনা। বাকী অংশ বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ ব্যয় করে।

রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যে মূলধন বিকাশের জন্য দীর্ঘদিনের দাবী আংশিক-ভাবে পূরণের উদ্দেশ্যে 1958 খৃষ্টাব্দে "অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ তহবিল" গঠিত হয় (U. N. Special Fund for Economic Development)। এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মূলধন বিনিয়োগের

জন্য অর্থপ্রদান নয়। প্রাক-বিনিয়োগ পর্বে সাহায্যদান—যথা, গবেষণা-মূলক কাজে সাহায্য, জরিপ, প্রশিক্ষণের সুযোগদান—যার ফলে অন্যান্য স্থান থেকে বৃহৎ আকারে বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। পল হফ্‌মানের (Paul Hoffman) নেতৃত্বে এই সংস্থা নির্দ্বিধায় এই তহবিল কিভাবে কোথায় ব্যবহৃত হবে তা' বিশেষজ্ঞ দ্বারা নির্ধারণ করার জন্য জোর দেয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত ও অর্ধেক উন্নয়নশীল দেশের ও অর্ধেক শিল্পোন্নত দেশের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত 18 জনের নিয়ন্ত্রণ সমিতির ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা আছে, কিন্তু কোন স্বকীয় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা নেই। "কারিগরী সাহায্যদানের বর্দ্ধিত কর্মসূচী"র মত এই সংস্থার তহবিল (বাৎসরিক 90 কোটি ডলারের উপর) ঐচ্ছিক দাতাদের থেকে সংগৃহীত। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী, প্রায় 40 শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে থাকে।

1965 খৃষ্টাব্দে এই দুটি কর্মসূচী, "কারিগরী সাহায্যদানের বর্দ্ধিত কর্মসূচী" ও "বিশেষ তহবিল", "রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী"তে (United Nations Development Programme) একত্রিত হয়। এর প্রশাসক হন হফ্‌মান এবং সহ-প্রশাসক হন ডেভিড আওয়েন। হফ্‌মান পনেরো বছর এই কারিগরী সাহায্য কর্মসূচী পরিচালনা করেছেন। এই দুটি কর্মসূচী যথেষ্ট স্বাতন্ত্র বজায় রাখে যাতে যেকোন সরকার ইচ্ছামত যেকোন সংস্থাকেই সাহায্য করতে পারে, কিন্তু এদের একটিই সচিবালয় ও নিয়ন্ত্রণ সমিতি। নিয়ন্ত্রণ সমিতির বৈঠক বছরে দুবার বসে। সাঁইত্রিশজনের এই সমিতি উন্নয়নশীল ও উন্নতদেশের মধ্যে প্রায় সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকর্তৃক নির্বাচিত। (প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশের দিকেই পাল্লা ভারী)। বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়সাধন একটি আন্তঃসংস্থা পরামর্শদাতা পর্ষৎ এবং প্রতিটি সাহায্যগ্রহণকারী দেশে রাষ্ট্রসংঘের একজন আবাসিক প্রতিনিধি মারফৎ সাধিত হয়। এই কর্মসূচীতে বাৎসরিক 35 কোটি ডলার লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধরা হয়েছে।

এই সংগঠনগুলির কাজের দায়িত্ব শুধু ব্যয়িত টাকার অঙ্কে হিসাব করা উচিত নয়, বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এ অঙ্ক অত্যন্তই সামান্য। যদিও এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সীমিত, এই সংগঠনগুলির নিজস্ব গুরুত্ব সমধিক এবং এগুলিই হলো শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় (আসলে নেতিবাচক ও সাধারণভাবে নিবারণমূলক) রাষ্ট্রসংঘের ইতিবাচক ও সৃজন-

শীল সম্ভাবনা বিকাশের ভিত্তি। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারীরা এর প্রত্যক্ষ ও ইতিবাচক ভূমিকার জন্য সন্তুষ্ট যার থেকে এই সংগঠনের অন্যান্য অংশের কর্মচারীরা প্রায়ই বঞ্চিত। অপরদিকে, ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে তর্কাতর্কি সত্ত্বেও, উন্নয়নমূলক কাজ, বিশেষ করে দুর্বলতম সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদকে দূর করতে সাহায্য করে। কঙ্গোতে কারিগরী সাহায্যদান কর্মসূচী ছাড়া রাজনৈতিক ত্রাণকার্য্য সম্পাদন অসম্ভব ছিল। এবং সেই সমস্ত কারিগরী সাহায্যের ফলে কিছু কিছু সুবিধা পাকাপাকিভাবেই হয়েছে, যদিও কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের রাজনৈতিক ভূমিকার সাফল্য সম্পর্কে জোর করে কিছু বলা যায়না।

রাষ্ট্রসংঘের আঞ্চলিক কর্মীবাহিনী (U. N. Field Service) এক ভিন্ন ধরণের আধা-প্রশাসনিক কাজ করে। 1949 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের কর্মচারীসংখ্যা সাধারণ সভার প্রস্তাবক্রমে তিনশোর বেশী হতে পারেনা। এটি একটি উর্দি-পরিহিত অথচ নিরস্ত্র কর্মীবাহিনী। এই কর্মীবাহিনীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এঁরা বিশেষ ক্ষেত্রে পার্শ-অস্ত্র (Side arms) রাখতে পারেন। যানবাহন সরবরাহ, যোগাযোগ রক্ষা এবং রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত কমিশনগুলির নিরাপত্তা দেখাশোনা করাই হচ্ছে এই সংগঠনের কাজ। এঁরা নিজেরা পর্য্যবেক্ষণ ও সামরিক শান্তিচুক্তি তত্ত্বাবধান জাতীয় কাজ করেননা, রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সংস্থা যেগুলি একাজে নিযুক্ত তাদের সাহায্যের জন্য এঁরা সর্বদা প্রস্তুত।

বিভিন্ন জাতীয় প্রশাসনের কর্ণধার হিসাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনসমক্ষে তাঁদের নীতি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনে সর্বদা রাষ্ট্রসংঘের তথ্য-সরবরাহ বিভাগের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রসংঘ (যার নিজস্ব উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য কোন মন্ত্রীসভা নেই অথচ যাকে বিশ্বব্যাপী নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে পৌঁছতে হয়) প্রথম থেকেই ঠিকই বুঝেছিলো যে এর নিজস্ব একটি বিশাল তথ্য-সরবরাহ বিভাগ প্রয়োজন। যখন রাষ্ট্রসংঘের বাজেটের শতকরা 18 ভাগ এই বিভাগে ব্যয়িত হতো, তখন সত্যিই এই ব্যয় নিঃসন্দেহেই বেশী ছিল। যদিও রাষ্ট্রসংঘের নির্বাচক-মণ্ডলী পৃথিবীব্যাপী এবং রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যপ্রার্থী জনসাধারণ বৈচিত্র্যময় তবুও এমন কিছু কৃপণ ব্যক্তি আছেন যাঁরা মনে করেন যে তথ্য-সরবরাহ বিভাগের বাৎসরিক 60 থেকে 70 লক্ষ ডলারের বাজেট অত্যধিক। তাছাড়া, অনেক বিষয় সম্পর্কেই যখন এমন সংবাদ দিতে

হয় যা' অনেক সদস্যরাষ্ট্রের কাছেই তিক্ত এবং যা' কার্য্যতঃ সেই সব দেশে নিষিদ্ধ হয়—যেমন 1957 খৃষ্টাব্দের হাঙ্গেরীর উপর প্রতিবেদন নিষিদ্ধ হয়েছিল। গণতন্ত্রে তথ্য-সরবরাহ-ব্যবস্থা পরিচালনার সঙ্গে যথার্থ দক্ষতার সমস্ত মাপকাঠি রক্ষা প্রায় অসম্ভব। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ সমিতির (সোভিয়েৎ প্রতিনিধি-সম্বলিত) 1958 খৃষ্টাব্দে কৃত বহু সুপারিশ এই ভুলের জন্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। একথা সহজেই অনুমেয় যে তথ্য সরবরাহ দপ্তরের বেশীর ভাগ কাজই সদর-দপ্তরে সেবাপ্রার্থী দেশগুলির প্রচণ্ড চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত। একথাও ঠিক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারবিভাগ যতটা আন্তরিকতা ও ব্যাপকতার সাথে রাষ্ট্রসংঘের সংবাদ-প্রদান করে তা' অন্য কোন দেশের প্রচারবিভাগের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রচারবিভাগগুলিকে এবং জনমতকে রাষ্ট্রসংঘের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করানোই এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এরই পদক্ষেপ হিসাবে, পঞ্চাশের বেশী আঞ্চলিক তথ্য-সরবরাহ সংস্থা প্রতিষ্ঠা সাদরে গ্রহণীয়, যদিও প্রায় দেড়শো সভ্যরাষ্ট্র অধ্যুষিত এই সংস্থার পক্ষে এই সংখ্যা কোন অর্থেই বেশী নয় এবং এগুলির কর্মচারী নিয়োগ এবং কাজের পরিধি অযৌক্তিকভাবে বেশী নয়।

প্রশাসকবর্গদের পরিচালনা অন্যান্য সংস্থার মত রাষ্ট্রসংঘেরও একটি অতিরিক্ত এবং অপরিহার্য্য কাজ। বৃটিশদের মাপকাঠি অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের পরিধি অন্যান্য দেশের সরকারীবিভাগগুলি থেকে খুব বেশী বড় নয় এবং বিদেশের অন্যান্য জায়গায় পরিব্যাপ্ত হওয়ায় (যেমন জেনেভায়) কোন বিশেষ প্রশাসনিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। যেসমস্ত প্রশাসনিক অসুবিধা দেখা দিচ্ছে সেগুলি বাস্তব হলেও অনেকটা রাষ্ট্রসংঘের উৎপত্তির পরিস্থিতি ও প্রকৃতির জন্যই হয়েছে। 1945 এবং 1946 খৃষ্টাব্দে সচিবালয়কে প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে তৈরী করতে হয় এবং তখন দেশে দেশে দক্ষ প্রশাসকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অনেক কম ছিল। প্রয়োজন, তাড়া-হুড়া ও প্রবল উৎসাহে রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারী নিয়োগ এত দ্রুত সম্পাদন হয়েছিল যে স্বভাবতঃই কর্মচারীদের গুণগতযোগ্যতা পরিমাণের বেদীতলে বলি হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে, এই সংস্থায় আমেরিকার মত সংকীর্ণ কর্মবিভাজন ও বিশেষায়ণের নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক সময় বাজে, নিরর্থক বিশেষজ্ঞবাদে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং সার্বিক যোগ্যতা-সম্পন্ন প্রশাসক নিয়োগকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যদিও এই ব্যবস্থার কুফল কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ সংস্থার মত রাষ্ট্রসংঘের উপর

তেমন পড়েনি, তবুও জাতিপুঞ্জের সচিবালয়ের তুলনায় রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ের খানিকটা বদনাম হয়েছিল। এধরণের প্রারম্ভিক অসুবিধা নিরসনে প্রচুর সময় লাগে এবং 1950-53 খৃষ্টাব্দের মাক্‌কার্থীয় চাপে কর্মীবাহিনীর নৈতিক পেষণের ফলে অবস্থা আরো ঘোরালো হয়েছিল। এখন অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে পূর্বের ভুলের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সময়ের স্রোতে ও প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে দূর করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ের আরো অনেক সংস্কারের নিশ্চিত সুযোগ আছে এবং সচিবালয়ের কর্মীদের যেধরণের উঁচুমানের নীতিবোধ বাঞ্ছনীয় তা' হ্রাস পেয়েছে। গুণগত বৈচিত্র্যের দিক থেকে দেখতে গেলে রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ের সাথে পাল্লা দেওয়া কোন দেশের আমলাতন্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ের কর্মী হিসাবে একেবারে নিষ্কর্মা থেকে শুরু করে উঁচুমানের কূটনীতিবিদ ও সুদক্ষ প্রশাসকের সমাবেশ হয়েছে। আকস্মিকভাবে উদ্ভূত কোন গুরুতর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার যোগ্যতা রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারীদের প্রশংসনীয়ভাবেই আছে এবং একথার সমর্থনে 1960 খৃষ্টাব্দে কঙ্গোর ত্রাণকার্য্যে তাঁদের ভূমিকার কথা বলা যেতে পারে। বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার দিক থেকে দেখতে গেলে সচিবালয়ের কর্মচারীবৃন্দের যোগ্যতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রশ্নকে উপেক্ষা করাও অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে চার্টারের 101 নম্বর ধারার উল্লেখ করা যেতে পারে—'কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণের ব্যাপারে উচ্চতম মানের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং সততার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনই মূখ্য বলে বিবেচিত হবে। সম্ভাব্য বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকা থেকে কর্মচারী নিয়োগের গুরুত্বের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখা হবে।'

এই ধারার শব্দবিন্যাস যোগ্যতা এবং অঞ্চলগত প্রতিনিধিত্বের নীতির গুরুতর সংঘাতকে এড়িয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কিছুটা নমনীয়তা গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে যেখানে সম্ভব সংশ্লিষ্ট কর্মকেন্দ্রের দেশ থেকে কেরাণী ও উর্ধতন কর্মচারীদের এবং কারিগরী শিক্ষার ভিত্তিতে ভাষাগতপদগুলিতে নিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। এ ব্যবস্থায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রকৃত্যকের (Civil Service) মত 3,500-এর বেশী আন্তর্জাতিক অসামরিক কর্মীবৃন্দ নিয়োগের অবকাশ হয়েছে। মহাসচিব এই কর্মচারী নিয়োগে প্রচণ্ড চাপের বিরুদ্ধে একটি সূত্র দ্বারা পরিচালিত হন। এই সূত্র অনুযায়ী সদস্যরাষ্ট্রের দেয় টাকার শতকরা হিসাবে (25 শতাংশ ছাড় সহ) কর্মচারী নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অনেক সময় এই নীতি গ্রহণের ফলে এমন অনেক

লোককে নিয়োগ করা হয়েছে যাঁদের ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। তবে আশার কথা এই যে পদোন্নতির ও নিয়োগের প্রশ্নে ভৌগোলিক বিবেচনাকে এখন আগের মত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছেনা। অন্যথায় জাতীয় রাজনীতির প্রতাপে সচিবালয়ের আন্তর্জাতিক চরিত্র নষ্ট হতো এবং তা' সচিবালয়ের কর্মচারীদের মনোবলের পক্ষে অশেষ হানির কারণ হতো। তার অর্থ এই না যে প্রত্যেক কর্মচারীর আমৃত্যু কার্য্যকাল থাকবে, যদিও তাঁদের অনেককেই আমৃত্যু দরকার রয়ে গেছে। তবুও সচিবালয়ে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং স্বল্পকালস্থায়ী চুক্তির মাধ্যমে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদপূরণের বাঞ্ছনীয়তা অনস্বীকার্য্য। এটা অবশ্য এখন করা হচ্ছে এবং এর ফলেই কিছু কিছু দক্ষ লোক, যাঁরা পাকাপাকি-ভাবে কখনও আসতে রাজী হতেন না, রাষ্ট্রসংঘের চাকুরীতে আসতে পারছেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বিবেচনাকে আঁকড়ে থাকলেও অবশ্য এটা সম্ভব হতো না। ভৌগোলিক বিবেচনা খানিকটা হানিকর হলেও একথা ঠিক যে একটা আন্তর্জাতিক কৃত্যকে বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নকে সর্বৈব উপেক্ষা করা যায়না এবং তা' করা উচিতও নয়। কারণ রাষ্ট্রসংঘের যেকোন কর্মচারীর দ্বৈত ভূমিকা আছে। একদিকে তাঁকে রাষ্ট্রসংঘের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ হতে হবে, অন্যদিকে তাঁর দেশের নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের কাজে তাঁর দেশের কৌশল, অভিজ্ঞতা এবং যোগাযোগকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ সভ্যরাষ্ট্রসমূহের সহায়তায় রাষ্ট্রসংঘকে এগিয়ে যেতে হবে এবং এজন্যই রাষ্ট্রসংঘের যেকোন কর্মচারীকে তাঁর দেশ ও রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারীর এবং দোভাষীর ভূমিকায় কাজ করতে হবে। কোন আন্তর্জাতিক কৃত্যকের দিক থেকে দেখতে গেলে স্বদেশের প্রতি আকর্ষণহীন (এতে অবশ্য বাস্তুহারা অথবা বহিস্কৃতদের কথা বলা হচ্ছেনা) কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তায় সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যে নৈতিক পরিচয়হীনতা ঘটতে পারে তাকে একটা পেশাগত ঝামেলা হিসাবে অনুভব করার দায়িত্ব যেকোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের কর্মচারীর রয়ে গেছে। নিউইয়র্ক শহর আন্তর্জাতিকতার দিক থেকে ব্যাপকতার জন্য এবং যেকোন আগন্তুককে সহজেই নিজের জীবনপ্রবাহের সাথে এক করে ফেলার বিশেষ ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত হওয়ার ফলে সেখানে রাষ্ট্রসংঘের কেন্দ্রীয়-দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা এজন্যই বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ের কর্মচারীবৃন্দের যে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক ভূমিকা আছে, এবারে সেকথা বলার পালা। যেকোন গণতন্ত্রে অসামরিক কর্মচারীকে কিছু কিছু রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়—যুক্তির সাহায্যে অপরকে বোঝানো, আলোচনার ভিত্তিতে চুক্তি করা, বিতর্ক করা, জনমত সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা, কোন বিস্ফোরক পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার আগেই সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া—সবই তাঁকে করতে হয়। তবে তাঁকে সামনের সারিতে থেকে এসব করতে হয়না, কারণ সামনের সারিতে থাকেন খোদ রাজনীতিবিদ্, অর্থাৎ মন্ত্রী স্বয়ং। রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারীকে এমন এক গণতন্ত্রের মধ্যে কাজ করতে হয় যেখানে সংখ্যা-গরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠরা গ্রহণ নাও করতে পারে। জাতীয় গণতন্ত্রের মত তাঁর সামনে কোন মন্ত্রী থাকেননা। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর অবস্থা আরো ঘোরালো কারণ রাষ্ট্রসংঘে শতাধিক লোক মন্ত্রীর মত তাঁদের হুকুম করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতারত। শেষোক্ত কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘে প্রায়শঃই শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সে শূন্যতা পূরণ করতে হয় সচিবালয়ের কর্মচারীকেই। অথচ মজার কথা এই যে নীতিগ্রহণের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হলেও তাঁকে ভান করতে হয় যে তিনি এধরণের কিছুই করছেন না। অবশ্য সচিবালয়ের কিছু কিছু স্তরে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধাক্কা বড় একটা লাগেনা। কিন্তু শতাধিক রাষ্ট্রের মধ্যের জটিল সম্পর্ক নিয়েই সচিবালয়ের মোটামুটি হাজারখানেক প্রশাসককে কাজ করতে হয়। যদিও একথা মহাসচিবের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য, তবুও এও সত্য যে মহাসচিবের দায়িত্ব সচিবালয়ের অন্য কর্মচারীদের উপরও ন্যস্ত হয় (যেমন হোয়াইট হলের কোন দপ্তরের সমস্ত কর্মচারীকেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দায়িত্বের বোঝা বইতে হয়) এবং কোন না কোন সময়ে সচিবালয়ের প্রত্যেক কর্মচারীকেই মহাসচিবের হয়ে কাজ করতে হয়।

মহাসচিবের পদ জাতিপুঞ্জের সময় থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। সনদে মহাসচিবের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা না থাকলেও জাতি-পুঞ্জের প্রথম মহাসচিব স্যার এরিক ড্রামণ্ডের সেসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি ছিলেন একজন বৃটিশ আমলা। বৈদেশিক দপ্তরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন যে তার পরামর্শ চাওয়া না হলে অথবা সনদের নীতিরক্ষার জন্য কিছু বলা দরকার না হলে মুখ খোলা

নিরর্থক। এবং সেই কারণে তাঁর পরামর্শ প্রায়শঃই চাওয়া হত। বলিষ্ঠ প্রশাসক হিসাবে তিনি লীগ সচিবালয়কে আন্তর্জাতিক চরিত্রসম্পন্ন করে তুলেছিলেন এবং একে ছোট ও দক্ষতাপূর্ণ রেখেছিলেন এবং চাপসৃষ্টিকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে অল্পই নতি স্বীকার করেছেন। পর্দার অন্তরালে থাকলেও তিনি একজন কর্মশক্তিপূর্ণ কূটনীতিবিদ্ ছিলেন। তিনি কখনও লীগ সভায় ভাষণ দেননি, একমাত্র লীগ পরিষদের প্রকাশ্য অধিবেশনে একটা বিশেষ সমিতির সম্পাদক হিসাবে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর বাৎসরিক প্রতিবেদনসমূহ তথ্যপূর্ণতার দিক থেকে আদর্শ হতো।

প্রথম থেকেই রাষ্ট্রসংঘের জন্য আরো বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মহাসচিবের কথা ভাবা হয়েছিল। রুজভেল্ট এমন একজনকে এই পদে আসীন দেখতে চেয়েছিলেন, যিনি হবেন 'বিশ্বনিয়ন্ত্রক'। যদিও জাতিপুঞ্জের পদবীই রাখা হয়েছে, নতুন মহাসচিব তাঁর পূর্বসূরীর থেকে অনেক বেশী দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 99 নম্বর ধারা বলে তাঁকে 'রাষ্ট্রসংঘের মুখ্য প্রশাসক' করা হয়েছে। তাছাড়াও 99 নম্বর ধারা অনুযায়ী তিনি বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক ক্ষমতায় ভূষিত হয়েছেন।

'মহাসচিব যেকোন বিষয়ের প্রতি, যা' তাঁর মতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকে বিঘ্নিত করতে পারে, নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন।' অন্যকথায়, রাষ্ট্রসংঘের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহাসচিবের সভ্যরাষ্ট্রগুলির মত সুযোগ রয়েছে। এবং 1945 খৃষ্টাব্দের 'প্রস্তুতি কমিশনের বিবরণী'তে বলা হয়েছে, এটি একটি বিশেষ ধরণের ক্ষমতা যা' এর আগে আন্তর্জাতিক সংস্থার কোন প্রধানকে দেওয়া হয়নি। বস্তুতঃ, তাঁকে বলা হয় বিশ্বের বিবেক এবং এই বিবরণীতে আরো বলা হয়েছে যে মহাসচিবই ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্রসংঘের একমাত্র প্রতিনিধি। পৃথিবীর কাছে, এমনকি তাঁর নিজের অধস্তন কর্মচারীদের কাছে তিনি রাষ্ট্রসংঘের চার্টারের নীতি ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

99 নম্বর ধারার বক্তব্য অনুসারে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদকেই অবহিত করবেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে চার্টার প্রস্তুতকারকগণ শান্তি রক্ষায় গুরুতর দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদকেই দিয়েছেন। কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি অবশ্য তিনি সাধারণ সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, যেমন 98 নম্বর ধারার বক্তব্য। তাতে আছে,

'রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যসম্পর্কে মহাসচিব সাধারণ সভার নিকট বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।'

বস্তুতঃ, সাধারণ সভায় বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশের মাধ্যমেই তিনি প্রচুর বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করে থাকেন এবং সাধারণ সভার কার্য্য-প্রণালী অনুযায়ী যেকোন প্রসঙ্গ সাধারণ সভার বিষয়সূচীর খসড়ার মধ্যে রাখতে পারেন। এবং 1947 খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি যেকোন সময় সাধারণ সভার বিবেচনাধীন যেকোন বিষয়ে মৌখিক ও লিখিত বিবরণী সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করতে পারেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষেত্রে মহাসচিবের যেধরণের ক্ষমতা রয়ে গেছে সেই ধরণের ক্ষমতা সাধারণ সভার ক্ষেত্রেও তাঁর আছে।

1960 খৃষ্টাব্দের কঙ্গো সংকটের আগে মহাসচিব কখনও 99 নম্বর ধারার পূর্ণ প্রয়োগ করেননি। (যদিও পরবর্তীকালে ট্রিগ্‌ভি লাই বলেছেন তিনি 1950 খৃষ্টাব্দে কোরীয়ার সংকটে এই ধারা ব্যবহার করেছিলেন এবং হ্যামারস্কশোল্ড বলেছিলেন যে আমেরিকা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নিলে তিনি 1956 খৃষ্টাব্দের সুয়েজ সংকটে এই ধারার আশ্রয় গ্রহণ করতেন)। আসলে বারবার যা' ঘটেছে (রাষ্ট্রসংঘ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চার্টারের যেমন ব্যবহার করেছে) তা'হলো এই ধারাগুলির এমন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যার ফলে মনে করা হয় যে এই ধারার বলে মহাসচিবের এমন রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে যা' তিনি তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি, সাহসিকতা এবং ধৈর্য্যশীলতা অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন। এই ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহাসচিবকে পরিচালনা করার জন্য কিছু কিছু নজির সৃষ্টি হয়েছে যার কিছু ভালো কিছু খারাপ। এবং ভালো নজিরের বশবর্তী হয়ে কাজ করে তিনি সাফল্যলাভ করেছেন এবং খারাপ নজির অনুসরণ করার ফল খারাপ হয়েছে।

এখন মনে হয় অনেকেই একমত যে মিঃ লাই মহাসচিবের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে বিবেচনার থেকে আবেগ দ্বারাই বেশি চালিত হয়েছিলেন। নিরাপত্তা পরিষদের জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই সোভিয়েৎ সৈন্য ইরাণ ত্যাগ করলে তিনি অসফলভাবে ইরাণ প্রশ্নকে পরিষদের বিষয়সূচী থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি 1947 খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইন বিভাগের পক্ষে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং 1948 খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনে আরব হস্তক্ষেপ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি 1950 খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যে সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির

জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং তারপরই তাঁর বহুপ্রচারিত দশদফা শান্তি কর্মসূচীর অনুকূলে সমর্থন আদায়ের জন্য পৃথিবীর রাজধানীগুলিতে গিয়েছিলেন। ঐ বছরই তিনি কোরীয় প্রশ্নে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন। যদিও আমেরিকার উদ্যোগেই 25শে জুন নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসেছিল, তবুও, মিঃ লাই-ই প্রথম উত্তর কোরীয়াকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং তাদের কাজকে আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকী বলে মনে করেন এবং ঐ অঞ্চলে শান্তি পুনরুদ্ধারের কাজে নিরাপত্তা পরিষদের যোগ্যতা ও দায়িত্বের উপর জোর দেন। এরপর তিনি আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নীতির সাথে অবিচলভাবে যুক্ত ছিলেন। এরই চরম পরিণতি হিসাবে সোভিয়েৎ গোষ্ঠী দৃঢ়ভাবে তাঁর বিরোধিতা করেছিল। এর ফলে (পরিষদ শান্তি স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিলেও এবং কোরীয় প্রশ্নে মহাসচিবের মত গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক) তাঁর পদের মর্য্যাদা যথেষ্ট খর্ব হয়েছিল। অবশ্য এরকম অবস্থায় সব মহাসচিবের একই অবস্থা হতো। এই পদের প্রকৃতিই এমন যে এর পদাধিকারীকে রাষ্ট্রসংঘের দিক এবং সভ্যরাষ্ট্রসমূহের দিক দুইই খেয়াল রাখতে হবে। যদি এক বা একাধিক সভ্যরাষ্ট্র চার্টার ভঙ্গ করে, মহাসচিবের কর্তব্য পরিষ্কার। কিন্তু, অনেক সময় আসে যখন ন্যায়ের পক্ষে মহাসচিবের পক্ষপাতিত্বকে আইনভঙ্গকারী সভ্যরাষ্ট্রের অনেকেরই অসহ্য মনে হয়।

শুরুতে মিঃ লাই-এর উত্তরাধিকারী ড্যাগ হ্যামারস্কশোল্ডের কপাল আরো ভাল ছিল। তিনি আরো বেশী প্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনি নির্বাচনের পরেই তাঁর পদের মর্য্যাদা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হওয়া প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করেন। আভ্যন্তরীণ দিক থেকে দেখতে গেলে তিনি তা' করেছিলেন সচিবালয়ের কার্য্যমান ও নৈতিক মান উন্নয়নের মাধ্যমে এবং সচিবালয়কে সভ্যরাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত রাখার মাধ্যমে (1952 খৃষ্টাব্দের দুর্দিনগুলিতে মিঃ লাই এই ব্যাপারে সর্বৈব ব্যর্থ হয়েছিলেন) এবং কূটনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে অকালে কোন ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ না করে ও কূটনৈতিক প্রশ্নে হৈ-চৈ-এর মধ্যে না গিয়ে। এই বিষয়ে রাজনীতিবিদ মিঃ লাই-এর থেকে তিনি ভাগ্যবান ছিলেন কারণ আমলা হিসাবে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা অনেক কাজে দিয়েছিল। ড্যাগ হ্যামারস্কশোল্ড ছিলেন একজন অর্থনীতিবিদ। সুইডিশ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হওয়ার পূর্বে

তিনি সুইডেন সরকারের অর্থবিভাগের অধস্তন সচিব ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি সুইডেন সরকারের পররাষ্ট্রবিভাগের মুখ্য আধিকারিক ছিলেন। সুইডেনের 'সোশাল ডেমোক্র্যাটিক' সরকারে অল্পদিনের জন্য দপ্তর-বিহীন মন্ত্রীত্ব সত্ত্বেও তিনি নিরপেক্ষতার ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন কারণ তিনি ঐ রাজনৈতিক দলের সভ্য ছিলেননা এবং কোন পদের জন্য তিনি কখনও নির্বাচনী প্রচারে নামেননি। এই গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও তিনি আরো ভাগ্যবান ছিলেন এই কারণে যে মহাসচিব হিসাবে তাঁর প্রথম দুবছরে রাষ্ট্রসংঘ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাতমুক্ত ছিল। এই কারণে তিনি উভয় দিক থেকেই আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন। পরে অবশ্য অবস্থার চাপে পড়ে অনেক বেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁকে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল।

1954 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সাধারণ সভার অনুরোধে চীন থেকে এগারোজন মার্কিন বৈমানিককে মুক্ত করে আনাই হ্যামারস্কশোল্ডের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ। 1955 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে উক্ত বৈমানিকেরা মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি কি করে এটা করেছিলেন তা সাফল্যের পূর্ব পর্য্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। এই সাফল্যের পর মহাসচিবের কূটনৈতিক সামর্থ্যের উপর নির্ভরতা বেড়েই চলেছিল। 1956 খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রাচ্যের বিশৃঙ্খলা উদ্বেগজনক হয়ে ওঠার সময় থেকেই হ্যামারস্কশোল্ড ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে রাষ্ট্রসংঘের সক্রিয় ভূমিকায় আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলেন এবং স্বভাবতই মধ্যপ্রাচ্যের লড়াইয়ের সাথে জড়িত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক সংঘাতও তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিঃ লাইএর তুলনায় তাঁর কাজকর্মের ধারা ছিল অনেক বেশী সূক্ষ্ম। যতখানি সম্ভব নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সাধারণ সভার মতানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ্যামারস্কশোল্ডের অন্যতম কর্মকৌশল ছিল। যখনই তিনি কোন খসড়া রচনা করতেন অথবা কোন বিষয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখতেন তিনি এমনভাবে শব্দবিন্যাস করতেন যাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহুবিধ স্বার্থের সাথে জড়িত জটিলতা এড়ানো সম্ভব হতো এবং তাঁর নিজস্ব কর্মস্বাধীনতার সুযোগও অক্ষত থাকতো।

1956 খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সাধারণ সভা এমন একটি অবস্থার সম্মুখীন হলো যখন সংগঠনের স্তম্ভস্বরূপ দুটি সভ্যরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স, আইনভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং নিরাপত্তা পরিষদের যেকোন নিবারণমূলক কাজে ভেটো প্রয়োগ করেছিল, তখন মহাসচিবের উপর

প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বনের দায়িত্ব এসে পড়লো। এই সংকটে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকায় তাঁর উদ্যোগ, মধ্যস্থতার কুশলতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা প্রয়োগের মধ্যদিয়েই মহাসচিবের পদের গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব। তিনি সাধারণ সভার কাছে অপরিহার্য্য ছিলেন এবং সাধারণ সভা একথা স্মরণে রেখেই তাঁর দায়িত্বের বোঝা অনুযায়ী তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছিল। তিনি যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা' অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সূক্ষ্ম ছিল। নিরাপত্তা পরিষদের দুটি স্থায়ী সভ্যরাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের বিপক্ষে কাজ করেছিল শুধু তাই নয় (তাদের সাথে ইসরাইলও ছিল); পরিষদের তৃতীয় স্থায়ী সভ্যরাষ্ট্র সোভিয়েৎ ইউনিয়নও শান্তিস্থাপন থেকে বিভেদ সৃষ্টিতেই বেশী উৎসাহী ছিল। এবং সর্বোপরি অনেকগুলি সভ্যরাষ্ট্র (আরব লীগ থেকে শুরু করে আরো অনেকে) এই সংকটকে উপনিবেশবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মনে করে অত্যন্ত ভীত এবং প্রচণ্ডভাবে সংবেদনশীল হয়ে পড়েছিল। বৃটেন ও ফ্রান্সকে তাদের অবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য, মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েৎ সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দূর করার জন্য এবং মিশর ও ইজরায়েলকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য রাষ্ট্রসংঘ পরিচালিত একটি সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। অথচ এমন সামরিক বাহিনীর কোন নজির ছিলনা; সোভিয়েৎ মতে এই বাহিনী ছিল বে-আইনী এবং মিশর ও ইজরায়েল যে এই বাহিনীকে ভালো চোখে দেখবে তারও সম্ভাবনা ছিলনা। সর্বোপরি, উদ্দেশ্যের দিক থেকে দেখতে গেলে এই বাহিনী গঠনে তৎপরতার প্রয়োজন ছিল।

পয়লা নভেম্বরের শেষ রাতে ক্যানাডার প্রতিনিধিদলের প্রধান মিঃ লেস্টার পিয়ারসন্ পরিশ্রান্ত সাধারণ সভায় রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী (UNEF) গঠনের প্রস্তাবের আভাষ দেন এবং মিঃ ডালেসের কাছ থেকে আমেরিকার সাহায্য সম্পর্কে আশ্বাস দেন। 2রা নভেম্বরের দুপুরে পিয়ারসন্, মহাসচিব ও তাঁর প্রশাসনিক সহকারী মিঃ করডিয়ার বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য ও চার্টারের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন একটি সামরিক বাহিনী গঠনের মোটামুটি পরিকল্পনা করে ফেলেন। পরে 3রা-4ঠা নভেম্বরের রাত্রে সাধারণ সভা 57—0 ভোটে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে (মিশর এবং সোভিয়েৎ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি ভোটদান থেকে বিরত ছিল)। প্রস্তাবে মহাসচিবকে 48 ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী গঠনের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করতে বলা হয়।

4ঠা নভেম্বরের সকালে হ্যামারস্কশোল্ড ক্যানাডা, নরওয়ে, কলোম্বিয়া

ও ভারতের প্রতিনিধিকে নিয়ে সাধারণভাবে পরিকল্পনার জন্য এক সভায় মিলিত হন। তারা একমত হন যে ক্যানাডার মেজর জেনারেল ই, এল, এম, বার্নসের নেতৃত্বে 'রাষ্ট্রসংঘের সামরিক বাহিনী' গঠিত হবে। বার্নসই প্যালেস্টাইনে 'যুদ্ধবিরতি পরিদর্শন' সংগঠনের প্রধান ছিলেন। প্রাথমিকভাবে উক্ত সংগঠন থেকে অল্পসংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মী নিয়োগ করে পরে মহাসচিবের সংগে পরামর্শক্রমে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সভ্যরাষ্ট্রগুলি থেকে আরো সৈন্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত হয়। এই পরিকল্পনা ঐদিন রাতেই সাধারণ সভায় পেশ করা হয় এবং আগের প্রস্তাবের মত এই পরিকল্পনাও 57—0 ভোটে গৃহীত হয়। (পরের দিন মিশর এই প্রস্তাবে তার সম্মতির কথা জানায়)। এই প্রস্তাবের শেষাংশক্রমে মহাসচিবকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সমস্ত খুব তাড়াতাড়ি কার্য্যকর করা হয়। মিঃ বার্নসের নেতৃত্বে বাহিনী গঠন করতে দেরী হয়নি। রাষ্ট্রসংঘের অধস্তন সচিব ডঃ রাল্‌ফ্ বান্‌শ্ প্যালেস্টাইনে সালিশীর ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং তাঁকেই 'রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী' গঠনকল্পে বিভিন্ন সভ্যরাষ্ট্রকর্তৃক দেওয়া সৈন্যদের গ্রহণ করা ও উক্ত সৈন্যদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সমস্ত করা সচিবালয়ের পক্ষে সহজ ছিল না। চব্বিশটি সভ্যরাষ্ট্র সৈন্য দিতে চেয়েছিল; কিন্তু স্পষ্টতঃই মাত্র কয়েকটি দেশের পক্ষেই এই ধরণের জটিল অবস্থায় সৈন্যদান করা সম্ভব ছিল। এই বাহিনী দশটি দেশের সৈন্য নিয়ে গঠন করা হয়েছিল। অন্যান্য দেশের সৈন্য প্রত্যাখ্যান করতে অত্যন্ত কূটনৈতিক কুশলতার পরিচয় দিতে হয়েছিল। মোটামুটি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই হ্যামারস্কশোল্ডের দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়ে যায়। নভেম্বর মাসের 6 তারিখের সকালে সাধারণ সভায় এই প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এর মধ্যে অনেকগুলি সুদূরপ্রসারী নীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। সাংবিধানিক দিক থেকে দেখতে গেলে সেগুলির প্রচলন সাধারণ সভারই করার কথা। বাস্তবতঃ, সাধারণ সভাকে ঐক্যমতে পৌঁছতে অনেক বিতর্ক করতে হতো যা' তখন অসম্ভব ছিল এবং এতে অনেক বিদ্বেষের সৃষ্টি হতো যার ফলে উক্ত প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্য মাঠে মারা যেত। মহাসচিবের এই প্রতিবেদন পেশ করার পর তা' সহজেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 64—0 ভোটে গৃহীত হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে এর মূল বক্তব্য ছিল যে 'রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী'কে মিশরের উপর চাপসৃষ্টির জন্য ব্যবহার

করা হবেনা। এই বাহিনী মিশরের সম্মতিক্রমেই মিশরে প্রবেশ করবে। এর কোন সামরিক উদ্দেশ্য বা কাজ থাকবে না। যুদ্ধরত দুই বাহিনীর মাঝখানে থাকাই হবে এর একমাত্র কাজ। হ্যামারস্কশোল্ড পরিকল্পনা দেন যে এই বাহিনীর খরচ বহনের জন্য সৈন্যদানকারী দশটি দেশের প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা ও সৈন্যদের মাহিনা দেবে এবং অন্যান্য খরচ সকল সভ্যরাষ্ট্রকর্তৃক দেয় একটি বিশেষ চাঁদা মারফৎ বহন করা হবে। এবং পরিশেষে হ্যামারস্কশোল্ড প্রস্তাব দেন যে সাধারণ সভা একটি ছোট উপদেষ্টা সমিতি গঠন করুক যে সমিতি রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর কর্মরত অবস্থায় মহাসচিবকে উপদেশ দেবে।

সাধারণ সভা আগের মত 7ই নভেম্বরের প্রস্তাবেও মহাসচিবকে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করে। মহাসচিবকে উপদেষ্টা সমিতির সঙ্গে আলোচনার পর রাষ্ট্রসংঘের এই বাহিনীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সমস্ত নিয়ম ও নির্দেশ জারীর এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ অবলম্বন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। যে মুহূর্তে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় হ্যামারস্কশোল্ড আনুষ্ঠানিক-ভাবে মিশরকে এই ঘটনা জানান এবং মিশর রাষ্ট্রসংঘের সামরিক বাহিনীকে স্বীকার করার পরিবর্তে এর এক্তিয়ার ও প্রকৃতি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তোলে। বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয় যখন মিশর রাষ্ট্রসংঘের সামরিক বাহিনীতে ক্যানাডার সৈন্যের অংশগ্রহণে আপত্তি করে। সমস্ত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সাথে হ্যামারস্কশোল্ডের আলোচনার সবটা জানা না গেলেও তার যতটুকু জানা গেছে তাতেই এটা পরিষ্কার যে একটি কার্য্যকরী সমাধানে পেঁছিনোর ব্যাপারে হ্যামারস্কশোল্ডের কূটনৈতিক দক্ষতা অনেকখানি সাহায্য করেছিল। নভেম্বরের 12 তারিখে মহাসচিব ঘোষণা করেন যে মিশর রাষ্ট্রসংঘের সামরিক বাহিনীকে মিশরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। বস্তুতঃ এর ঠিক দুদিন পরে কায়রো থেকে বেতারবার্তা পেয়ে তিনি রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীকে মিশরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি নিজে বিমানে কায়রো যান সামরিক বাহিনীর গঠন ও নিয়োগ সম্পর্কে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার এবং সাধারণ সভায় গৃহীত প্রধান নীতিগুলির সঠিক প্রয়োগের জন্য।

এখানেই ঘটনার শেষ নয় অথবা মহাসচিবের দায়িত্ব নেওয়ার পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর পদমর্য্যাদা সম্পর্কে মিশরের সাথে চুক্তির মাধ্যমে মহাসচিবের নবলব্ধ বৈধ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী-বৃটিশ-ইজরায়েলী সৈন্য মিশর থেকে প্রত্যাহারের ব্যাপারে সাধারণ সভার প্রস্তাব যাতে মানা হয় সে সম্পর্কে খবরাখবর দিয়ে

মহাসচিব কার্য্যকরী ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুয়েজ সংকটের আগা-গোড়াই সাধারণ সভা মহাসচিবের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল ছিল। গণ্ডগোল যখন চরমে, তখন প্রায় পনেরো দিন কেটে গিয়েছিল (নভেম্বরের 10 থেকে 23 তারিখ পর্য্যন্ত) অথচ সুয়েজ প্রশ্নে সাধারণ সভার পক্ষে তেমনভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। আগ্রাসী দেশগুলিকে আটকে রাখার কাজে মহাসচিব অবশ্য নভেম্বরের 7 তারিখে গঠিত উপদেষ্টা সমিতির সাহায্য পেয়েছিলেন। এই সমিতি সাতটি দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং তাদের চারটির সাথে মহাসচিব নভেম্বরের 4 তারিখেই বেসরকারী পর্য্যায়ে আলোচনা করেছিলেন। উক্ত দেশ চারটি ছাড়া আরও ছিল ব্রাজিল, সিংহল ও পাকিস্তান—অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের কোন স্থায়ী সভ্যরাষ্ট্র অথবা পশ্চিম ইউরোপীয় কোন দেশ এই সমিতিতে ছিলনা। তখন এবং পরেও এই সমিতির বৈঠক হয়েছিল বেসরকারী পর্য্যায়ে ও গোপনে। সমিতির কাজকর্ম সব ইংরাজীতেই হতো। ফলে ভাষ্যকরণের জটিল বন্দোবস্তের দরকার হয়নি। সমিতির কাজকর্মের কিছু কিছু প্রয়োজনে নিবন্ধকৃত হতো, তবে নিবন্ধকরণ কোনক্রমেই এর কাজকর্মের উপর বিধিনিষেধ হিসাবে কাজ করেনি। ভোটগ্রহণের নিয়ম এই সমিতি মেনে চলেনি, বরং বৈঠকে বোঝাপড়া করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই বৈঠকের মতামত সাধারণ সভাতে পেশ করা হতো না (অবশ্য সেগুলি মহাসচিবের প্রতিবেদনে থাকতো) এবং এই সমিতি কোন যৌথ প্রস্তাবের খসড়াও করতো না। বস্তুতঃ এককভাবে দায়িত্ব-পালন করার সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রলোভন থেকে মহাসচিবকে রক্ষা করাই এর কাজ ছিল; এর কাজ ছিল সাধারণ সভার হৈ-চৈ থেকে তাঁকে নিরাপদ রাখা। আইন পরিষদ না হয়েও খানিকটা আইন পরিষদের মত অথবা শাসন পরিষদ না হয়েও খানিকটা শাসন পরিষদের মত কাজ সচিবালয়কে সুয়েজ সংকটে করতে হয়েছিল এবং এই উপদেষ্টা সমিতির কাজ ছিল উক্ত ভূমিকায় একে সাহায্য করা। আসলে, সচিবালয়ই এক অনন্য ধরণের সংস্থা এবং এই অনন্য সংস্থায় উক্ত উপদেষ্টা সমিতির ভূমিকাও ছিল অনন্য।

1956 খৃষ্টাব্দের সুয়েজ সংকটে মহাসচিব যে কৃতিত্বের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন তা' নিঃসন্দেহে তাঁর ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং তিনি পূর্বের 'শান্ত কূটনীতির' পথ পরিত্যাগ করে আরো ইতিবাচক এবং বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণে সাহসী হন। নিরাপত্তা পরিষদের

তিনজন স্থায়ী সদস্যের নীতির বিরুদ্ধে কাজ করার এক বছরের মধ্যেই তিনি পুনরায় পাঁচ বৎসরের জন্য মহাসচিব হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। তাঁর "পদগ্রহণের বক্তৃতায়" ড্যাগ্ হ্যামারস্কশোল্ড সাধারণ সভায় বলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর পদকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা তাঁর কর্তব্য এবং 'প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবস্থানুযায়ী যতখানি সম্ভব রাষ্ট্রসংঘকে ব্যবহার করা প্রয়োজন' এবং বলেন যে যদি সম্ভব হয় 'সব সময়েই তাঁকে নির্দেশ দেওয়া উচিত'। তিনি আরো বলেন যে, যদি তাঁর কাছে মনে হয়, যে চার্টার এবং চিরাচরিত কূটনীতির কারণে রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যাওয়া কোন ফাঁক ভরাট করা প্রয়োজন, তাহলে তিনি চার্টারের বিধান অনুসারে নির্দেশ ছাড়াই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। ড্যাগ্ হ্যামারস্কশোল্ডের সংযম ও বুদ্ধির জন্য একথা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, এই উক্তিবলে স্বলিখিত ও স্বপরিচালিত যথেচ্ছ হস্তক্ষেপের ক্ষমতা তিনি চাইছেননা। অপরদিকে, তিনি সম্ভাব্য বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে তাঁর অস্বাভাবিকভাবে উঁচু অথচ দুর্বল বেদী থেকে হুশিয়ারী দেন যে যদি তারা চার্টার অনুযায়ী না চলে তবে তিনি তাদের আইনভঙ্গের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করবেন। 1958 খৃষ্টাব্দের জুলাইয়ে লেবানন ও জর্ডানের সংকটে নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে তিনি বলেন যে নিরাপত্তা পরিষদ কাজ করতে ব্যর্থ হলেও রাষ্ট্রসংঘের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায়নি। এবং তিনি তাঁর 'পদগ্রহণকারী বক্তৃতার' ভাষ্য অনুসারে উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করেন এবং লেবাননে রাষ্ট্রসংঘের পর্য্যবেক্ষক বাহিনীর শক্তি বাড়ানোর জাপানী প্রস্তাবে সোভিয়েৎ ভেটো পড়লেও তিনি উক্ত ধরণের প্রস্তাবের সমর্থন করেন। মহাসচিব ব্যক্তিগতভাবে গুরু দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন। সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশনে এই নিরবচ্ছিন্ন সমস্যা আলোচনার জন্য পাঠানো হয় এবং এর প্রকাশ্য অধিবেশনে মহাসচিবের পরিকল্পনা পেশ করা হলে তা' সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অবশেষে সভার প্রস্তাবক্রমে চার্টারের নীতি ও উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য এবং মিশর থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বাস্তবানুগ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করা হয়।

এক বছর পর 1959 খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন লাওস অভিযোগ করে যে বিদেশী সৈন্য তার সীমানা লঙ্ঘন করেছে, তখন মহাসচিব ঐ

বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যখন সোভিয়েৎ ভেটোকে অগ্রাহ্য করে নিরাপত্তা পরিষদের এক উপ-সমিতি লাওস পরিদর্শন করলো এবং কিছুটা অনিশ্চিতভাবে পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করলো তখন মহাসচিবই লাওসে রাষ্ট্রসংঘের উপস্থিতি স্থায়ী করতে সাহায্য করেন, প্রথমে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের আপত্তি সত্ত্বেও ব্যক্তিগত-ভাবে লাওস পরিদর্শন করে এবং পরে মিঃ তোমিওজাকে (Mr. Tuomioja) সেখানে রেখে দিয়ে। মিঃ তোমিওজা কারিগরী সাহায্যের নামেই লাওসে থাকেন। লাওসের আঞ্চলিক সংহতির সম্ভাব্য বিনাশ সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের উদ্বেগ মিঃ তোমিওজার লাওসে উপস্থিতির মাধ্যমে ফুটে উঠে। তাঁর মাধ্যমেই রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে লাওস পরিস্থিতির উপর নজর রাখা সম্ভব হয়।

1960 খৃষ্টাব্দের শুরু হওয়ার আগে থেকেই হ্যামারস্কশোল্ডের দৃষ্টি আফ্রিকার দিকে পড়ে এবং আফ্রিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের ক্রমবর্ধিত দায়িত্বের দিকে তিনি সভ্যরাষ্ট্রসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কঙ্গো সমস্যা দেখা দিলে তিনি সেই কারণে বিচলিত হননি। উপরন্তু তার প্রতি আফ্রিকার দেশগুলির আস্থা ও শুভেচ্ছাও অনেক কাজে এসেছিল। যেকোন ব্যক্তির চেয়ে তিনি অনেক বেশী উপলব্ধি করেছিলেন যে কঙ্গো পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ভীষণভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং কঙ্গো নিয়ে আফ্রিকার বুকে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হবে। এই কারণে রাষ্ট্র-সংঘের মধ্যের অথবা কঙ্গো থেকে উদ্ভূত সকল বাধা অগ্রাহ্য করে তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত কঙ্গো পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাষ্ট্রসংঘের দায়িত্ব থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। তিনি নিজেই বলেন যে কঙ্গো সংকট হচ্ছে সচিবালয়ের অগ্নিপরীক্ষা। এই বিরাট দায়িত্বের গুরুভার সবচেয়ে বেশী পড়েছিল মহাসচিবের উপর। তাঁকে একই সঙ্গে শাসন-তান্ত্রিক, সামরিক, কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

এব্যাপারে প্রথম থেকেই মহাসচিবকে উদ্যোগী হতে হয়েছিল। কঙ্গোর জন্যই প্রথম 99 নম্বর ধারার পূর্ণ প্রয়োগ করে তিনি 13-ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বান করেন। তিনিই প্রথম কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী (ONUC) গঠনের সুপারিশ করেন এবং তিনিই প্রস্তাব দেন যে এই বাহিনীর বেশীর ভাগ সৈন্যই অফ্রিকার সভ্যরাষ্ট্র-সমূহ থেকে নিতে হবে এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সভ্যরাষ্ট্রসমূহ

থেকে কোন সৈন্য নেওয়া ঠিক হবেনা। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন যে, বেলজিয়ামের সৈন্যদের কঙ্গোতে উপস্থিতির জন্যই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং উক্ত সৈন্যদের কঙ্গো থেকে সরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করেন। নিরাপত্তা পরিষদ যে শুধু তার মতকে গ্রহণ করেছিল তাই নয় সুয়েজ সংকটের মত এব্যাপারেও সামরিক সাহায্যসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য তাঁকে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। তিনি নিজেই বলেছিলেন যে সুয়েজ সংকট মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী গঠনের অভিজ্ঞতার ফলে কিছু নতুন নীতির আমদানী হয়েছিল এবং সেগুলিকেই কঙ্গোতেও তাঁর কাজের দিশারী হিসাবে ব্যবহার করার সংকল্প করেছিলেন।

এরই ভিত্তিতে মহাসচিব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দ্রুততার সাথে কাজ করেন। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের অব্যবহিত পরে তিনি উত্তর আফ্রিকার সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রের কাছে সৈন্য প্রদানের আবেদন পাঠান। ঘানা প্রথম এই আবেদনে সাড়া দেয়। 15ই জুলাই ঘানার সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আলেকজাণ্ডার রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীর অগ্রবাহিনী হিসাবে চারজন সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন। 17ই জুলাই বৃটিশ ও মার্কিন বিমানে তিউনিস, ঘানা, মরক্কো ও ইথিওপিয়া থেকে 3,500 সৈন্য এসে পৌঁছয়। হ্যামারস্কশোল্ড জেনারেল ফন্‌হর্ন্‌কে সৈনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন (তিনি অনেক আগেই প্যালেস্টাইনে রাষ্ট্রসংঘের হয়ে কাজ করেছিলেন)। প্রায় সাথে সাথে মিশরেও রাষ্ট্রসংঘের হয়ে কাজের অভিজ্ঞতাসহ সুইডেনের এক বাহিনীকে কঙ্গোর জন্য পাওয়া যায়। এরপর মহাসচিব 'রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী'র ভূতপূর্ব অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার রিখেকে (ভারতের) কঙ্গোর ব্যাপারে তাঁর প্রধান সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করে তাঁকে রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তরেই রেখে দেন।

ফলতঃ 18ই জুলাইয়ের মধ্যে কঙ্গোর রাজধানীতে কিছু পরিমাণে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হয় এবং এতে কঙ্গো সরকার এবং সোভিয়েৎ রাশিয়া উভয়েরই রাষ্ট্রসংঘের পরিকল্পনা বহির্ভূত হস্তক্ষেপের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়। যতই রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যসংখ্যা বাড়তে লাগলো ততই বেলজিয়ামের সৈন্যদের থেকে তারা দায়িত্ব নিয়ে নিতে থাকলো এবং বেলজিয়ামের সৈন্যরা তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে লাগলো এবং 23শে জুলাইয়ের মধ্যে লিওপোল্ডভিল পরিত্যাগ করলো। 24শে জুলাই মহাসচিব কঙ্গোয় এসেছিলেন এবং ঐদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর

মোটসংখ্যা গিনি, লাইবেরিয়া এবং আয়ারল্যাণ্ডের অতিরিক্ত সাহায্যে 10,000-এ এসে পৌঁছয়। এতেই সবকিছু মিটে যায়নি। সৈন্য প্রত্যাহারে বেলজিয়ামের ঢিলেমির ফলে কঙ্গোবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ধ্বজাধারী হিসাবে কঙ্গোয় সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপের নতুন বিপদের সম্ভাবনায় তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এবং 8ই আগস্ট তিনি নিরাপত্তা পরিষদকে হুশিয়ারী দেন যে, বেলজিয়াম কঙ্গো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার না করলে যুদ্ধের সম্ভাবনা (শুধু কঙ্গোতেই নয়) প্রবল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেলজিয়াম নিরাপত্তা পরিষদের এই নির্দেশ মেনে নেয়, কিন্তু কঙ্গো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করায় আগস্টের পরেও তারা সময় নিয়েছিল।

এই সময় হ্যামারস্কশোল্ড কাজ করেছিলেন 13/14 জুলাইয়ের প্রস্তাবের বলে অর্পিত ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং 8ই আগস্টের প্রস্তাব অনুসারে ঐ ক্ষমতার সাথে কাতাঙ্গায় রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীকে পাঠানোর অতিরিক্ত ক্ষমতা যোগ করা হয়। এই ক্ষমতা তার নিজের অনুরোধে মঞ্জুর করা হয় এবং রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এই ব্যবস্থার দরকার হয়েছিল।

কঙ্গোয় প্রথম থেকেই মহাসচিব (সুয়েজ সংকটের ক্ষেত্রে যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন) তেমন কোন উপদেষ্টা সমিতির সাহায্য চাননি। এর কারণও ছিল। কঙ্গোর ক্ষেত্রে তিনি সোজাসুজি নিরাপত্তা পরিষদের (সাধারণ সভার নয়) নির্দেশাধীনে কাজ করেছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে কঙ্গো সমস্যা সংকট হিসাবে দেখা দেওয়ার আগে (শুধুমাত্র কারিগরী সাহায্যের মধ্যে এটা সীমিত ছিল) তিনি আফ্রিকার নয়টি দেশের সংগে আলোচনা করেন এবং সংকটের প্রতিটি স্তরে ঐ দেশ-গুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। কিন্তু, যখন লুমুম্বা কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের কাজ দেখাশুনো করার জন্য একটি আফ্রো-এশীয় পরিদর্শক-দলের জন্য দাবী করেন এবং 21শে আগস্টের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সোভিয়েৎ সরকার মহাসচিবের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে লুমুম্বার দাবীকে সমর্থন করে, তখন হ্যামারস্কশোল্ড নিজেই সুয়েজ সংকটের সময়ের মত একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠনের প্রস্তাব দেন। অতএব সৈন্যপ্রদানকারী দেশগুলি থেকে প্রতিনিধি নিয়ে পনেরো সদস্যবিশিষ্ট একটি সমিতি হ্যামারস্কশোল্ড (নিরাপত্তা পরিষদ নয়) গঠন করেন। এই সমিতিতে আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রতিনিধিগণ ছাড়াও ক্যানাডা, আয়ারল্যাণ্ড এবং

সুইডেনের প্রতিনিধিগণ ছিলেন। পরে মালয়, নাইজেরিয়া, সিংহল এবং সেনেগাল সৈন্য প্রদান করলে এই সমিতির সম্প্রসারণ হয় এবং মোট সদস্যসংখ্যা হয় উনিশ।

এই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা 15,000-এ দাঁড়ায়। এর সর্বোচ্চ সংখ্যা 20,000 হয়েছিল। এই বাহিনীকে ফ্রান্সের আয়তনের চেয়ে চারগুণ বড় এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অপর্য্যাপ্ত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল প্রায় অচল। যেহেতু এর সংগঠন রাজনৈতিক বিবেচনামুক্ত ছিলনা, উন্নত দেশের কারিগরী সাহায্য সত্ত্বেও, এই সামরিক বাহিনীর সংকেত ব্যবস্থা এবং সরবরাহের ব্যবস্থা দুর্বল ছিল। এই বাহিনীতে বহু ভাষাভাষী সৈন্য ছিল এবং এঁরা একটা বিরাট অঞ্চলে ছড়ানো ছোট ছোট ছাউনিতে থাকতো। এই বাহিনীর খুব কমসংখ্যক সৈন্যের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজের অভিজ্ঞতা ছিল। অথচ উক্ত কাজই ছিল তাঁদের প্রধান কর্তব্য। বিবদমান গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক লড়াইয়ের ঘূর্ণাবর্তে এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে তাঁদের পড়তে হয়েছিল বলে অনেক সময়ই তাঁদের অপরিসীম ধৈর্য্য ও সংযমের পরিচয় দিতে হয়েছিল। তাঁদের কাজের প্রকৃতি এমনই ছিল যে সম্পূর্ণ সাফল্য অসম্ভব ছিল এবং সামান্যতম ভুলের জন্য সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারতো। কঙ্গোতে মহাসচিবকর্তৃক নিযুক্ত লোকদের মহাসচিবের সংগে আলোচনা না করেই মাঝে মাঝেই গুরুতর সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হতো। তাছাড়া একটি ছড়ানো দলের সাথে কার্য্যকরী সংযোগ রক্ষা করাও মহাসচিবের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধাজনক ছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে এই রকম অবস্থায় ভুল হতেই পারে, কিন্তু তিনি তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের বিপদের মুখে ঠেলে না দিয়ে তাঁদের করা ভুলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

এই সামরিক কাজ ছাড়া সচিবালয়কে অসামরিক উদ্ধার কাজের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল এবং তা' আরও গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ছিল। বেলজিয়ামের সৈন্য কঙ্গো ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সেখানে প্রশাসনিক কাঠামো বলতে কিছুই ছিলনা অথচ যা আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিভিন্ন বিষয়ে সারা কঙ্গোতে কুড়িজনের বেশি স্নাতক ছিলনা। দক্ষ কারিগর বলতেও কিছুই ছিলনা। খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল, জলসরবরাহ ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ছিল।

এই সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রসংঘকে তার নিজস্ব দক্ষ কারিগরী ও প্রশাসনিক বাহিনী নিয়োগ করতে হয়েছিল। এঁদের এই নৈরাজ্যের মধ্যে বলপ্রয়োগ না করেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার এবং কঙ্গোর অর্থনীতি ও প্রশাসনকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল। ডঃ ষ্টুরে লিনারের (সুইডেনের এক ব্যবসায়ী) উপর এই সমস্ত কাজের স্থানীয় দায়িত্ব ছিল। প্রথমে ডাঃ বান্চের অধীনে তিনি কাজ করেন। পরে কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘের অসামরিক কাজের তিনিই হয়েছিলেন সবচেয়ে বড় কর্তা যেমন সামরিক প্রশ্নে পুরোধায় ছিলেন জেনারেল ফন্ হর্ন। জেনারেল হুইলারের উপর (সুয়েজ খালের নিষ্কাশনের ব্যাপারে একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ) মজে যাওয়া মাতাদি বন্দরকে আবার চালু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কঙ্গোর জন্য সমস্ত বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সাহায্য নেওয়া হয়। রেডক্রশের সাহায্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্লেগের আক্রমণ প্রতিরোধের এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কাজের দায়িত্ব নেয়; অত্যাবশ্যকীয় বিমান সরবরাহ ব্যবস্থা সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থাকে (ICAO); বেতার ও টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করার দায়িত্ব নেয় আন্তর্জাতিক তারবার্তা সংস্থা (ITU); এবং আবহাওয়ার খবরাখবর দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশ্ব আবহাওয়া পূর্বাভাষ সংস্থাকে (WMO)। যখন একটু নিশ্বাস নেওয়ার সময় পাওয়া গেল এবং অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ ব্যবস্থা আবার চালু করা হলো তখন অর্থনৈতিক, বিচারবিভাগীয় এবং আইনের ক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবিলা করার প্রয়োজন দেখা দিল। ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান-কল্পে একটি জরুরী কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হলো এবং অত্যাবশ্যকীয় কারিগরী দক্ষতা প্রসারের জন্য প্রশিক্ষণের একটি কর্মসূচী চালু করা হলো। ধীরে ধীরে সপ্তাহ গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর এলো। কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের প্রথম বছর কেটে গেল, কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রসংঘের কাজ কমার পরিবর্তে আরো বেড়েই চললো। এক সময়ে কঙ্গোতে আন্তর্জাতিক কর্মীবাহিনীতে ত্রিশটি দেশ থেকে নেওয়া পাঁচশত অফিসার অন্তর্ভুক্ত হন। তাছাড়াও তাতে পাঁচশতের বেশী স্কুল শিক্ষক ছিলেন।

অনেক সমালোচক মনে করেন যে এসমস্ত করে রাষ্ট্রসংঘ স্বকীয় কাজের গণ্ডীর বাইরে চলে গেছে এবং এসমস্ত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘকে যথেষ্ট পরিমাণে উপযোগী করে গড়ে তোলাও হয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ

স্বেচ্ছায় কঙ্গোসমস্যার মধ্যে গিয়ে পড়েনি, বরং কঙ্গোসমস্যাই এর উপর এসে পড়েছে। সমস্যা হিসাবে কঙ্গো আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ অথবা প্রশাসনের বিশেষজ্ঞের মাথাব্যথার বিষয়বস্তু ছিলনা। এটা ছিল একটা জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যার মোকাবিলা কাউকে না কাউকে করতেই হতো। এবং রাষ্ট্রসংঘ যদি কঙ্গোসমস্যা সমাধানে অগ্রণী না হতো তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুরভিসন্ধিসম্বলিত দেশগুলি কঙ্গোকে বধ্যভূমি না বানিয়ে ছাড়তোনা।

এটা মহাসচিব বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেজন্যই তাঁর সাথে বৃটেনসহ অন্যান্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির মতবিরোধ মাঝেমাঝেই হতো কারণ সেই রাষ্ট্রগুলি কঙ্গোসমস্যায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা সম্পর্কে মহাসচিবের দৃষ্টিভঙ্গীকে সহ্য করতে পারতোনা। বেলজিয়াম ও ফ্রান্স তাঁর কথা মেনে নিতে পারছিলনা এবং অন্ততঃ একটা বৃহৎশক্তি তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল। মহাসচিবের কঙ্গো-নীতির ফলে মধ্য-আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তার করার সোভিয়েৎ পরিকল্পনা বানচাল হয়েছিল এবং তাতে তিক্ততা বেড়েছিল প্রচণ্ড। এজন্য শীঘ্রই কঙ্গো ড্যাগ্ হ্যামারস্কশোল্ডের আমলের কোরিয়ায় পরিণত হয়েছিল।

কঙ্গো নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই সোভিয়েৎ প্রতিনিধি কঙ্গোয় পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপ বাড়ানোর যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় জন্য ডাঃ বান্চ্কে অভিযুক্ত করেছিলেন। এক সপ্তাহ পরে কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীতে (ONUC) ইউরোপীয় ও মার্কিন সেনা ব্যবহার করার জন্য সোভিয়েৎ প্রতিনিধি মহাসচিবকে দোষারোপ করেন। আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েৎ সংবাদপত্রগুলি হ্যামারস্কশোল্ডের নিন্দা করতে শুরু করে এবং তাঁকে 'আমেরিকার প্রতি পক্ষপাতের' জন্য, 'বিশ্বাসঘাতকতার' জন্য এবং 'ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির কাছে নতিস্বীকার করার' জন্য অভিযুক্ত করা হয়। কাতাঙ্গাতে রাষ্ট্র-সংঘের সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করার জন্য আগষ্ট মাসের আট তারিখে তাঁর সমালোচনা করা হয়। ঐ মাসেরই বাইশ তারিখে শুধু আফ্রিকার কিছু দেশ নিয়ে গঠিত একটি সমিতি মহাসচিবের প্রতিদিনের কাজের হিসাব নেওয়ার জন্য সোভিয়েৎ রাশিয়া গঠন করতে চেয়েছিল। নিরাপত্তা পরিষদে এ প্রস্তাব না টিকলেও সোভিয়েৎ রাশিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি কারণ লুমুম্বা সরকারের মাধ্যমে তার নিজের, 'সাহায্য' পাঠানোর ব্যবস্থা করতে সে সমর্থ হয়েছিল। সাথে-সাথেই লুমুম্বা সরকার রাষ্ট্র-

সংঘকে কঙ্গো থেকে হাত উঠানোর দাবী তুলেছিল এবং হ্যামারস্কশোল্ড কঙ্গো সম্পর্কে লুমুম্বা সরকারের কর্মসূচীর এবং বাইরের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে লুমুম্বা সরকারের ধারণার পরিষ্কার ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। লুমুম্বার দাবীকে সোভিয়েৎ সরকার সমর্থন করেছিল এবং সাধারণ সভার 23শে সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে ক্রুশ্চেভ ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য হ্যামারস্কশোল্ডের পদত্যাগ দাবী করেছিলেন এবং মহাসচিবের স্থলে তিনব্যক্তিবিশিষ্ট একটি পরিচালন-দপ্তরের প্রস্তাব তুলেছিলেন (Troika Proposal)।

নয় বৎসর আগে ট্রিগ্‌ভি লাইয়ের বিরুদ্ধে সোভিয়েৎ সমালোচনা এর তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ছিল। আগের মত এক্ষেত্রেও চার্টারের প্রতি মহাসচিবের অটল বিশ্বাস বৃহৎশক্তিগুলির ভয়ের কারণ হয়ে পড়েছিল। আসলে অবস্থা আরও গুরুতর ছিল। ড্যাগ্‌ হ্যামারস্কশোল্ড নিজেই বলেছিলেন, "এটা কোন ব্যক্তির ব্যাপার নয়, এটা সংগঠনের ব্যাপার। ....নীতিবর্জিত আপোষ-মীমাংসার ভিত্তিতে টিঁকে থাকার চেয়ে নির্ভীক ও পক্ষপাতহীনভাবে এবং ব্যক্তির ইচ্ছার ঊর্ধে থেকে কাজ করতে গিয়ে যদি মহাসচিবের পদ উঠে যায়, সেও ভাল।" তিনব্যক্তিবিশিষ্ট পরিচালন-দপ্তরের প্রস্তাব (Troika Proposal) বাস্তবায়িত হলে একজন স্বাধীন ও আন্তর্জাতিক মহাসচিবের স্থলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনকারী গোষ্ঠীর প্রতি অনুগত তিনজন ব্যক্তির গদীতে সমাসীন হওয়ার পথে উন্মুক্ত হতো। এর ফলে 99 এবং 100 নম্বর ধারা অর্থহীন হয়ে পড়তো এবং রাষ্ট্রসংঘের একটি বিশিষ্ট, প্রাণবন্ত ও সৃজনশীল অঙ্গ (সচিবালয়) আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কাজকর্ম করার একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রে পরিণত হতো।

এ সময় থেকে কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা মহাসচিবের পদের ভবিষ্যতের সাথে একাকার হয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। ক্রুশ্চভের অক্টোবরের 2 তারিখের সমালোচনার উত্তরে ড্যাগ্‌ হ্যামারস্কশোল্ড স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, "আমি পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রসংঘ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ....সোভিয়েৎ রাশিয়া অথবা অন্য কোন বৃহৎশক্তি নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রসংঘের উপর নির্ভরশীল নয়; বস্তুতঃ অন্যান্য রাষ্ট্রই নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রসংঘের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ....যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সমস্ত রাষ্ট্র চাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই তাদের স্বার্থে আমি মহাসচিবের পদে থাকবো।" মহাসচিব মোটামুটিভাবে 'সেই সমস্ত' দেশের সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু কঙ্গোসমস্যার (যাকে সঙ্গতভাবেই 'সাপের গর্ত' বলা হতো) ফলে রাষ্ট্রসংঘকে অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে

হয়েছিল। 'কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী' (ONUC) কিভাবে চলবে এবং কাকে সমর্থন করবে তা' ঠিক করা মহাসচিবের পক্ষে এক দুঃসাধ্য কাজ ছিল। কঙ্গোর ভিতরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আফ্রিকার দেশগুলি কঙ্গো প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এর ফলেই কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের বৃহত্তর এবং আরও স্পষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে মহাসচিবের আবেদনের প্রশ্নে ডিসেম্বরের 16 তারিখে শুধু নিরাপত্তা পরিষদেই নয় সাধারণ সভাতেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের আলোচনাকারী অঙ্গসমূহের দিক থেকে দেখতে গেলে তখন কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল। সৌভাগ্যের কথা এই যে, মহাসচিব স্বকীয় ক্ষমতা ও দায়িত্বের প্রতি প্রত্যয়ের ভিত্তিতে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের বেশীরভাগ সদস্যরাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্খার সাথে সঙ্গতি সাপেক্ষে এবং কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসূচীর আরও কার্য্যকরী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য রদবদলসহ সাধারণ সভা এবং নিরাপত্তা পরিষদের পূর্বের সিদ্ধান্তসমূহ বলবৎ করার জন্য কাজ স্বভাবতঃই চালিয়ে যাওয়া হবে।"

লুমুম্বার মৃত্যুর ফলে হ্যামারস্কশোল্ডকে নতুন করে সোভিয়েৎ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 1961 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর 15 তারিখে এক খসড়া প্রস্তাবে সোভিয়েৎ সরকারের পক্ষ থেকে এক মাসের মধ্যে কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের কাজকর্ম বন্ধ করার এবং কঙ্গো সাধারণতন্ত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের উদ্যোক্তা হিসাবে এবং তাতে অংশগ্রহণকারী হিসাবে মহাসচিবকে অপসারিত করার দাবী করা হয়। ফেব্রুয়ারীর 21 তারিখে এই সোভিয়েৎ প্রস্তাব আট-এক ভোটে নাকচ হয়ে যায়। উপরন্তু, কঙ্গো জাতীয়বাহিনী পুর্নগঠিত করার এবং কঙ্গোতে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগসহ সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করার (কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের দিক থেকে দেখতে গেলে অভিনব) যে ক্ষমতা মহাসচিব চেয়েছিলেন তা' তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। 1961 খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে সাধারণ সভায় যখন কঙ্গোসমস্যার উপর বিতর্ক চলছিল, তখন হ্যামারস্কশোল্ড ঘোষণা করেন যে, বিতর্ক চলাকালে সাধারণ সভা ধরে নিতে পারে যে এর সামনে মহাসচিবের পদত্যাগপত্র রয়ে গেছে, তখন

সাধারণ সভা পরের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়ার জন্য দশকোটি ডলারের অনুদান ঘোষণা করে মহাসচিবের উপর আস্থা প্রকাশই করে। ধীরে ধীরে কঙ্গো পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হলে জুলাই মাসে রাষ্ট্রসংঘের পাহারায় কঙ্গো রাজনীতির সমস্ত গোষ্ঠীর উপস্থিতিতে কঙ্গো সংসদের বৈঠকের ফলে মিঃ আদোলার (Mr. Adoula) নেতৃত্বে সমস্ত কঙ্গোর জন্য এক সরকার গঠিত হয়। কিন্তু কাতাঙ্গা এই ব্যবস্থার অধীনে আসতে অস্বীকৃত হলে এবং শ্বেতকায় ভাড়াটে সৈন্যদের ব্যবহারের অনুকূলে জেদ ধরলে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী শ্বেতকায় ভাড়াটে সৈন্যদের কাতাঙ্গা থেকে অপসারণের জন্য এবং ঘন ঘন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য জোর করে কাতাঙ্গা দখল করে। এই কাজ ফেব্রুয়ারীর 21 তারিখের প্রস্তাব অনুসারে বৈধ হলেও এর ফলে প্রচুর হতাহত হয়েছিল এবং রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল এবং তার জন্য প্রত্যাশিত সমালোচনাও হয়েছিল। কঙ্গোতে উপস্থিত রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারীদের উদ্যোগের ফলে অথবা তাঁদের ভুলে এ হয়েছিল কিনা তা' মহাসচিব ফাঁস করেননি। তবে নিজে হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাথে সাথেই তিনি আফ্রিকার উদ্দেশ্যে বিমান যাত্রা করলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরের 17-18 তারিখের রাত্রে তিনি যখন কাতাঙ্গার রাষ্ট্রপতি মিঃ শোম্বের সাথে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছিলেন, তখন নাদোলা বিমান বন্দরের দশ মাইল দূরে তার বিমান দুর্ঘটনা-কবলিত হলে ড্যাগ্ হ্যামারস্কশোল্ডসহ সমস্ত যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হ্যামারস্কশোল্ডের মৃত্যুতে মহাসচিবের পদের উপর এবং রাষ্ট্রসংঘের উপর যে অশুভ প্রতিক্রিয়া হলো, তার প্রভাব থেকে কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের কাজকর্মও বাদ পড়েনি। মহাসচিবের পদে নতুন কোন ব্যক্তির নিয়োগ সোভিয়েৎ রাশিয়া ছ' সপ্তাহ ধরে আটকে রেখেছিল। মহাসচিবের পদে সর্বেতোভাবে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিকে নিয়ে বিরোধ হয়নি, কারণ ব্রহ্মদেশের প্রতিনিধি দলের প্রধান য়ু থাণ্ট্ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিরুদ্ধমত ছিলনা। মহাসচিবের ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদা নিয়েই বিরোধ বেধেছিল। আফ্রো-এশীয় দেশগুলির সমর্থনের আশায় সোভিয়েৎ রাশিয়া তিনব্যক্তি-বিশিষ্ট পরিচালন-দপ্তরের প্রস্তাবকেই একটু হেরফের করে উপস্থাপিত করেছিল। এবং এই প্রস্তাবের বিভিন্ন ভাষ্যের মূল বক্তব্য একই ছিল: মহাসচিবকে ঘিরে বিভিন্ন প্রধান গোষ্ঠীকর্তৃক নির্বাচিত একাধিক সহকারী

সচিব থাকবেন এবং কোন সিদ্ধান্তের প্রশ্নে মহাসচিব তাঁদের মত নেবেন। কিন্তু আফ্রো-এশীয় দেশগুলি এ প্রস্তাব সমর্থন করেনি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর বিরোধিতা করলে শেষপর্য্যন্ত সোভিয়েৎ ইউনিয়নকে হাল ছাড়তে হয়। ফলে 1961 খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের 3 তারিখে য়ু থাণ্ট্ সর্বসম্মতিক্রমে সাময়িকভাবে মহাসচিবের স্থলাভিষিক্ত হন এবং বিশেষ কোন শর্ত তাঁর উপর আরোপ করা না হলেও অধীনস্থ সচিবদের সাথে 'পারস্পরিক বোঝাপড়ার' ভিত্তিতে আলোচনা করার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

মহাসচিব হওয়ার পরেই য়ু থাণ্ট্ কঙ্গোর ব্যাপারে হ্যামারস্কশোল্ডের চেয়েও ঘোরতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। মিঃ শোম্বের সাথে আলোচনা করে যে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা হয়েছিল 'তা' টেঁকেনি। এলিজাবেথভিলে নতুন করে গোলাগুলি শুরু হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী পর্য্যুদস্ত ও অকেজো হয়ে পড়ে। নভেম্বরের 24 তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ নয়-এক ভোটে (ফ্রান্স ও বৃটেন ভোটে অংশগ্রহণ করেনি) গৃহীত এক প্রস্তাববলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কঙ্গো থেকে শ্বেতকায় ভাড়াটে সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করার জন্য মহাসচিবকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করে। নতুন প্রস্তাববলে তাঁর ক্ষমতা আরও জোরদার হওয়ায় য়ু থাণ্ট্ কঙ্গোতে 'আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ও জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য' এবং কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর চলাচল সম্পূর্ণ নিরাপদ করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অবলম্বন করার আদেশ দেন। ডিসেম্বরের 5 তারিখে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী আক্রমণ শুরু করলে ঐ মাসের 18 তারিখের মধ্যেই বিপক্ষ দলের অবরোধশক্তি ভেঙ্গে পড়ে। রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী বিমান আক্রমণসহ (সুইডেনের জঙ্গী জেট বিমান ব্যবহৃত হয়েছিল) সম্পূর্ণ সশস্ত্রভাবে লড়াই চালালে রাষ্ট্রসংঘের সমর্থক বেশ কিছু পাশ্চাত্যদেশ বিচলিত বোধ করে। ফ্রান্স ও বৃটেন সমালোচনা করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ়ভাবেই এই যুদ্ধ সমর্থন করেছিল কারণ আমেরিকার ধারণা হয়েছিল যে কার্য্যকারিতার দিক থেকে ন্যূনতম ভূমিকা পালন করতে গেলেও 'কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর' এছাড়া উপায় ছিলনা। এবং য়ু থাণ্ট্ সমালোচনার উত্তরে ঠিকই বলেছিলেন যে, এই লড়াইয়ে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী বাস্তবে সীমিত ও মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক ভূমিকাই নিয়েছিল এবং উক্ত বাহিনীর আত্মরক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে এছাড়া অন্য কোন রাস্তা ছিলনা।

সোভিয়েৎ সমালোচনার ছিল ভিন্ন সুর। তারা বলেছিল যে, কাতাঙ্গা থেকে শ্বেতকায় ভাড়াটে সৈন্যরা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হওয়ার আগেই রাষ্ট্রসংঘ লড়াই বন্ধ করেছিল। এ প্রশ্ন নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ যখন আলোচনায় বসে তখন য়ু থাণ্টের যুক্তিই, অর্থাৎ, এ সমস্যা যুদ্ধ ছাড়াই সমাধান করা যাবে, গ্রাহ্য হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়েই নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখা হয়। 1962 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে য়ু থাণ্ট্ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনে কঙ্গোর সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ 'জাতীয় পুনর্গঠনের' পরিকল্পনা না দেওয়া পর্য্যন্ত মিঃ আদোলা এবং মিঃ শোম্বের মধ্যে ছ'মাসব্যাপী আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল।

য়ু থাণ্ট্ ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সভ্যরাষ্ট্রসমূহের কাছে মিঃ শোম্বের উপর অর্থনৈতিক চাপসৃষ্টি করার আবেদন করা পর্য্যন্ত মিঃ শোম্বে দীর্ঘ-সূত্রিতা ও সত্য অপলাপের সমস্ত কৌশলই অবলম্বন করেছিলেন। এই আবেদনের কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার আগেই অবশ্য কাতাঙ্গা বাহিনীর সাথে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর আর একবার (বড়দিনের প্রাক্কালে) সংঘর্ষ হয় এবং নিজেদের চলাচলের নিরাপত্তার খাতিরেই রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীকে এটা করতে হয়েছিল। মূলতঃ ভারতীয় সৈন্যই এতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং এই যুদ্ধই ছিল মোটামুটিভাবে নিষ্পত্তিমূলক। বিপক্ষদলের অবরোধশক্তি অবিলম্বেই নিঃশেষিত হওয়ায় জানুয়ারী মাসের 13 তারিখে মিঃ শোম্বে কাতাঙ্গাকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে কঙ্গো সম্পর্কে য়ু থাণ্টের প্রস্তাবে রাজী হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এর ফলে বিদেশী শক্তিকর্তৃক গোপনে অথবা প্রকাশ্যে দেওয়া সাহায্যের ভিত্তিতে সারা কঙ্গোতেই রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর উপর সংগঠিত আক্রমণের অবসান হয়। কিন্তু কঙ্গোর জাতীয় বাহিনীর প্রশিক্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত অরাজকতা ও রক্তপাতের সীমা-পরিসীমা ছিলনা। ফলে কঙ্গো এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশের অনুরোধে কঙ্গোর জন্য 'রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী' রয়ে গেল। অবশ্য এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা পাঁচহাজারে নামিয়ে আনা হয়েছিল এবং 1964 খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই বাহিনী কঙ্গোতে থাকবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। পরে অর্থের অভাবের জন্যই (শান্তিরক্ষার কাজ অসম্পূর্ণ থাকার জন্য নয়) চূড়ান্ত পর্য্যায়ে এর প্রত্যাহারের কাজ বিলম্বিত হয়েছিল। অবশ্য এও বোঝার সময় হয়েছিল যে কঙ্গোর দায়িত্ব, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, কঙ্গোকেই নিতে হবে।

কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার প্রতিক্রিয়া হিসাবে শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেটাকে সোভিয়েৎ রাশিয়া মহাসচিবের উদ্যোগ ও ক্ষমতা খর্ব করার কাজে লাগিয়েছিল। নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে (যেটা নিরাপত্তা পরিষদের এক্তিয়ার) সাধারণ সভাকর্তৃক কোন ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্নেই শুধু নয়, সে ব্যাপারে মহাসচিবের স্বেচ্ছা-মূলক যেকোন ক্ষমতা থাকার প্রশ্নেই সোভিয়েৎ ইউনিয়নের আপত্তি ছিল। খানিকটা এজন্যই ষাটের দশকের অবশিষ্ট বছরগুলিতে মহাসচিবকে স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতার প্রশ্নে নেতিবাচক ভূমিকাই পালন করতে হয়। একথার সমর্থনে 1967 খৃষ্টাব্দে 'রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীর (UNEF) প্রত্যাহারের কথা বলা যেতে পারে।

আকাবা উপসাগর অবরোধ করার জন্য অস্থির হয়ে মিশরীয়গণ প্রথমেই 'রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীর' অধিনায়ক জেনারেল রিখের উপর স্থানীয় পর্য্যায়ে চাপসৃষ্টি করে উক্ত বাহিনী প্রত্যাহারের চেষ্টা করেছিল। যেহেতু মহাসচিবের আদেশেই জরুরী বাহিনী মিশরে উপস্থিত ছিল, সেহেতু জেনারেল রিখের এ ব্যাপারে কিছুই করার ছিলনা। মহাসচিবকে 'জরুরী বাহিনী' অপসারণের জন্য হ্যামারস্কশোল্ডের সাথে নাসেরের চুক্তির ভিত্তি অনুযায়ী অনুরোধ করা হয়। এই চুক্তির প্রতিপাদ্য বিষয় এই ছিল যে, মিশরীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া 'রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী' মিশরে প্রবেশ করতে পারবেনা। সুতরাং মিশরীয়দের দাবী অবৈধ ছিলনা।

কিন্তু প্রশ্ন উঠলো মিশরের দাবী মেনে নেওয়ার ক্ষমতা মহাসচিবের ছিল কিনা। অনেকেই মনে করেছিলেন যে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সাধারণ সভার কাছে (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার প্রশ্ন নিয়ে তখন সাধারণ সভার এক বিশেষ অধিবেশন চলছিল) পেশ করা উচিত। উপদেষ্টা সমিতির সাথে আলোচনা করে মিশরের দাবী মেনে নেওয়ার প্রশ্নে মহাসচিবের ক্ষমতার কথা জানানো হয়। স্পষ্টতঃই বিষয়টি সাধারণ সভার কাছে পেশ করা হয়নি। যেসমস্ত দেশের সৈন্য নিয়ে এই 'জরুরী বাহিনী' গঠিত হয়েছিল, তারাও উক্ত বাহিনীর প্রত্যাহারকে অবিলম্বেই সমর্থন করেছিল। মহাসচিবও সাথে সাথেই 'জরুরী বাহিনী' প্রত্যাহার করে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। অনেকেই মনে করেন যে তিনি এটা বৈধ ক্ষমতাবলেই করেছিলেন। এও বলা যেতে পারে যে, আরব-ইজরায়েলের যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার ভয় জরুরী বাহিনীতে সৈন্য-দানকারী দেশগুলির ছিল এবং সেক্ষেত্রে মহাসচিবের অন্য কিছু করার

ছিলনা। তিনি হয়তো শেষ পর্য্যন্ত দেখার চেষ্টা করতে পারতেন, প্রশ্নটিকে সাধারণ সভায় তুলতে পারতেন, হ্যামারস্কশোল্ডের কায়দায় রাষ্ট্রসংঘের সক্রিয়তার অনুকূলে মতৈক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু য়ু থাণ্ট্ ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাছাড়া ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে রাষ্ট্রসংঘের অবস্থার দিক থেকে দেখতে গেলে অথবা মধ্যপ্রাচ্যের জনমতের উদ্দামতা ও রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের দিক থেকে দেখতে গেলে মিশর থেকে 'রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী' প্রত্যাহার না করে উপায় ছিলনা।

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্রসংঘ ও উহার সদস্যবৃন্দ

এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের ভিতর থেকেই এই সংগঠনের চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের চার্টার এবং বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদনার্থে স্থষ্ট ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার আলোচনার মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রসংঘের বৈশিষ্ট্য ও গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছি এই সংগঠনের দৃষ্টি-কোণ থেকেই। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ কতকগুলি রাষ্ট্রকর্তৃক স্থষ্ট সংগঠন বলে এভাবে এর সম্পূর্ণ পরিচয় সম্ভব নয়। নিজের সম্বন্ধে রাষ্ট্রসংঘ কি মনে করে, সেটাই শেষ কথা নয়। রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের ধ্যান-ধারণাও এই সংগঠনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব বলা যায় যে, রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু সদস্যরাষ্ট্রের (এই সংগঠনকে স্থষ্টি করে একে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সমস্ত রাষ্ট্র একযোগে কাজ করেছে) ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবগতি এই সংগঠনের পূর্ণ পরিচয়ের পক্ষে অপরিহার্য্য।

সদস্যরাষ্ট্রসমূহ তথাকথিত 'স্থায়ী প্রতিনিধিদলের' (Permanent Delegations) মাধ্যমেই রাষ্ট্রসংঘের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের প্রায় সবটাই রক্ষা করে থাকে। স্থায়ী প্রতিনিধিদলের নজির জাতিপুঞ্জের আমলে স্থষ্ট হলেও জেনেভায় উপস্থিত স্থায়ী প্রতিনিধিদলগুলির তুলনায় নিউইয়র্কে উপস্থিত দলগুলি আরও বড়, আরও বিশদ এবং অনেক বেশী জাঁকজমকপূর্ণ। নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন খুব দূরে না হলেও বৃহত্তম প্রতিনিধিদল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই। এই দলে একশো থেকে দুশো ব্যক্তি থাকেন (সাধারণ সভা অধিবেশনরত থাকলে প্রতিনিধিসংখ্যা বেশী থাকে)। আকৃতি ছাড়াও মার্কিন প্রতিনিধিদলের মর্য্যাদার পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিনিধিদলের প্রধানের প্রসিদ্ধির মাধ্যমে। বিভিন্ন সময়ে মিঃ অ্যাড্‌লাই স্টিভেন্‌শন্, মিঃ আর্থার গোল্ডবার্গ্ রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁরা স্বকীয় কারণেই প্রসিদ্ধ ছিলেন না, মার্কিন রাষ্ট্রপতির মন্ত্রীসভার সদস্যও ছিলেন। অন্য দেশগুলি (বিশেষ করে গরীব দেশগুলি) এতবড় প্রতিনিধিদল রাখতে না পারলেও

সাধারণ সভার অধিবেশনের সময় নিউইয়র্কে উপস্থিত প্রতিনিধিদলগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজধানীতে অবস্থিত দূতাবাসের মতই হয়ে উঠে। বৃটিশ দলেও সর্বাধিক স্বীকৃতিসম্পন্ন জনছয়েক কূটনীতিবিদের সমাবেশ দেখা যায়। বৃটিশ শ্রমিকদল ক্ষমতাসীন থাকাকালে একজন উপমন্ত্রীকেও বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে (লর্ড ক্যারাডন্)।

সাধারণ সভার অধিবেশনে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের নিয়মিত সভ্যগণ ছাড়াও বিশেষ দল পাঠানো হয়ে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মত সাধারণ সভার অধিবেশনের প্রথম কয়েকদিন বৈদেশিক মন্ত্রীগণ স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। স্বকীয় প্রতিনিধিদল গঠনে বিভিন্ন রাষ্ট্র জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচারের প্রতি লক্ষ্য রাখে। অতএব দেখা যায়, মার্কিন দলে একজন কৃষ্ণাঙ্গ রাখা হয় (যেমন, 1958 খৃষ্টাব্দে মিস্ মারিয়ন্ অ্যাণ্ডারসন্ থাকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ও মহিলাদের—উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব হয়) অথবা ফরাসী দলে একজন কৃষ্ণকায় ঔপনিবেশিক প্রশাসক (যেমন, মঁসিয়ে হুঁফে বোইগ্নী) রাখা হয়ে থাকে। অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলে একজন মহিলা প্রতিনিধি থাকেন। আবার স্বদেশে প্রচার ও সরকারী নীতির অনুকূলে সমর্থন ব্যাপক করার জন্য সংসদীয় সদস্যদের (সরকারী এবং বিরোধীদলগুলির) অথবা অনুরূপ ব্যক্তিদের প্রতিনিধি দলভুক্ত করা হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদলেও সংসদসদস্যদের রাখা হয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের (Separation of Powers) নীতির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই পন্থা অনুসরণ করে থাকে।

প্রত্যেক প্রতিনিধিদলে প্রধান বিষয়গুলিতে (যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, অছিসংক্রান্ত) পারদর্শী সভ্যগণ ছাড়াও আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞগণ (Regional Experts) থাকেন। পরোক্তগণ বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, আলাদা আলাদা সদস্যরাষ্ট্র অথবা বিভিন্ন গোষ্ঠীর (বিশেষ করে ভোটদান সম্পর্কে) প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী নিজেদের দলকে পরামর্শ দেন। বস্তুতঃ রাষ্ট্রসংঘের 'সংসদীয় কূটনীতিতে' এঁরাই প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। এদিক থেকে মার্কিন দলই সমধিক সুসজ্জিত। তবে সম্পদ ও প্রতিনিধিদলে সভ্যসংখ্যা সীমিত হলেও অন্যান্য সমস্ত বৃহৎশক্তিও এবিষয়ে সচেতন। রাষ্ট্রসংঘের কূটনীতিমহল এভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে বৈদেশিক

কার্য্যকলাপের পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে বিভিন্ন জাতীয় সরকারের ভমিকায় জাতীয় প্রতিনিধিদলগুলি এবং বৈদেশিক মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূতদের ভূমিকায় উপরিউক্ত যোগাযোগরক্ষাকারী ব্যক্তিগণ অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

ফলে ক্ষুদ্র এবং গরীব রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেখা যায় যে প্রতিনিধিদলে সদস্যসংখ্যা কম না হলেও উপদেষ্টাগণের সংখ্যা (বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিষয়ে) কমই হয়ে থাকে। প্রতিনিধিদলগুলির নিকট নিউ-ইয়র্কের আকর্ষণ কমে গেলেও রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তরের আকর্ষণ কমেনি। ফলে প্রতিনিধিদলগুলির সভ্যগণ নিউইয়র্কে থাকতে পছন্দ করেন। এতে একদিকে রাষ্ট্রসংঘের ক্ষতিই হয়। কাজ শেষ হয়ে গেলে স্বদেশে ফিরে যেতে হবে বলে প্রতিনিধিদলসমূহ তাড়াতাড়ি কোন বিষয়ের যবনিকাপাত করতে চায়না। তাছাড়া, সচিবালয়কে নিউইয়র্কে উপস্থিত প্রতিনিধিদলগুলির মাধ্যমে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় বলেও (জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে এধরণের যোগাযোগ সরাসরি হতো) সময় বেশী লাগে। তবে প্রতিনিধি-দলগুলি স্থায়ীভাবে নিউইয়র্কে উপস্থিত থাকায় সুবিধাও হয়। প্রত্যেক প্রতিনিধিদলেই রাষ্ট্রসংঘের প্রতি সহানুভূতিশীল কিছু সভ্য (যাঁরা স্বদেশের নীতি নির্ধারণকালে রাষ্ট্রসংঘের কথা খেয়াল রাখেন) পাওয়া যায়। তাছাড়াও, কোন সদস্যরাষ্ট্রই পারদর্শী সভ্যবিশিষ্ট স্থায়ী প্রতিনিধি-দলের ব্যবস্থা বর্জন করতে পারেনা এবং স্থায়ী প্রতিনিধিদলের ব্যবস্থা না থাকলে প্রত্যেক অধিবেশনের সময় উপস্থিত (পারদর্শী নয় এমন সমস্ত সভ্যবিশিষ্ট) নূতন নূতন দলগুলিকে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অঙ্গের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে শিক্ষাদানের কাজও সচিবালয়ের পক্ষে সহজ হতোনা।

যদিও অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্রসংঘের যতগুলি সদস্যরাষ্ট্র ঠিক ততগুলি রূপ (কারণ রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র ধ্যান-ধারণা আছে), তবুও রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে মার্কিন ধ্যান-ধারণার গুরুত্ব সমধিক। রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতির প্রকটতা অবিশ্বাস্য রকমের বলে কখনও কখনও প্রশ্ন জাগে: 'রাষ্ট্রসংঘ মার্কিন প্রতিষ্ঠান কিনা?' এধরণের প্রশ্নের উদ্রেক হওয়ার কারণও আছে। রাষ্ট্রসংঘের সম্মুখের রাস্তার বিপরীত দিকে অবস্থিত মার্কিন প্রতিনিধিদলের দপ্তর ভবন বড় বেশী চোখে পড়ে; শ্রোতৃবর্গের মধ্যে মার্কিন প্রতিনিধির বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া বড় বেশী হয়; রাষ্ট্রসংঘের ডাকঘরের বিজ্ঞপ্তির

সঙ্গে মার্কিন সরকারের বিজ্ঞাপনও পরিলক্ষিত হয়; এবং মার্কিন প্রতিনিধিদলের ভোজসভার জাঁকজমক কারও দৃষ্টি এড়ায়না। রাষ্ট্রসংঘের স্বকীয় চাকচিক্য সত্বেও ম্যানুহাটানের গগনচুম্বী সৌধমালার পাশে আটত্রিশতলবিশিষ্ট রাষ্ট্রসংঘ ভবনকে বড় বেশী অকিঞ্চিৎকর মনে হয়; মনে হয় 'ইষ্ট্ রিভারের' ওপারে 'পেপ্সি-কোলার' চোখ ঝলসানো বিজ্ঞাপন রাষ্ট্রসংঘকে যেন উপহাস করছে। রাষ্ট্রসংঘ ভবনে কর্মব্যস্ত ব্যক্তিগণ দিনান্তে নিউইয়র্কে অথবা নিউইয়র্কের আশেপাশেই হারিয়ে যান। সব মিলিয়ে মার্কিন উপস্থিতি, মার্কিন প্রাধান্য বড় বেশীই মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসংঘের জন্মের প্রত্যেকটি স্তরে, ডাম্বারটন্ ওক্স ও সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং পরবর্তীকালেও প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে (যেমন, প্যালেস্টাইন, কোরিয়া, সুয়েজ এবং কঙ্গো) সর্বাংশে না হলেও মূলতঃ মার্কিন মতবাদই গ্রাহ্য হয়েছে। কোন কোন প্রশ্নে মার্কিন সরকারী উদ্যোগ দেখা না গেলেও বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র মার্কিন প্রভাবের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি (যেমন শেষ পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত)। মার্কিন নাগরিকের দানের ফলেই রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তরের জমি হয়, মার্কিন ঋণেই রাষ্ট্রসংঘ ভবন নির্মিত হয়, এবং উক্ত ভবনের পরিকল্পনা ও নির্মাণে একজন মার্কিন স্থপতির অবদানই সমধিক। উপরিউক্ত সমস্ত কারণের জন্য রাষ্ট্রসংঘের সর্বত্র—ভাষায়, কার্য্যপদ্ধতিতে, জনসংযোগের কৌশলে—মার্কিনী কেতার (Style) স্বাক্ষর অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই (যেমন সচিবালয়ের কর্মচারীগণ ও নিউইয়র্কে উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিনিধিদলগুলির সভ্যগণ মার্কিন বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকেন) পড়েছে। সব সময় স্বীকৃত না হলেও অনেক প্রশ্নে মার্কিন শক্তি রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যকারিতার প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে। একথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় মার্কিন সরকার প্রদত্ত (রাষ্ট্রসংঘকে) অর্থে। পূর্বে রাষ্ট্রসংঘের নিয়মিত বাজেটের প্রায় 40 শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহন করতো (এখন 32 শতাংশ বহন করে); কারিগরী সাহায্যদান কর্মসূচীর ব্যয়ের 45 শতাংশসহ রাষ্ট্রসংঘের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য-দানের 60 শতাংশ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে; এবং 'রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনী' (UNEF) ও 'কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর' (ONUC) ব্যয়ের অধিকাংশই মার্কিন সরকার বহন করেছে। কূটনৈতিক প্রশ্নেও রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নগণ্য নয়। কোরিয়ায় মার্কিন

যেতে পারে)। তাছাড়াও 'ম্যাক্‌কার্থী যুগে' মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা-কর্তৃক হানার বিরুদ্ধে সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিরাপত্তা দানের জন্য 'প্রশাসনিক সালিশী সভার' (Administrative Tribunal) সিদ্ধান্তসমূহের (আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত) বিরুদ্ধে মার্কিন মহলে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এর ফলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রসংঘকে খানিকটা কূটনৈতিক মর্য্যাদা (Quasi-Diplomatic Status) দেওয়ার উদ্দেশ্যে আয়োজিত (রাষ্ট্রসংঘের) 'সুবিধা ও অনাক্রম্যতা সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তিতে' (General Convention on Privileges and Immunities) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (যে দেশে রাষ্ট্রসংঘ অবস্থিত) এখনও সম্মতি দেয়নি। কিন্তু এই চুক্তির ছোট-খাট অংশ বাদ দিয়ে যে 'সদর-দপ্তর সংক্রান্ত চুক্তি' (Headquarters Agreement) হয়, তা' মার্কিন কংগ্রেস অনুসমর্থন করেছে। কংগ্রেসের সহজাত রক্ষণশীলতার জন্যই এটা হয়েছে। বলা যেতে পারে যে, প্রথম বৎসরগুলিতে রাষ্ট্রসংঘ মার্কিন আশ্রয়েই বেড়ে উঠেছে। তবে (পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য) রাষ্ট্রসংঘ এখন স্বাবলম্বী হয়েছে এবং এর সদস্যরাষ্ট্রসংখ্যাও প্রচুর বেড়ে গেছে। এখন মার্কিন সরকারের ইচ্ছা সবসময়ই রাষ্ট্রসংঘে গ্রাহ্য হবে, এমন মনে করার কারণ নেই। এখন আর হাল্কা দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রসংঘকে দেখা যথাযথ হবেনা। তবে পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে, বর্ত্তমানে রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে মার্কিন প্রতিনিধিদের বক্তব্য প্রারম্ভিক বৎসরগুলির চেয়ে অনেকটা নিরুত্তাপ ও সতর্ক হলেও রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন মতবাদের সমালোচনা অপেক্ষাকৃতভাবে (অন্যান্য বৃহৎ-শক্তিগুলির মতবাদের তুলনায়) কমই হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে মোটামুটিভাবে মার্কিন মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী।

রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে সোভিয়েৎ দৃষ্টিভঙ্গীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে, বার বার কোণঠাসা হয়ে গেলেও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করেনি। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন অবশ্য প্রচুর ভেটো প্রয়োগ করেছে (প্রথম পঁচিশ বৎসরে শতাধিক), বার বার সভাকক্ষ ও নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক থেকে বেরিয়ে গেছে এবং বৈঠক বর্জন করেছে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করার প্রশ্ন কখনও উঠেনি। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, সোভিয়েৎ ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এধরণের একটা রক্ষণশীল সংগঠনে রয়ে গেল কেন?

1943-1945 খৃষ্টাব্দে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘকে হিটলারবিরোধী

বৃহৎশক্তিবর্গের আঁতাতের ফসল বলেই মনে করতো। মনে করা হতো যে, বৃহৎশক্তিবর্গের উপরই সমধিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পিত হবে। বৃহৎপঞ্চশক্তি শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার গুরুদায়িত্ব বহন করবে এবং সেদিক থেকে নিরাপত্তা পরিষদই কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। ভেটো ক্ষমতার ব্যবস্থা হয় এজন্য যাতে যেকোন প্রশ্নে বৃহৎশক্তিবর্গ মতৈক্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারে এবং যাতে এক বৃহৎশক্তি অপর বৃহৎ-শক্তির বিরুদ্ধে (সামরিক অর্থে) যেতে না পারে। রাষ্ট্রসংঘে সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব অটুট রাখতে সোভিয়েৎ সরকার সবসময়ই খুব সতর্ক ছিল। জাতীয় জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই সোভিয়েৎ দৃষ্টিভঙ্গী এধরণের হয়েছিল। সঙ্গতভাবেই সোভিয়েৎ সরকার মনে করতো যে, 1812, 1914 এবং 1941 খৃষ্টাব্দের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিবারণ করাই রাষ্ট্রসংঘের একমাত্র কাজ নয়, 1917 খৃষ্টাব্দের পরে বিভিন্ন পশ্চিমী সরকারকর্তৃক সোভিয়েৎ ইউনিয়নে অবৈধ হস্তক্ষেপের মত ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটতে পারে সেদিকেও রাষ্ট্রসংঘের লক্ষ্য রাখতে হবে। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের শরিক হলেও এবং রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েৎ সরকারকর্তৃক জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ হলেও তা' উপরিউক্ত কারণেই অসঙ্গত নয়।

অতএব সান্‌ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ক্ষুদ্রশক্তিগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাবে (কারণ সাধারণ সভায় ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রাধান্যই থাকবে) এবং ভেটোক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাবে সোভিয়েৎ সরকার সন্দিহান হয়ে উঠে। কারণ এই সমস্ত প্রস্তাবকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকর্তৃক সোভিয়েৎবিরোধী ষড়যন্ত্র (যুদ্ধে ধনতান্ত্রিক সরকারগুলি সোভিয়েৎ ইউনিয়নের মত ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং রাষ্ট্রসংঘে ধনতান্ত্রিকগোষ্ঠীর সমর্থক সংখ্যা প্রচুর) বলে সন্দেহ হয়। 1946 খৃষ্টাব্দে ইরান থেকে সোভিয়েৎ সৈন্য বহিষ্কারের প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্তের সম্ভাবনায় পশ্চিমী দেশগুলি সম্পর্কে সোভিয়েৎ সরকারের সন্দেহ বদ্ধমূল হয় এবং বিপদ এড়াতে সোভিয়েৎ সরকার ভেটো প্রয়োগ করে। সোভিয়েৎ সরকার এটাকে ভেটোর অপপ্রয়োগ মনে করেনি বরং ভেবেছে যে, অন্যান্য বৃহৎশক্তি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তগ্রহণে অস্বীকার করেছে। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন মনে করে যে, কোন প্রশ্নে ভেটোর কারণে নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে ঐ প্রশ্ন সাধারণ সভায় স্থানান্তরিত

করা যথাযথ নয়। সেক্ষেত্রে চার্টারকৃত রক্ষাকবচের ব্যবস্থাকে (ভেটো-ক্ষমতার মাধ্যমে বৃহৎশক্তিগুলির শক্তি ও দায়িত্বের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে গৃহীত) অবজ্ঞা করাই হবে। এজন্যই সোভিয়েৎ সরকার 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাবকে' (Uniting for Peace Resolution) সর্বদাই অবৈধ বলেছে। ঐ সরকার মনে করেনা যে, নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যপূরণে বাধাস্বরূপ। রাষ্ট্রসংঘকে আন্তর্জাতিক বিচার সভা বলে অথবা কল্যাণমূলক আন্তর্জাতিক সংগঠন বলে মনে না করতে পারায় (প্রারম্ভিক পর্য্যায়ের বিশ্বসরকার বলে কোনক্রমেই নয়) সোভিয়েৎ ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যকলাপ সম্প্রসারণের পক্ষপাতী ছিলনা। অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা পছন্দ নয় বলে কারিগরী সাহায্যদানের কর্মসূচীতে সোভিয়েৎ সরকার অংশগ্রহণ করেনি (নিরপেক্ষ দেশগুলির সমর্থন লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে 1953 খৃষ্টাব্দে অবশ্য অংশগ্রহণ করেছিল)। সর্বতোভাবে কারিগরী ধরণের বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি ছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলিকে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ঘোরতর সন্দেহের চোখে দেখে এবং 'খাদ্য ও কৃষিসংস্থা' (FAO) ও 'আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার' (ICAO) সদস্যপদ গ্রহণ করেনি। সোভিয়েৎ সরকার 'বিশ্বব্যাঙ্ক' (World Bank) ও আন্তর্জাতিক অর্থকোষেরও' (IMF) সদস্য নয়। এই সরকার সবসময়ই রাষ্ট্রসংঘের স্বল্পব্যয় ও নাতিবৃহৎ সচিবালয়ের পক্ষপাতী। সোভিয়েৎ ইউনিয়নকর্তৃক রাষ্ট্রসংঘকে প্রদত্ত অর্থের অনুপাতে সচিবালয়ে সোভিয়েৎ নাগরিকদের নিয়োগের (অথবা সোভিয়েৎ সমর্থক অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নাগরিকদের) জন্য সোভিয়েৎ সরকার কখনই পীড়াপীড়ি করেনি। সচিবালয়ে নিযুক্ত সোভিয়েৎ নাগরিকদের ডিঙিয়ে সেখানে কর্মরত অন্যান্য দেশের নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও এই সরকার আপত্তি করেনি।

1949-50 খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের সবচেয়ে দুঃসময় যায়। ঐ সময় যুগোশ্লাভিয়া (যে দেশ সোভিয়েৎ গোষ্ঠীভুক্ত থাকতে অস্বীকার করে) নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়, সমাজতান্ত্রিক চীনকে রাষ্ট্রসংঘে চিয়াং কাইশেকের চীনের স্থলাভিষিক্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। এই সময়ে সোভিয়েৎ সরকার আন্তর্জাতিক বিচারালয় ব্যতীত রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সমস্ত সংস্থা বর্জন করে (সাত

মাস ধরে) এবং মহাসচিবের পদে (মিঃ লাইয়ের কার্যকাল বাড়িয়ে দেওয়াকে বেআইনী মনে করে) মিঃ লাইকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। এ সবের তুলনায় হাঙ্গেরী প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘকর্তৃক সোভিয়েৎ সরকারের সমালোচনা কম অপ্রীতিকর বলে মনে হয়। অবশ্য সুয়েজ প্রশ্নে সোভিয়েৎ প্রতিনিধি বৃটেন ও ফ্রান্সের নিন্দা করার সুযোগ পান।

সোভিয়েৎ ইউনিয়ন-অনুসৃত রাষ্ট্রসংঘ নীতিতে (যদিও গোড়ার দিকে যথেষ্ট পরিমাণে নিরুত্তাপ) অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়না। প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট দেশ হিসাবে (সোভিয়েৎ মতে) অছি চুক্তির আলোচনায় সোভিয়েৎ ইউনিয়নকে অংশগ্রহণ না করতে দেওয়ার প্রতিবাদে সোভিয়েৎ সরকার প্রথমদিকে অছি পরিষদ বর্জন করে। কিন্তু অছি পরিষদে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী প্রচারের সুবিধা দেখে পরবর্তী-কালে সোভিয়েৎ প্রতিনিধি ঐ পরিষদে ফিরে আসেন। একই কথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং সাধারণ সভার বিভিন্ন সমিতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য বলে মনে করা যেতে পারে।

ষাটের দশকের শুরুতে মহাকাশ বিজয়ের কৃতিত্বে এবং নিরপেক্ষ সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যাওয়ায় সোভিয়েৎ ইউনিয়ন আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়। এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে একযোগে রাষ্ট্রসংঘে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করে। সচিবালয়ে অধিকসংখ্যক সোভিয়েৎ নাগরিকদের নিয়োগের দাবী করে (অবশ্য সরকার অনুমোদিত নাগরিকদেরই)। 1960 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভায় ক্রুশ্চেভের উপস্থিতিকে রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে সোভিয়েৎ নীতির নূতন পর্য্যায় বলা চলে (নিরপেক্ষ দেশগুলির সমর্থনের দিক থেকেও সাধারণ সভায় ক্রুশ্চেভের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ)। ক্রুশ্চেভ ঐ বৎসরই 'তিনজন মহাসচিব' (Troika) নিয়োগের প্রস্তাব করেন (একজন পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতিনিধি, একজন সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলির প্রতিনিধি এবং আরেকজন নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতিনিধি হিসাবে)। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রসংঘের প্রশাসনিক বিষয়ে নিরপেক্ষ দেশ-গুলির অধিকতর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে পাশ্চাত্যের প্রাধান্য খর্ব করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এ প্রস্তাব সফল হয়নি।

সোভিয়েৎ সরকার 'কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী (ONUC) গঠনে বাধাদানে সফল না হলেও এই বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য দেয় টাকা

না দেওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব এড়াতে সমর্থ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, উক্ত বিষয়ে সাধারণ সভাকে অকেজো করার দায়ও মার্কিন সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পেরেছিল। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রশ্নে (সামরিক-শক্তিপ্রয়োগজনিত) সাধারণ সভাকে যথাযথ গণ্ডীর মধ্যে রেখে পরিষদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সোভিয়েৎ প্রচেষ্টাই সফল হয়েছে। অবশ্য সেজন্য সোভিয়েৎ সরকারের পছন্দ নয় পরিষদকৃত এমন কিছু কিছু প্রস্তাবও মেনে নিতে হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যকলাপ পছন্দ হোক আর নাই হোক, রাষ্ট্রসংঘের ভিতরে থাকার পথই সোভিয়েৎ সরকার অধিকতর শ্রেয়ঃ বলে ধরে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রসংঘের মত মূল্যবান সংগঠনকে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির একচেটিয়া হাতিয়ার না হতে দেওয়াই বিচক্ষণতা বলে সোভিয়েৎ নেতৃবৃন্দ মনে করেন। একথাও ঠিক যে, বিভিন্ন কারণে কোন গোষ্ঠীই রাষ্ট্রসংঘে একাধিপত্য বিস্তারে সফল হয়নি এবং তা' সম্ভবও নয়।

ভোটদানের দিক থেকে দেখতে গেলে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের অসুবিধা স্পষ্টই। তবে এর ভেটোক্ষমতা রয়ে গেছে এবং সোভিয়েৎ সরকার নিরপেক্ষ দেশগুলির সমর্থন কিছুটা লাভ করে অথবা (কিছু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ভোটদান থেকে বিরত থাকতে স্বীকৃত করতে পারলে), সমাজতান্ত্রিক জোটের দশভোটের জোরে যেকোন 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে' (Important questions) দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের ভিত্তিতে প্রস্তাব গ্রহণ থেকে সাধারণ সভাকে বিরত করতে পারে। তবে সব অসাফল্যই এক ধরণের নয়। কোন প্রস্তাবকে নাকচ করা যেতে পারে, কোনটিকে বিলম্ব করিয়ে দেওয়া যায়, আবার কোনটির সুর নরমও করা যায়। রাষ্ট্রসংঘের কাঠামো বা কাজের দিক থেকে দেখতে গেলে কোন অপ্রিয় ঘটনাকে ব্যাহত করা যায় এবং দৃঢ় প্রতিবাদে বন্ধও করা যায়। এগুলি নেতিবাচক লাভ হলেও লাভ ঠিকই। সোভিয়েৎ সরকার সদস্যপদ ত্যাগ করলে তাও সম্ভব হতোনা। অস্থায়ী পদত্যাগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হলেও সোভিয়েৎ সরকারও এ সত্য অনুধাবন করেছে।

রাষ্ট্রসংঘের জন্মের ছাব্বিশ বৎসর আগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনে বৃটেন আত্মনিয়োগ করে এবং অনেক দোষত্রুটি থাকলেও জাতিপুঞ্জের সাফল্যের দিনগুলিতে বৃটিশ অবদান যথেষ্টই ছিল। রাষ্ট্রসংঘের গঠন ও উন্নতির প্রত্যেকটি স্তরেও বৃটেন স্বীয় শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা

করেছে। তবে আনুপাতিকভাবে অনেক বেশী শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদানের তুলনায় বৃটিশ অবদান সমস্ত পর্য্যায়েই ম্লান হয়ে গেছে। তবুও, শক্তিই শেষ কথা নয়, আশা উদ্দীপনার প্রশ্নও আছে। জাতিপুঞ্জের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিপুঞ্জ সংক্রান্ত উৎসাহ এবং আশারও (অলীক) সমাপ্তি ঘটে। রাষ্ট্রসংঘের প্রতি সদস্যরাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গী অধিকতর বাস্তবধর্মী হলেও পুরোনো মমতা (জাতিপুঞ্জের উপরে অর্পিত) রাষ্ট্রসংঘ পেতে পারেনা। বস্তুতঃ কিছু কিছু অলৌকিক ধারণা একবার ভেঙ্গে গেলে আর সেগুলি গড়ে তোলা সম্ভব হয়না। জাতিপুঞ্জ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। ফলে, রাষ্ট্রসংঘের বিষয়ে পুরোনো উৎসাহ দেখানো বৃটেনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া জাতিপুঞ্জ ছিল মূলতঃ ইউরোপীয়, কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের জগৎ অনেক দূরে এবং অনেক বড়। নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তর স্থাপিত হলে আটলাণ্টিক মহাসাগরই শুধু বাধা হয়ে দাঁড়ায়না, আর্থিক বাধা অতিক্রম করাও বৃটেনের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের মিত্র রাষ্ট্র হলেও অনেক দূরে অবস্থিত এক রূপকথার দেশ (বৃটিশ জনগণের কাছে) এবং বৃটিশ নাগরিকগণের পক্ষে নিউইয়র্কে পৌঁছনো সহজসাধ্যও ছিলনা। লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলিই নিউইয়র্কে নিয়মিত প্রতিনিধি রাখতে পারতোনা। তাছাড়া, যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় রাষ্ট্রসংঘের প্রতি খুব বেশী আগ্রহ প্রকাশ করা বৃটিশ জনগণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবুও, সদস্যপদ গ্রহণের ও রাষ্ট্রসংঘকে সমর্থন জানানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বৃটিশ জনমানসে কখনও কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি। জাতিপুঞ্জের তুলনায় রাষ্ট্রসংঘের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা বৃটেন তত্ত্বগতভাবেই স্বীকার করতো। তবে প্রত্যাশা সীমিত থাকায় রাষ্ট্রসংঘের ব্যাপারে অত্যুৎসাহ বজায় রাখা বৃটেনের পক্ষে সহজ ছিলনা।

নিরাপত্তা পরিষদ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শিকার হলে বৃটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত হতাশও হয়নি এবং রাষ্ট্রসংঘকর্তৃক সামরিক শক্তিপ্রয়োগ-সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষদ থেকে সাধারণ সভার নিকট ক্ষমতা স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে মার্কিনীদের মত উৎসাহিতও হয়নি। ইউরোপের ব্যাপারে বৃটেনের আশা-ভরসা রাষ্ট্রসংঘের চেয়ে 'আটলাণ্টিক চুক্তি' (NATO) ও 'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংগঠনের' (EEC) উপরই বেশী ছিল। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে বৃটেন সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেও উক্ত প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত করে ভাবতে পারেনি ; এজন্য কোরিয়া প্রশ্নের

পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ মানসে রাষ্ট্রসংঘের ভাবমূর্তির উন্নতি না হলেও বৃটেন রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত খুব বেশী হতাশ বোধ করেনি। সুয়েজ প্রশ্নে বৃটেন রাষ্ট্রসংঘে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হলেও রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে বৃটিশ মনে তেমন কোন অনীহার উদ্রেক হয়নি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকাকে বৃটেন সমর্থনই করে এসেছে। তবে যুদ্ধের পর থেকে বৃটেনে আর্থিক অনটনের জন্য উপরিউক্ত ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রশ্নে যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও বৃটিশ সরকারকে দ্বিতীয় সারির ভূমিকাই নিতে হয়েছে।

উপনিবেশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের নীতির সঙ্গে বৃটেন (যুদ্ধোত্তর যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা হিসাবে) নিজের স্বার্থ সর্বদাই জড়িত বোধ করেছে। বৃটিশ-সাম্রাজ্য ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখেই উপনিবেশের প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের আগ্রহ বেড়েছে। রাষ্ট্রসংঘের প্রথম 126টি সদস্যরাষ্ট্রের আটাশটিই বৃটেনের কাছ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা লাভ করেছে। উপনিবেশের প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের নীতি এবং বৃটিশ স্বার্থের মধ্যে সংঘাত স্বাভাবিক কারণেই থেকে গেছে। নীতির দিক থেকে রাষ্ট্রসংঘ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষপাতী (যেকোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক) এবং উপনিবেশ-বিরোধী ও পূর্বে উপনিবেশ ছিল এমন সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের চাপের ফলে রাষ্ট্রসংঘ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে (স্বভাবতঃই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও) বিতৃষ্ণা ও উষ্মা প্রকাশের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃটেনের বিভিন্ন উপনিবেশের প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘে তীব্র সমালোচনার মুখে বৃটিশ প্রতিক্রিয়াও উগ্র হয়েছে। এবং বৃটেনের উপনিবেশসংখ্যা উত্তরোত্তর কমতে থাকলেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে উত্তেজনা বড় একটা কমেনি। রোডেশিয়া, সাইপ্রাস, এডেন, জিব্রাল্টার এবং অবশিষ্ট আরও কয়েকটি বৃটিশ উপনিবেশের প্রশ্নে সাধারণ সভার এবং বৃটিশ সংসদের বিতর্কের বিবরণী পড়লে মনে হবে যে, উপনিবেশের সংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বরং বেড়েছে। তবে এটাই শেষ কথা নয়। উপনিবেশের প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের সমালোচনায় বৃটেন বিরক্ত হলেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে (যেমন, দক্ষিণ রোডেশিয়ায় স্মিথ সরকারের 'একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা') বিব্রত বৃটিশ সরকার রাষ্ট্রসংঘের সমর্থন সকৃতজ্ঞভাবেই গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসাবে বৃটেনের ভূমিকার সবখানি পরীক্ষা

করলে দেখা যায় যে, দুটি বিপরীতধর্মী শক্তি একই সঙ্গে কাজ করেছে। বৃটিশ সরকারকে অনেক সময়েই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং জাতীয় স্বার্থের কারণে বৃটিশ সরকার অনেক সময়ই রাষ্ট্র-সংঘের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে পারেনি। তবে একথাও ঠিক যে, বিশ্বের প্রায় সমস্ত জাতির মিলনকেন্দ্র হিসাবে রাষ্ট্রসংঘ-অর্পিত সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৃটেনের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের সদ্ব্যবহারও অনেক সময়ই করা হয়নি। রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বৃটিশ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করা হয়নি। রাষ্ট্রসংঘে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিভাধর ব্যক্তিগণের নিয়োগও খুব কম হয়েছে। একমাত্র সুয়েজ সঙ্কটের সময় ছাড়া বৃটিশ জনগণ রাষ্ট্র-সংঘের কার্য্যকলাপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ বড় একটা পাননি। 1964 খৃষ্টাব্দে বৃটিশ শ্রমিক দল (Labour Party) সরকার গঠন করে লর্ড ক্যারাডনকে (Lord Caradon) স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করলে বৃটেনের রাষ্ট্রসংঘ নীতিতে খানিকটা বলিষ্ঠতা এবং সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থা চলার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যদান সূচীতে বৃটেন সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তেমন একটা অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তাছাড়া উপনিবেশের প্রশ্নে (বিশেষ করে রোডেশিয়া প্রশ্নে) তিক্ততা থেকেই গেছে। ফলে, রাষ্ট্রসংঘে বৃটিশ ভাবমূর্তি তেমন উন্নীত করা সম্ভব হয়নি। তবে আশা করা যায় যে, রাষ্ট্রসংঘের অপরিহার্য্যতা সম্পর্কে এবং এই সংগঠনের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বৃটেনের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হবে।

যদিও স্থানাভাবের কারণে রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর পৃথক আলোচনা সম্ভব নয়, তবুও সাধারণ সভায় ভোটদান ও বিতর্কের দিক থেকে দেখতে গেলে সদস্যরাষ্ট্রগুলির একটি বিশেষ গোষ্ঠীর উল্লেখ না করে পারা যায়না। এই গোষ্ঠীটি বিশেষ কোন একটি নামে পরিচিত নয়। আফ্রো-এশীয়, 'নিরপেক্ষ' (Non-aligned), 'ঔপনিবেশিকতা বিরোধী' প্রভৃতি নামে এই গোষ্ঠীকে উল্লেখ করা হয়। এই গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা রাষ্ট্রসংঘের মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী।

উপরিউক্ত গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধতা সম্পর্কে অনেক সময়ই অতিরঞ্জন করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রসংঘে বহুবিধ প্রশ্নে এই গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। তবুও একথা ঠিক যে, কিছু কিছু বিষয়ে এরা

একই রকমের অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণার শরিক। প্রথমতঃ এই দেশগুলির অধিকাংশই সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত। রাষ্ট্রসংঘের আদি সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আফ্রিকার দেশ ছিল তিনটি—মিশর, ইথিওপিয়া ও লাইবেরিয়া; এশিয়া থেকে (মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিয়ে) ছিল চীন, ভারত, ইরাণ ও ফিলিপাইনস্। এই গোষ্ঠীভুক্ত অধিকাংশ দেশই রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ অল্পকাল য়াবৎ পাওয়ার বিষয়ে সচেতন এবং এদের দৃষ্টিভঙ্গী ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হয়নি সে বিষয়েও এরা সচেতন। অতএব সংগঠনের প্রধান অঙ্গগুলিতে প্রতিষ্ঠালাভের প্রশ্নে এই দেশগুলি এক মত। তাছাড়া এই গোষ্ঠীভুক্ত অনেক দেশই রাষ্ট্রসংঘকে ত্রাতা বলে মনে করে (বিশেষ করে অছিভুক্ত অবস্থা থেকে যে অঞ্চলগুলি স্বাধীনতা লাভ করেছে) এবং পুরোনো মনিবদেশগুলির উপর নির্ভরতা এড়ানোর প্রশ্নেও এরা রাষ্ট্রসংঘের উপরই সর্বাধিক নির্ভরশীল। সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশের কূটনীতিবিদগণ রাষ্ট্রসংঘে স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারার সুযোগকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ এই দেশগুলি জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রসংঘের সহায়তার উপর খুব বেশী নির্ভরশীল। এজন্যই এরা রাষ্ট্রসংঘ-প্রদত্ত সবরকম সাহায্যে—কারিগরী, প্রশাসনিক ও আর্থিক—প্রচণ্ড আগ্রহী। এরা চায় যে, রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যসূচী সর্বতোভাবে সম্প্রসারিত করা হোক এবং রাষ্ট্রসংঘের একটি লগ্নী তহবিল প্রতিষ্ঠার জন্য এই দেশগুলি খুব বেশী উৎসাহী। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করার সুযোগের মূল্য সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই সমস্ত দেশের নিকট নিতান্ত কম নয়। স্বাধীনতা লাভের পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত জাতীয়তাবাদের পূজা অনেক দেশেই চলতে থাকে এবং সেদিক থেকে রাষ্ট্রসংঘই এই দেশগুলির পরিচয় প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের (সবে স্বাধীনতা পেলেও, অত্যন্ত ছোট হলেও অথবা রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকার যোগ্যতা না থাকলেও) একটি করে ভোট থাকার জন্য কোন সদস্যরাষ্ট্রই অবজ্ঞার পাত্র নয়। নিজেদের জাতীয় অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এই সব দেশ ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী এবং উপনিবেশ সংক্রান্ত নয় এমন সমস্ত প্রশ্নে পুরোনো (ঔপনিবেশিক) রাষ্ট্রগুলির বিবাদ সম্পর্কে উদাসীন। তবে এই বক্তব্য সর্বতোভাবে সত্য নয়। কারণ হিসাবে বলা যায় যে, 'গণতন্ত্র' ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে আদর্শগত লড়াইয়ের প্রভাব এই দেশগুলির উপরও

পড়েছে এবং এই লড়াইয়ের ফলে এদের ঐক্যেও ফাটল ধরেছে। ইচ্ছা করলেও সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ থাকা এই দেশগুলির পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রসংঘ এমন একটি সংগঠন যে সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করা না করা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন। রাষ্ট্রসংঘের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়ার চুক্তির মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়েছে; এই সংগঠনের উদ্দেশ্যসমূহ আংশিকভাবে মূল চুক্তিতে (চার্টার) লিপিবদ্ধ হলেও দেখা যায় যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহের দাবীর কারণে সেগুলির পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য যুগান্তকারী হলেও সেগুলি পূরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতীত রাষ্ট্রসংঘে কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার (দায়িত্বও) রাষ্ট্রসংঘের আছে। বস্তুতঃ চার্টারবর্ণিত উদ্দেশ্যসাধনে রাষ্ট্রসংঘ সমর্থ হয়নি এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নিকট এই সংগঠনের অঙ্গীকার ও দাবীর ভিত্তি চার্টার প্রণেতাগণের ধারণা অনুযায়ী থাকা হয়নি। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা যথার্থভাবে পালিত হয়নি এবং এক্ষেত্রে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্য্যকারিতা সদস্যরাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছার উর্ধ্বে নয় অথবা সদস্যরাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছা থেকে পৃথক রাষ্ট্রসংঘের কোন ইচ্ছা নেই। রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের মতামত প্রকাশের এবং বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কেন্দ্র মাত্র।

উপরিউক্ত বক্তব্য আংশিকভাবেই সত্য, সর্বাংশে নয়। রাষ্ট্রসংঘ সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক সৃষ্ট সংগঠন হলেও এর স্বকীয় সত্তা আছে। কিছু কিছু বিষয়ে এই সত্তার স্ফূরণ আমরা দেখতে পাই। প্রথমতঃ সদস্যরাষ্ট্রসমূহ মেনে চলবে এমন কিছু নির্দেশ রাষ্ট্রসংঘ দিয়েছে এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহ সেগুলি মেনে চলার অঙ্গীকারও করেছে। তাছাড়াও, স্থিরীকৃত পদ্ধতি অনুসারে আলোচনা ও বিতর্ক করার ব্যবস্থা রাষ্ট্রসংঘে আছে এবং সেই পদ্ধতি অনুসারে আলোচনা বা বিতর্কের ফল হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদ (যাকে রাষ্ট্রসংঘের মতবাদ বলা যেতে পারে) গঠনের সুযোগও রাষ্ট্রসংঘ দিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ মূলতঃ বলপ্রয়োগকারী সংগঠন না হলেও অন্যায় কাজে লিপ্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নৈতিক চাপ (যা' অবজ্ঞা করা দুরূহ) সৃষ্টি করার সামর্থ্য এর আছে। অতএব দেখা

যায় যে, রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্য উল্টে দিতে না পারলেও অথবা আক্রমণে সংকল্পবদ্ধ ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দুর্বল রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে না পারলেও বিভিন্ন প্রশ্নের ন্যায্য এবং শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম এবং তারজন্য প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক যোগাযোগ এবং আলোচনার ব্যবস্থা রাষ্ট্রসংঘে রয়েছে। সচিবালয়কে, বিশেষ করে মহাসচিবকে, আন্তর্জাতিক বিবেকের (Conscience) প্রতিফলন এবং রাংষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যপূরণের মাধ্যম বলা যেতে পারে। মহাসচিব ও তাঁর অধস্তন কর্মচারীগণ বিবদমান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সালিশী করতে পারেন,—প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন, কোন বিষয়ে উৎসাহ দান করতে পারেন এবং সতর্ক করতে পারেন। তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতার উপরেই তাঁদের কার্য্যকারিতা নির্ভরশীল। এপর্য্যন্ত অর্জিত কৃতিত্বের ভিত্তিতেই বলা চলে যে, রাষ্ট্রসংঘের স্বকীয় সত্তা আছে; বলা যেতে পারে যে, সেই সত্তা সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে একত্রিত করলে যা' হয় তার চেয়ে বড়। তবে কতখানি বড় তা' এখনও অনিশ্চিত। পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে, রাষ্ট্রসংঘের যাত্রা সবে শুরু হয়েছে। চার্টারবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণে রাষ্ট্রসংঘ সমর্থ হবে কিনা তা' নির্ভর করে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতির উপর এবং নিজেদের সৃষ্ট সংগঠনকে সফল করে তুলতে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রচেষ্টাগত সততা ও নিষ্ঠার উপর।

অতিরিক্ত সংযোজন

THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS

রাষ্ট্রসংঘের চার্টার

We, the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom, and for these ends

to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and

to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples, have resolved to combine our efforts to accomplish these aims.

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

আমরা, রাষ্ট্রসংঘভুক্ত জাতিসমূহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—যুদ্ধের যে অভিশাপ আমাদের জীবনকালেই দুবার মানবজাতির অবর্ণনীয় যন্ত্রণার কারণ হয়েছে সেই যুদ্ধজনিত ভয়াবহতার কবল থেকে আমাদের উত্তরপুরুষদের মুক্ত রাখার জন্য, এবং
মানুষের মৌলিক অধিকারে, ব্যক্তির মর্য্যাদা ও যোগ্যতার উপরে, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে এবং ছোটবড় নির্বিশেষে সমস্ত জাতির সমান অধিকারে আমাদের বিশ্বাস অটুট রাখার জন্য, এবং
ন্যায়বিচারের উপযোগী এবং চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য উৎস-সমূহসম্ভূত দায়ের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য, এবং
বৃহত্তর স্বাধীনতার কাঠামোর মধ্যে সামাজিক প্রগতি ও উন্নততর জীবনমান-কল্পে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং
এই উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবরূপায়ণকল্পে সহনশীলতা ও শান্তির মধ্যে হিতৈষী প্রতিবেশীর মত পারস্পরিক জীবনযাপন করার জন্য, এবং
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে আমাদের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, এবং
কিছু নীতি ও প্রণালী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্বিক স্বার্থের প্রয়োজন ব্যতীত সামরিক শক্তির প্রয়োগ নিষিদ্ধ করার জন্য, এবং
সমস্ত জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ের ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করার জন্য সম্মিলিতভাবে আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে সংকল্পবদ্ধ।

সেজন্যই, সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ তাঁদের নিজ নিজ সরকারকর্তৃক আরোপিত ক্ষমতার আইনসম্মত ও সার্বিক প্রয়োগের বলে বর্তমান চার্টারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছেন এবং রাষ্ট্রসংঘ নামক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করছেন।

CHAPTER I

Purposes and Principles

Article 1.

The purposes of the United Nations are :

1. To maintain international peace, and security, and to that end : to take effective collective measures for the

prevention and removal of threats to the peace and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace ;

2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace ;

3. To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion ; and

4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

প্রথম অধ্যায়

উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ

1 নম্বর ধারা।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে :—

1. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং তার জন্য : কার্য্যকরীভাবে সমষ্টিগত ব্যবস্থা অবলম্বন করে শান্তির প্রতি হুমকী বন্ধ করা এবং অপসারিত করা, আগ্রাসী কার্য্যকলাপ দমন করা এবং অন্যান্য প্রকারে শান্তিভঙ্গ হলে তা দমন করা ; এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও ন্যায়বিচারের নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে শান্তিভঙ্গের কারণ হতে পারে এমন সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের অথবা পরিস্থিতির ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান ও নিষ্পত্তি সাধন করা ;

2. সমস্ত জাতির সমান অধিকারের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতির প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং অন্যান্য যথাযথ ব্যবস্থা অধিগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বজনীন শান্তি শক্তিশালী করা ;

3. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবিক ধরণের সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে এবং বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা এবং ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন এবং উৎসাহদানের জন্য আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা ;

4. উপরিউক্ত সমস্ত সার্বজনীন উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিভিন্ন দেশের কার্য্যধারার মধ্যে সমন্বয়সাধনের কেন্দ্রস্থল হওয়া ।

Article 2.

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.

2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.

3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.

7. Nothing contained in the present Charter shall

authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter ; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

2 নম্বর ধারা।

1 নম্বর ধারায় বর্ণিত সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ এবং সমস্ত সভ্যরাষ্ট্র নিম্নোল্লিখিত নীতিসমূহ অনুসারে কাজ করবে।

1. রাষ্ট্রসংঘ এর সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বগত সাম্যের নীতির উপর ভিত্তিশীল।

2. যাতে সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রই রাষ্ট্রসংঘের সভ্যপদজনিত অধিকার ও সুবিধা ভোগ করতে পারে সেজন্য সমস্ত সভ্যরাষ্ট্র বর্তমান চার্টার অনুসারে অঙ্গীকারকৃত দায় বিশ্বস্তভাবে পালন করবে।

3. সমস্ত সভ্যরাষ্ট্র তাদের সব আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি এমনভাবে করবে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার বিপন্ন না হয়।

4. সমস্ত সভ্যরাষ্ট্র তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ করা বা শক্তিপ্রয়োগের হুমকী দেওয়া থেকে বিরত থাকবে—যা' কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত সংহতি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিপন্থী অথবা অন্য কোনপ্রকারে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সঙ্গতিহীন।

5. বর্তমান চার্টার অনুসারে গৃহীত সমস্ত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমস্ত সভ্যরাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে এবং এমন কোন রাষ্ট্রকে সাহায্যদান থেকে বিরত থাকবে যার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ শান্তিভঙ্গ নিবারণমূলক ব্যবস্থা বা শান্তিবলবৎমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

6. রাষ্ট্রসংঘ এমন ব্যবস্থা করবে যাতে রাষ্ট্রসংঘের সভ্য নয় এমন সমস্ত রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন এই নীতিসমূহ অনুসারে কাজ করে।

7. বর্তমান চার্টারের অন্তর্গত কোন কিছুর বলেই রাষ্ট্রসংঘ এমন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা যে সমস্ত বিষয় সর্বতোভাবে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারে পড়ে অথবা সেই সমস্ত বিষয় বর্তমান চার্টার অনুসারে নিষ্পত্তি করার জন্য রাষ্ট্রসংঘে উপস্থাপিত করার কোন বাধ্য-

বাধকতাও কোন সভ্যরাষ্ট্রের থাকবেনা ; কিন্তু এই নীতি চার্টারের সপ্তম অধ্যায় অনুসারে গৃহীত কোন শান্তিবলবৎমূলক ব্যবস্থার অন্তরায় হবেনা ।

CHAPTER II

Membership

Article 3.

The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of January 1, 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সভ্যপদ

3 নম্বর ধারা ।

যেসমস্ত রাষ্ট্র সানফ্রান্সিস্কো শহরে অধিষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন সংক্রান্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণপূর্বক অথবা তৎপূর্বে সম্মিলিত জাতিসমূহের 1942 খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারীর ঘোষণায় সাক্ষরদানপূর্বক বর্তমান চার্টারে স্বাক্ষর করছে এবং 110 নম্বর ধারা অনুযায়ী বর্তমান চার্টার অনুসমর্থন করছে, সেই সমস্ত রাষ্ট্রই হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের আদি সভ্য ।

Article 4.

1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgement of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.

2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the

General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

4 নম্বর ধারা।

1. অন্যান্য শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রসমূহ, যারা বর্তমান চার্টারকর্তৃক আরোপিত দায় স্বীকার করবে এবং যারা রাষ্ট্রসংঘের বিবেচনায় উক্ত দায় পালন করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক সেই সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

2. এধরণের কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদপ্রাপ্তি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তে কার্য্যকর হবে।

Article 5.

A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.

5 নম্বর ধারা।

যদি কোন সভ্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিভঙ্গ নিবারণমূলক অথবা শান্তিবলবৎমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে উক্ত রাষ্ট্রের সভ্যপদজনিত অধিকার ও সুবিধাসমূহের ভোগ সাময়িকভাবে নাকচ করতে পারবে। নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত অধিকার ও সুবিধাসমূহের ভোগ পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

Article 6.

A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

6 নম্বর ধারা।

যদি কোন সভ্যরাষ্ট্র বর্তমান চার্টারভুক্ত নীতিসমূহ ক্রমাগত ভঙ্গ করে তবে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা উক্ত সভ্যরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসংঘ থেকে বহিষ্কার করতে পারবে।

CHAPTER III

Organs

Article 7.

1. There are established as the principal organs of the United Nations : a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice, and a Secretariat.

2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.

তৃতীয় অধ্যায়

অঙ্গসমূহ

7 নম্বর ধারা।

1. রাষ্ট্রসংঘের স্থাপিত মুখ্য অঙ্গসমূহ হলো : একটি সাধারণ সভা, একটি নিরাপত্তা পরিষদ, একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, একটি অছি পরিষদ, একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং একটি সচিবালয়।

2. প্রয়োজনবোধে কিছু অনুপূরক অঙ্গ বর্তমান চার্টার অনুসারে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারবে।

Article 8.

The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs.

8 নম্বর ধারা।

রাষ্ট্রসংঘের মুখ্য ও অনুপূরক অঙ্গসমূহে যেকোন পদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একই ধরণের অবস্থায় কোন যোগ্যতাগত বৈষম্য আরোপ করবেনা।

CHAPTER IV

The General Assembly

Composition

Article 9.

1. The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.

2. Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ সভা

গঠন

9 নম্বর ধারা।

1. রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রকে নিয়ে সাধারণ সভা গঠিত হবে।

2. কোন সদস্যরাষ্ট্রেরই পাঁচজনের বেশী প্রতিনিধি সাধারণ সভায় থাকবেনা।

Functions and Powers

Article 10.

The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.

কার্য্যসমূহ ও ক্ষমতাবলী

10 নম্বর ধারা।

12 নম্বর ধারায় বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া বর্তমান চার্টারের এক্তিয়ারের

যাবতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে বা বিষয় সম্পর্কে অথবা বর্তমান চার্টার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের যে কোন অঙ্গের কার্য্যসমূহ বা ক্ষমতাবলী সম্পর্কে সাধারণ সভা আলোচনা করতে পারবে এবং উক্ত বিষয়াদি অথবা প্রশ্নাদি সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের কাছে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের কাছে অথবা উভয়ের কাছেই সুপারিশ পেশ করতে পারবে।

Article 11.

1. The General Assembly may consider the general principles of cooperation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.

2. The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such question, on which action is necessary, shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.

3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.

4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10.

11 নম্বর ধারা।

1. সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাধারণ নীতিসমূহ বিবেচনা করতে পারবে এবং উক্ত নীতিসমূহের ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের কাছে বা নিরাপত্তা পরিষদের কাছে অথবা উভয়ের কাছেই সুপারিশ পেশ করতে পারবে।

2. রাষ্ট্রসংঘের কোন সদস্যকর্তৃক অথবা নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক অথবা বর্তমান চার্টারের 35 নম্বর ধারার 2 নম্বর উপধারা বলে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয় এমন কোন রাষ্ট্রকর্তৃক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা সংক্রান্ত কোন বিষয় সাধারণ সভার সম্মুখে আনীত হলে সাধারণ সভা 12 নম্বর ধারায় বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া উক্ত বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের কাছে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের কাছে অথবা উভয়ের কাছেই উক্ত বিষয়ে সুপারিশ পেশ করতে পারবে। এরূপ ধরণের কোন বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘকর্তৃক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে সাধারণ সভা আলোচনার আগে অথবা পরে উক্ত বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করবে।

3. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে এমন সমস্ত পরিস্থিতির প্রতি সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

4. এই ধারায় বর্ণিত সাধারণ সভার ক্ষমতাবলী 10 নম্বর ধারার সাধারণ এক্তিয়ারের উপর সীমা আরোপ করবেনা।

Article 12.

1. While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendations with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.

2. The Secretary-General with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters.

12 নম্বর ধারা।

1. বর্তমান চার্টারকর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ বা কোন পরিস্থিতি বিবেচনা করতে থাকলে সাধারণ সভা উক্ত বিবাদ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন

সুপারিশ পেশ করতে পারবেনা. যদি নিরাপত্তা পরিষদ অনুরূপ অনুরোধ না করে।

2. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জড়িত কোন বিষয়াদি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন থাকলে মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতিক্রমে সে সম্পর্কে সাধারণ সভাকে প্রত্যেক অধিবেশনে অবহিত করবেন এবং উক্ত ধরণের বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যকলাপ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তা' সাধারণ সভাকে অথবা যদি সাধারণ সভার অধিবেশন না চলতে থাকে তবে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন।

Article 13.

1. The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of :

(a) promoting international cooperation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification ;

(b) promoting international cooperation in the economic, social, cultural, educational and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

2. The further responsibilities, functions, and powers of the General Assembly with respect to matters mentioned in paragraph 1(b) above are set forth in Chapters IX and X.

13 নম্বর ধারা।

1. এতোদ্দেশ্যে সাধারণ সভা আলোচনায় উদ্যোগী হবে এবং সুপারিশ করবে :

(a) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমান্বিত উন্নতি ও উহাকে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে উৎসাহ দান ;

(b) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নতি এবং জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা আদায় করার ব্যাপারে সাহায্য করা।

2. উপরে উল্লিখিত 1(b) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াদির ব্যাপারে সাধারণ সভার অন্যান্য সমুদয় দায়িত্ব, কার্য্য ও ক্ষমতা নবম এবং দশম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

Article 14.

Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjusment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.

14 নম্বর ধারা।

যেকোন পরিস্থিতি, তার উৎস যা-ই হোক না কেন, যা' সাধারণ কল্যাণ অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ব্যাহত করতে পারে অথবা বর্তমান চার্টারের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ সম্পর্কিত বিধানাদি ভঙ্গের জন্য যে পরিস্থিতির উদ্ভব, সেসমস্ত পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 12 নম্বর ধারার বিধানাদি সাপেক্ষে সাধারণ সভা কার্য্যক্রম সুপারিশ করতে পারবে।

Article 15.

1. The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council ; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security.

2. The General Assembly shall receive and consider reports from other organs of the United Nations.

15 নম্বর ধারা।

1. নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক প্রেরিত বার্ষিক অথবা বিশেষ প্রতিবেদন সাধারণ সভা গ্রহণ করবে এবং বিবেচনা করবে ; এই সমস্ত প্রতিবেদনের মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক গৃহীত কার্য্যক্রমের সিদ্ধান্ত বা কৃতকার্য্যের খতিয়ান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

2. রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য অঙ্গসমূহের কাছ থেকে সাধারণ সভা প্রতিবেদন গ্রহণ করবে এবং বিবেচনা করবে।

Article 16.

The General Assembly shall perform such functions with respect to the international trusteeship system as are assigned to it under Chapters XII and XIII, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic.

16 নম্বর ধারা।

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়বলে সাধারণ সভার উপরে ন্যস্ত অথচ সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্থিরীকৃত নয় এমন সমস্ত এলাকার জন্য অছিচুক্তির অনুমোদনসহ আন্তর্জাতিক অছিব্যবস্থাজনিত কার্য্যাদি সাধারণ সভা সম্পন্ন করবে।

Article 17.

1. The General Assembly shall consider and approve the budget of the Organization.

2. The expenses of the organization shall be borne by the Members as apportioned by the General Assembly.

3. The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies concerned.

17 নম্বর ধারা।

1. রাষ্ট্রসংঘের বাজেট সাধারণ সভা বিবেচনা এবং অনুমোদন করবে।

2. রাষ্ট্রসংঘের ব্যয় সাধারণ সভাকর্তৃক স্থিরীকৃত ব্যবস্থানুযায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহ বহন করবে।

3. 57 নম্বর ধারায় উল্লিখিত বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সাথে অর্থ সংক্রান্ত বা বাজেট সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি সাধারণ সভা বিবেচনা ও অনুমোদন করবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির নিকট সুপারিশ পেশ করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির প্রশাসনিক বাজেট পরীক্ষা করবে।

Voting

Article 18.

1. Each member of the General Assembly shall have one vote.

2. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting. These questions shall include : recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of the members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1(c) of Article 86, the admission of new Members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions.

3. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting.

ভোট ব্যবস্থা

18 নম্বর ধারা।

1. সাধারণ সভার প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকবে।

2. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত উপস্থিত ও ভোটদানরত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে হবে। এধরণের বিষয়ের মধ্যে থাকবে: আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপারিশ, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, 86 নম্বর ধারার 1(c) অনুচ্ছেদ অনুসারে অছি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, রাষ্ট্রসংঘে নতুন সদস্যরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি, সদস্যপদজনিত অধিকার ও সুবিধাদির সাময়িক প্রত্যাহার, কোন সদস্যরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসংঘ থেকে বহিষ্কার, অছিব্যবস্থা পরিচালনাগত প্রশ্নাদি এবং বাজেটসংক্রান্ত প্রশ্নাদি।

3. অতিরিক্ত কোন্ কোন্ ধরণের বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যা-

গরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত হবে তা' স্থিরীকরণসহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত উপস্থিত এবং ভোটদানরত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হবে।

Article 19.

A Member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The General Assembly may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

19 নম্বর ধারা।

যদি কোন সদস্যরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসংঘকে দেয় টাকা বকেয়া হয় এবং যদি বকেয়া টাকার অঙ্ক উক্ত সদস্যরাষ্ট্রকর্তৃক রাষ্ট্রসংঘকে পূর্বের দুই বৎসরে দেয় টাকার অঙ্কের সমান বা অধিক হয়, তবে উক্ত সদস্যরাষ্ট্রের ভোটদানের অধিকার থাকবেনা। অবশ্য সাধারণ সভা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে টাকা না দিতে পারার কারণ সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রের আয়ত্তের বাহিরে তবে সাধারণ সভা উক্ত সদস্যরাষ্ট্রকে ভোটদানের অনুমতি দিতে পারে।

Procedure

Article 20.

The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security Council or of a majority of the Members of the United Nations.

কার্যপ্রণালী

20 নম্বর ধারা।

সাধারণ সভা নিয়মিত বাৎসরিক অধিবেশনে এবং প্রয়োজন হলে বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদের অথবা রাষ্ট্রসংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাষ্ট্রের অনুরোধক্রমে মহাসচিব সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করবেন।

Article 21.

The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its President for each session.

21 নম্বর ধারা ।

সাধারণ সভা এর নিজের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কিত নিয়মকানুন প্রচলন করবে । প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য এ এর একজন সভাপতি নির্বাচন করবে ।

Article 22.

The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

22 নম্বর ধারা ।

সাধারণ সভা এর কার্য্যাদি সম্পন্ন করার জন্য এর নিজের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় একাধিক অনুপূরক অঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে ।

CHAPTER V

The Security Council

Composition

Article 23.

1. The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance, to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution.

2. The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members after the increase of the membership of the Security Council from eleven to fifteen, two of the four additional members shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election.

3. Each member of the Security Council shall have one representative.

পঞ্চম অধ্যায়

নিরাপত্তা পরিষদ

গঠন

23 নম্বর ধারা ।

1. রাষ্ট্রসংঘের পনেরোটি সদস্যরাষ্ট্রকে নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হবে। গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন,* ফ্রান্স, সংযুক্ত সোভিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, গ্রেট বৃটেন এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হবে। প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাসহ রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অবদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে এবং পৃথিবীর ন্যায্য ভৌগোলিক বিভাগের প্রতিও লক্ষ্য রেখে সাধারণ সভা অন্যান্য দশটি সদস্যরাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে নির্বাচিত করবে।

2. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহ দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা এগার থেকে পনেরোতে বৃদ্ধি হওয়ার পরে অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নির্বাচনে অতিরিক্ত চারটি সদস্যরাষ্ট্রের দুইটি এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদে কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কোন অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র পুনর্নির্বাচিত হতে পারবেনা।

3. নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে।

---

* চিয়াং কাইশেকের চীনের পরিবর্তে

Functions and Powers

Article 24.

1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.

2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.

3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

কার্য্যসমূহ ও ক্ষমতাবলী

24 নম্বর ধারা।

1. রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যক্রমকে ত্বরান্বিত ও কার্য্যকরী করার জন্য সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ নিরাপত্তা পরিষদের উপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পণ করছে এবং স্বীকার করছে যে এই দায়িত্বের খাতিরে নিরাপত্তা পরিষদ যেসমস্ত কর্তব্য পালন করবে তাহা রাষ্ট্রসংঘের প্রতিভূ হিসাবেই করবে।

2. রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের প্রতি সঙ্গতি রেখেই নিরাপত্তা পরিষদ এই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হবে। এই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের উপর অর্পিত সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাবলী বর্তমান চার্টারের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

3. সাধারণ সভার বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার কাছে বার্ষিক এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করবে।

Article 25.

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.

25 নম্বর ধারা।

বর্তমান চার্টার অনুসারে গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ এবং পালন করবে বলে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ সম্মত হচ্ছে।

Article 26.

In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulations of armaments.

26 নম্বর ধারা।

পৃথিবীর মানবিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের ন্যূনতম অংশ যাতে অস্ত্রাদির কারণে ব্যয়িত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উন্নয়ন ও রক্ষণের জন্য 47 নম্বর ধারায় উল্লিখিত সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর সাহায্যে অস্ত্রাদি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে পরিকল্পনাদি প্রস্তুত করার এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নিকট পেশ করার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের।

Voting

Article 27.

1. Each member of the Security Council shall have one vote.

2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.

3. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members ; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.

ভোট ব্যবস্থা

27 নম্বর ধারা।

1. নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকবে।

2. প্রণালীগত প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ নয়টি সদস্য-রাষ্ট্রের সম্মতিবাচক ভোটে গৃহীত হবে।

3. এছাড়া অন্যসমস্ত ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সম্মতিসূচক ভোটসহ নয়টি সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতি-বাচক ভোটে গৃহীত হবে ; তবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং 52 নম্বর ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে বিবদমান সদস্যরাষ্ট্র ভোটদান থেকে বিরত থাকবে।

Procedure

Article 28.

1. The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.

2. The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative.

3. The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as in its judgment will best facilitate its work.

কার্যপ্রণালী

28 নম্বর ধারা।

1. নিরাপত্তা পরিষদ এমনভাবে গঠিত হবে যাতে সর্বদা কাজ করতে সমর্থ হয়। এজন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসংঘের অধিষ্ঠানক্ষেত্রে সর্বদা প্রতিনিধি মোতায়েন রাখতে হবে।

2. নিরাপত্তা পরিষদ পর্যাবৃত্ত অধিবেশনে মিলিত হবে যাতে এর প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রই ইচ্ছাক্রমে নিজ সরকারের কোন সভ্য বা কোন বিশেষভাবে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করতে পারবে।

3. রাষ্ট্রসংঘের অধিষ্ঠানক্ষেত্র ছাড়াও এমন সমস্ত স্থানে নিরাপত্তা পরিষদ অধিবেশনে মিলিত হতে পারে যেখানে এর বিবেচনা অনুযায়ী কাজের সবচেয়ে সুবিধা হবে।

Article 29.

The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

29 নম্বর ধারা।

নিরাপত্তা পরিষদ এর কার্য্যাদি সম্পন্ন করার জন্য এর নিজের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় একাধিক অনুপূরক অঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

Article 30.

The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

30 নম্বর ধারা।

নিজস্ব সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতিসহ নিরাপত্তা পরিষদ এর কার্য্য-প্রণালী সম্পর্কিত নিয়মকানুন প্রচলন করবে।

Article 31.

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of of that Member are specially affected.

31 নম্বর ধারা।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় রাষ্ট্রসংঘের এমন কোন সদস্যরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আনীত কোন বিষয়ের আলোচনায় ভোটদানের অধিকার ব্যতীত অংশগ্রহণ করতে পারে যদি নিরাপত্তা পরিষদ পূর্বোক্ত রাষ্ট্রের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত মনে করে।

Article 32.

Any Member of the United Nations which is not a

member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations.

32 নম্বর ধারা।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় রাষ্ট্রসংঘের এমন কোন সদস্যরাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয় এমন কোন রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের পক্ষ হিসাবে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ভোট-দানের অধিকার ব্যতীত উক্ত বিবাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক আমন্ত্রিত হবে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয় এমন কোন রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ এর নিজের বিবেচনায় ন্যায্য এমন সমস্ত শর্ত আরোপ করবে।

CHAPTER VI

Pacific Settlement of Disputes

Article 33.

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি

33 নম্বর্ ধারা।

1. যে আন্তর্জাতিক বিবাদ চলতে থাকলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষা বিপন্ন হতে পারে এমন বিবাদের শরিকরা সর্বপ্রথম আলোচনা-ভিত্তিক চুক্তি, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, অনুরঞ্জন, সালিশী, বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণ, আঞ্চলিক সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা অবলম্বনের মাধ্যমে অথবা তাদের নিজেদের পছন্দমত অন্যান্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ সমাধান করবে।

2. প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তা পরিষদ বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে উপরিউক্ত ধরণের উপায়ে তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করতে বলবে।

Article 34.

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

34 নম্বর ধারা।

কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ বা পরিস্থিতি চলতে থাকলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষা বিপন্ন হবে কিনা নির্ধারণ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে বা বিবাদে পরিণত হতে পারে এমন কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ বা পরিস্থিতির তদন্ত করতে পারবে।

Article 35.

1. Any Member of the United Nations may bring any dispute or any situation of the nature referred to in Article 34 to the attention of the Security Council or of the General Assembly.

2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.

3, The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.

35 নম্বর ধারা।

1. 34 নম্বর ধারায় বর্ণিত এমন ধরণের কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ বা পরিস্থিতির প্রতি রাষ্ট্রসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

2. রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয় এমন কোন রাষ্ট্র যদি আগে থেকেই কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের উদ্দেশ্যে চার্টারের বিধান অনুসারে শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির দায় গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয় তবে ঐ রাষ্ট্র উক্ত আন্তর্জাতিক বিবাদের পক্ষ হিসাবে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বিবাদের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

3. এই ধারা অনুসারে সাধারণ সভার সম্মুখে আনীত বিষয়াদি সম্পর্কে সাধারণ সভার কার্য্যধারা 11 এবং 12 নম্বর ধারায় বর্ণিত বিধানাদি সাপেক্ষে হতে হবে।

Article 36.

1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.

2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.

3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

36 নম্বর ধারা।

1. 33 নম্বর ধারায় উল্লিখিত ধরণের আন্তর্জাতিক বিবাদের অথবা অনুরূপ ধরণের কোন পরিস্থিতির যে কোন পর্য্যায়ে সামঞ্জস্য সাধনের যথাযোগ্য প্রণালী বা পদ্ধতি নিরাপত্তা পরিষদ সুপারিশ করতে পারবে ।

2. কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে উক্ত বিবাদে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকর্তৃক পূর্বেই গৃহীত কার্য্যপ্রণালীর প্রতি নিরাপত্তা পরিষদ সচেতন থাকবে ।

3. এই ধারা অনুসারে সুপারিশ করার সময়ে নিরাপত্তা পরিষদ লক্ষ্য রাখবে যাতে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিধি অনুযায়ী আইন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিবাদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ উক্ত বিবাদ সাধারণ নিয়ম হিসাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নিকট পেশ করে ।

Article 37.

1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.

2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.

37 নম্বর ধারা।

1. 33 নম্বর ধারায় উল্লিখিত ধরণের কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের পক্ষসমূহ যদি উক্ত ধারায় নির্দেশিত উপায়ে তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করতে বিফল হয় তবে তারা তা' নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করবে ।

2. নিরাপত্তা পরিষদ যদি মনে করে যে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ চলতে থাকলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষা বিপন্ন হতে পারে তাহলে নিরাপত্তা পরিষদ ঠিক করবে 36 নম্বর ধারা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অথবা বিবাদ নিষ্পত্তির এমন সমস্ত শর্ত সুপারিশ করা হবে যা' নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনায় যথাযোগ্য ।

Article 38.

Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.

38 নম্বর ধারা ঃ

33 নম্বর থেকে 37 নম্বর ধারায় বর্ণিত বিধানাদির কোন কিছুকে ক্ষুণ্ণ না করে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের সমস্ত পক্ষের অনুরোধক্রমে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের নিকট সুপারিশ রাখতে পারবে।

CHAPTER VII

Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression.

Article 39.

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

সপ্তম অধ্যায়

শান্তিভঙ্গের হুমকী, শান্তিভঙ্গ এবং আগ্রাসী কার্য্যকলাপ সম্পর্কে পদক্ষেপ

39 নম্বর ধারা।

নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিভঙ্গের হুমকী, শান্তিভঙ্গ অথবা আগ্রাসী কার্য্যকলাপের অস্তিত্ব নির্ধারণ করবে এবং সুপারিশ করবে অথবা স্থির করবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা পুনরুদ্ধার করার জন্য 41 এবং 42 নম্বর ধারা অনুসারে কি কি ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হবে।

Article 40.

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

40 নম্বর ধারা।

পরিস্থিতির অবনতি রোধ করার জন্য 39 নম্বর ধারার বিধান অনুসারে সুপারিশ করার অথবা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে কিছু স্থির করার পূর্বেই নিরাপত্তা পরিষদ নিজের বিবেচনা অনুসারে প্রয়োজনীয় অথবা বিধেয় অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থাদি মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নির্দেশ দিতে পারবে। এধরণের ব্যবস্থাদি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অধিকার, দাবী অথবা অবস্থা ক্ষুণ্ণ করবে না। এধরণের অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থাদি মেনে না চলার প্রতি নিরাপত্তা পরিষদ যথারীতি দৃষ্টি রাখবে।

Article 41.

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

41 নম্বর ধারা।

নিজের সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়া কি ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা যায় তা' নিরাপত্তা পরিষদ স্থির করতে পারবে এবং এধরণের ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহকে নির্দেশ দিতে পারবে। অর্থনৈতিক সম্পর্কের এবং রেলপথের,

সমুদ্রপথের, বিমানপথের, ডাকের, তারবার্তার, বেতারের এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বা আংশিক বিচ্ছেদ অথবা কূটনৈতিক সম্পর্কের ছেদ এই সমস্ত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

Article 42.

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

42 নম্বর ধারা।

নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনায় 41 নম্বর ধারার বিধান অনুসারে ব্যবস্থাদি যথেষ্ট হবেনা বলে মনে হলে অথবা যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদ বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী কিংবা স্থলবাহিনী দ্বারা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এধরণের পদক্ষেপের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের বিমান, নৌ এবং স্থলবাহিনীসমূহকর্তৃক সামরিক শক্তি প্রদর্শন, অবরোধ বা অন্যান্য কার্য্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

Article 43.

1. All Members of United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

2. Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of facilities and assistance to be provided.

3. The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council.

They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

43 নম্বর ধারা।

1. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অবদান হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিদের আহ্বানে এবং বিশেষ চুক্তি বা চুক্তিসমূহ অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদকে প্রয়োজনীয় সশস্ত্রবাহিনী, সাহায্য, সৈন্য চলাচলের অধিকারসহ সুবিধাদি প্রদান করার অঙ্গীকার করছে।

2. এরূপ বিশেষ চুক্তি বা চুক্তিসমূহ দ্বারা প্রদেয় সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা এবং প্রকৃতি, তাদের প্রস্তুতির পর্য্যায় ও সাধারণ অবস্থিতি, এবং সুবিধাদি ও সাহায্যের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

3. নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে যত শীঘ্র সম্ভব এক বা একাধিক চুক্তি করা হবে। সেগুলি নিরাপত্তা পরিষদ এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অথবা নিরাপত্তা পরিষদ এবং সদস্যরাষ্ট্রদের গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সম্পাদিত হবে এবং সেগুলি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ সাংবিধানিক প্রণালী অনুসারে অনুসমর্থিত হবে।

Article 44.

When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employment of contingents of that Member's armed forces.

44 নম্বর ধারা।

সামরিক শক্তিপ্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিনিধিত্ব নেই এমন কোন সদস্যরাষ্ট্রকে 43 নম্বর ধারা অনুসারে স্বীকৃত দায় পালনের খাতিরে সশস্ত্রবাহিনী সরবরাহ করতে বলার আগে সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রের ইচ্ছাসাপেক্ষে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত

সদস্যরাষ্ট্রকে তার সশস্ত্রবাহিনীর দল প্রয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তাদিতে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করবে।

Article 45.

In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately available national air-force contingents for combined international enforcement action. The strength and degree of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined, within the limits laid down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

45 নম্বর ধারা।

রাষ্ট্রসংঘ যাতে জরুরী সামরিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সদস্যরাষ্ট্রসমূহ যৌথ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য তাদের জাতীয় বিমানবাহিনীর বিভিন্নদলকে অচিরেই পাওয়ার ব্যবস্থা রাখবে। নিরাপত্তা পরিষদ এই দলগুলির শক্তি ও প্রস্তুতির পর্য্যায় এবং তাদের প্রয়োগের পরিকল্পনা সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর সহায়তাক্রমে 43 নম্বর ধারায় উল্লিখিত বিশেষ চুক্তি বা চুক্তিসমূহ দ্বারা আরোপিত সীমারেখাসাপেক্ষে নির্ধারণ করবে।

Article 46.

Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

46 নম্বর ধারা।

সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর সহায়তাক্রমে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনাদি প্রস্তুত করবে।

Article 47.

1. There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council's Military requirements for the maintenance of international peace and

security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament.

2. The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of the Security Council or their representatives. Any Member of the United Nations not permanently represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it when the efficient discharge of the Committee's responsibilities requires the participation of that Member in its work.

3. The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently.

4. The Military Staff Committee, with the authorization of the Security Council and after consultation with appropriate regional agencies, may establish regional sub-committees.

47 নম্বর ধারা ।

1. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সামরিক প্রয়োজনাদি, নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োগ ও পরিচালনা, অস্ত্রাদির নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য নিরস্ত্রীকরণের সাথে জড়িত সকল প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদকে পরামর্শ দেওয়া এবং সহায়তা করার জন্য একটি সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হবে।

2. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়কদের অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের দ্বারা সামরিক উপদেষ্টা-মণ্ডলী গঠিত হবে। সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীতে স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব নেই এমন কোন সদস্যরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ যদি সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর দায়িত্ব-সমূহের সুষ্ঠু পালনের জন্য প্রয়োজন হয়, তবে সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী এর কাজের সাথে যুক্ত হতে উক্ত সদস্যরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করবে।

3. নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন সশস্ত্রবাহিনীর সামরিক পরিকল্পনাগত পরিচালনার ব্যাপারে সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী নিরাপত্তা পরিষদের কাছে দায়ী থাকবে। অতঃপর এই, ধরণের সশস্ত্র বাহিনীর পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ঠিক করা হবে।

4. নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক ক্ষমতাদানক্রমে এবং উপযুক্ত আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনার পর সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী আঞ্চলিক উপসমিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

Article 48.

1. The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine.

2. Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they are members.

48 নম্বর ধারা।

1. নিরাপত্তা পরিষদের নির্ধারণক্রমে রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র অথবা তাদের কেউ কেউ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষার্থে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তাদি কাজে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

2. রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ প্রত্যক্ষভাবে এবং উপযুক্ত যে সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থায় তাদের সদস্যপদ রয়েছে সেগুলিতে তাদের কার্য্যাবলীর মাধ্যমে তারা এই ধরণের সিদ্ধান্তাদি কাজে পরিণত করবে।

Article 49.

The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council.

49 নম্বর ধারা।

নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক স্থিরীকৃত ব্যবস্থাদি কাজে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক সহযোগিতা করবে।

Article 50

If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems arising from the

carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems.

50 নম্বর ধারা।

কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক গৃহীত শান্তিভঙ্গ নিবারণমূলক অথবা শান্তিবলবৎমূলক ব্যবস্থাদি কাজে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সদস্য অথবা সদস্য নয় এমন অন্য কোন রাষ্ট্র যদি বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যাদির সম্মুখীন হয়, তবে ঐ সমস্ত সমস্যার কোন সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আলোচনা করার অধিকার উক্ত রাষ্ট্রের থাকবে।

Article 51.

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

51 নম্বর ধারা।

রাষ্ট্রসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন সশস্ত্র আক্রমণ ঘটলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিরাপত্তা পরিষদ অবলম্বন না করা পর্যন্ত বর্তমান চার্টারের কোন কিছুই একক বা যৌথ আত্মরক্ষার সহজাত অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবেনা। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক আত্মরক্ষার অধিকার বাস্তবায়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি অচিরেই নিরাপত্তা পরিষদকে জানাতে হবে এবং সেগুলি কোনক্রমেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনবোধে যে কোন সময়ে যেকোন পদক্ষেপ অবলম্বন করার বর্তমান চার্টার অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বকে ব্যাহত করবেনা।

CHAPTER VIII

Regional Arrangements

Article 52.

1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.

2. The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.

3. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council.

4. This Article in no way impaires the application of Articles 34 and 35.

অষ্টম অধ্যায়

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা

52 নম্বর ধারা।

1. আঞ্চলিক পর্য্যায়ে পদক্ষেপের পক্ষে উপযুক্ত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কিত এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা অথবা সংগঠনসমূহের অস্তিত্বকে বর্তমান চার্টারের কোন কিছুই বাধা দেবেনা, অবশ্য এধরণের ব্যবস্থাপনা অথবা সংগঠন-

সমূহ এবং তাদের কাজকর্ম যদি রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

2. এধরণের ব্যবস্থাপনার মধ্যে গেলে অথবা এধরণের সংগঠনসমূহ গঠন করলে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যসমূহ নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করার আগে উক্ত ধরণের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অথবা উক্ত ধরণের আঞ্চলিক সংগঠন দ্বারা স্থানীয় বিবাদসমূহের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে।

3. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশে এধরণের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অথবা এধরণের আঞ্চলিক সংগঠন দ্বারা স্থানীয় বিবাদসমূহের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির উন্নতির জন্য নিরাপত্তা পরিষদ উৎসাহ প্রদান করবে।

4. এই ধারা কোনক্রমেই 34 এবং 35 নম্বর ধারার প্রয়োগকে ব্যাহত করছেনা।

Article 53.

1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing aggression by such a state.

2. The term 'enemy state' as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.

53 নম্বর ধারা।

1. নিরাপত্তা পরিষদ এর ক্ষমতাধীন শান্তিবলবৎমূলক ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে এধরণের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনাকে অথবা সংগঠন-

সমূহকে কাজে লাগাতে পারবে। বর্তমান ধারার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্যক্ত এবং 107 নম্বর ধারার সাথে সঙ্গতিসাপেক্ষে শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদির ব্যতিরেক ছাড়া, অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহের অনুরোধে রাষ্ট্রসংঘ এধরণের শত্রুরাষ্ট্রের নতুন আগ্রাসী কার্য্যকলাপ নিবারণ করার দায়িত্ব নিজে না নেওয়া পর্য্যন্ত এমন কোন শত্রুরাষ্ট্রকর্তৃক পুনর্গৃহীত আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে তৎপর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার ব্যতিরেক ছাড়া নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক ক্ষমতাদান ব্যতীত আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনায় অথবা আঞ্চলিক সংগঠন দ্বারা শান্তি বলবৎমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা।

2. বর্তমান ধারার প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত শত্রুরাষ্ট্র কথাটি এমন যেকোন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রযোজ্য যেরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্তমান চার্টারে স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্রের শত্রু ছিল।

Article 54.

The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security.

54 নম্বর ধারা।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনায় অথবা অঞ্চলিক সংগঠনসমূহ দ্বারা কৃত বা প্রস্তাবিত কাজকর্ম সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে সর্বদা সম্পূর্ণভাবে অবহিত রাখতে হবে।

CHAPTER IX

International Economic And Social Cooperation

Article 55.

With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote :

(a) higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development ;

(b) solutions of international economic, social, health, and related problems ; and international cultural and educational cooperation ; and

(c) universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

নবম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

55 নম্বর ধারা।

সমান অধিকার ও সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতির প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা ও কল্যাণের অবস্থা সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রসংঘ চেষ্টা করবে :

(a) উন্নততর পর্য্যায়ের জীবনমান, পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি ও উন্নতির পরিবেশ ;

(b) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীর সমাধান ; এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষানৈতিক সহযোগিতা ; এবং

(c) জাতি, স্ত্রীপুরুষ, ভাষা অথবা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বজনীন সম্মান প্রদর্শন এবং সেগুলি পালনের জন্য।

Article 56.

All Members pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

56 নম্বর ধারা।

55 নম্বর ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত সদস্য-

রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের সাথে সহযোগিতায় যৌথ এবং এককভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার অঙ্গীকার করছে।

Article 57.

1. The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Article 63.

2. Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereinafter referred to as specialized agencies.

57 নম্বর ধারা।

নিজেদের দলিলপত্র অনুসারে স্থিরীকৃত অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষানৈতিক, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে বিস্তৃত আন্তর্জাতিক দায়িত্বাবলীসহ আন্তঃসরকারী চুক্তিবলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে 63 নম্বর ধারায় বর্ণিত বিধানাদি অনুসারে রাষ্ট্রসংঘের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হবে।

2. রাষ্ট্রসংঘের সাথে এভাবে সম্পর্কযুক্ত এধরণের সংস্থাসমূহকে এরপর থেকে বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Article 58.

The Organization shall make recommendations for the coordination of the policies and activities of the specialized agencies.

58 নম্বর ধারা।

বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কর্মনীতির এবং কাজকর্মের সমন্বয়সাধনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ সুপারিশ করবে।

Article 59.

The Organization shall, where appropriate, initiate negotiations among the states concerned for the creation of any

new specialized agencies required for the accomplishment of the purposes set forth in Article 55.

59 নম্বর ধারা ।

55 নম্বর ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সম্পন্ন করার প্রয়োজনে নূতন নূতন বিশেষজ্ঞ সংস্থা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রসংঘ উপযুক্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আলোচনাভিত্তিক চুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগী হবে।

Article 60.

Responsibility for the discharge of the functions of the Organization set forth in this Chapter shall be vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the Economic and Social Council which shall have for this purpose the powers set forth in Chapter X.

60 নম্বর ধারা ।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব সাধারণ সভার উপর এবং সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপর ন্যস্ত হবে, এবং তদুদ্দেশ্যে উক্ত পরিষদ দশম অধ্যায়ে বর্ণিত ক্ষমতাবলী প্রাপ্ত হবে ।

CHAPTER X

The Economic And Social Council

Composition

Article 61.

1. The Economic and Social Council shall consist of twenty-seven* Members of the United Nations elected by the General Assembly.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, nine members of the Economic and Social Council shall be

* সাধারণ সভার 2847(XXVI) নম্বর প্রস্তাববলে (1971 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে 54 করা হয়েছে ।

elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election.

3. At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from eighteen to twenty-seven members, in addition to the members elected in place of the six members whose term of office expires at the end of that year, nine additional members shall be elected. Of these nine addtional members, the term of office of three members so elected shall expire at the end of one year, and of three other members at the end of two years, in accordance with arrangements made by the General Assembly.

4. Each member of the Economic and Social Council shall have one representative.

দশম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

গঠন

61 নম্বর ধারা।

1. সাধারণ সভাকর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রসংঘের 27-টি সদস্যরাষ্ট্রকে নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হবে।

2. 3 নম্বর পরিচ্ছেদের বিধানাদিসাপেক্ষে প্রত্যেক বৎসর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নয়টি সদস্যরাষ্ট্র তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবে। কোন সদস্যরাষ্ট্রের কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিত পরে উক্ত সদস্যরাষ্ট্র পুনর্নির্বাচিত হতে পারবে।

3. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা আঠার থেকে সাতাশে বর্দ্ধিত হওয়ার পরে প্রথম নির্বাচনে ঐ বৎসরের শেষে কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হওয়া ছয়টি সদস্যরাষ্ট্রের স্থলে নির্বাচনসহ অতিরিক্ত নয়টি সদস্যরাষ্ট্রের নির্বাচন হবে। এভাবে নির্বাচিত নয়টি অতিরিক্ত সদস্যরাষ্ট্রের তিনটির কার্য্যকাল এক বৎসরের শেষে এবং অন্য তিনটির কার্য্যকাল দুই বৎসরের শেষে সাধারণ সভাকৃত ব্যবস্থানুযায়ী অতিক্রান্ত হবে।

4. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে।

Functions and Powers

Article 62.

1. The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly, to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned.

2. It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.

3. It may prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with respect to matters falling within its competence.

4. It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international conferences on matters falling within its competence.

কার্য্যসমূহ এবং ক্ষমতাবলী

62 নম্বর ধারা।

1. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষানৈতিক, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়-সমূহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারবে অথবা উদ্যোগী হতে পারবে এবং এধরণের কোন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ সভার নিকট, রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নিকট এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের নিকট সুপারিশ পেশ করতে পারবে।

2. সকলের পক্ষে প্রযোজ্য মানবিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এবং সেগুলি পালনের উন্নতির উদ্দেশ্যে এই পরিষদ সুপারিশ করতে পারবে।

3. নিজের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয়ে প্রস্তাবাদির খসড়া এই পরিষদ সাধারণ সভার নিকট পেশ করার জন্য প্রস্তুত করতে পারবে।

4. রাষ্ট্রসংঘকর্তৃক নির্দেশিত আইনকানুন অনুসারে এই পরিষদ নিজের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদি আহ্বান করতে পারবে।

Article 63.

1. The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the ageney concerned shall be brought into relationship with the United Nations. Such agreements shall be subject to approval by the General Assembly.

2. It may coordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and to the Members of the United Nations.

63 নম্বর ধারা।

1. রাষ্ট্রসংঘের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সম্পর্কযুক্ত করার শর্তাদি স্থির করার পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ 57 নম্বর ধারায় উল্লিখিত সংস্থাসমূহের যেকোনটির সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। এধরণের চুক্তি-সমূহ সাধারণ সভার অনুমোদনসাপেক্ষে হবে।

2. বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে, তাদের নিকট সুপারিশের মাধ্যমে এবং সাধারণ সভা ও রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নিকট সুপারিশের মাধ্যমে এই পরিষদ বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কাজকর্মের সমন্বয়সাধন করতে পারবে।

Article 64.

1. The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nations and with specialized agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the General Assembly.

2. It may communicate its observations on these reports to the General Assembly.

64 নম্বর ধারা।

1. বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কাছ থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন আদায় করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন

করতে পারবে। এই পরিষদ নিজের সুপারিশাদিকে এবং এর এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয়ে সাধারণ সভার সুপরিশাদিকে কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন আদায়ের জন্য রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সাথে এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের সাথে ব্যবস্থা করতে পারবে।

2. এই প্রতিবেদনসমূহের উপর এই পরিষদ নিজের মন্তব্যাদি সাধারণ সভার নিকট প্রেরণ করতে পারবে।

Article 65.

The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the Security Council upon its request.

65 নম্বর ধারা।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদকে তথ্য পরিবেশন করতে পারবে এবং নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধক্রমে একে সাহায্য করবে।

Article 66.

1. The Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its competence in connection with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.

2. It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members of the United Nations and at the request of specialized agencies.

3. It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may be assigned to it by the General Assembly.

66 নম্বর ধারা।

1. সাধারণ সভার সুপারিশাদি পালন করার সাথে সংশ্লিষ্ট নিজের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত কাজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সম্পন্ন করবে।

2. সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে এই পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের অনুরোধে সেবাকর্ম করতে পারবে।

3. বর্তমান চার্টারের অন্যত্র সুনির্দিষ্ট অথবা সাধারণ সভাকর্তৃক এই পরিষদকে অর্পিত অন্যান্য কার্য্যাদি এ সম্পন্ন করবে।

Voting

Article 67.

1. Each member of the Economic and Social Council shall have one vote.

2. Decisions of the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present and voting.

ভোট ব্যবস্থা

67 নম্বর ধারা।

1. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকবে।

2. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সিদ্ধান্তাদি উপস্থিত এবং ভোটদানরত সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হবে।

Procedure

Article 68.

The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights and such other commissions as may be required for the performance of its functions.

কার্য্যপ্রণালী

68 নম্বর ধারা।

নিজের কার্য্যাদি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কমিশনসমূহসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এবং মানবিক অধিকারের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কমিশনসমূহ প্রতিষ্ঠা করবে।

Article 69.

The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.

69 নম্বর ধারা।

রাষ্ট্রসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে বিশেষভাবে জড়িত কোন বিষয় সম্পর্কে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আলোচনায় ভোটদানের অধিকার ব্যতীত অংশগ্রহণ করার জন্য এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করবে।

Article 70.

The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of the specialized agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissions established by it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialized agencies.

70 নম্বর ধারা।

বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবর্গকর্তৃক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এবং তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কমিশনসমূহের আলোচনায় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রতিনিধিবর্গকর্তৃক বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের আলোচনায় ভোটদানের অধিকার ব্যতীত অংশগ্রহণ করার বন্দোবস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ করতে পারবে।

Article 71.

The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned.

71 নম্বর ধারা।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত বেসরকারী সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনার জন্য যথাযথ বন্দোবস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ করতে পারবে। এধরণের বন্দোবস্ত আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সাথে এবং উপযুক্তক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের

সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় সংগঠনসমূহের সাথে করা যেতে পারবে।

Article 72.

1. The Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure including the method of selecting its President.

2. The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

72 নম্বর ধারা।

1. নিজস্ব সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতিসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এর কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কিত নিয়মকানুন প্রণয়ন করবে।

2. নিজস্ব সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুরোধে বৈঠক আহ্বান করার বিধানসহ স্বকীয় নিয়মকানুন অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বৈঠকে মিলিত হবে।

CHAPTER XI

Declaration Regarding Non-Self-Governing Territories

Article 73.

Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end :

(a) to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses ;

(b) to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement ;

(c) to further international peace and security ;

(d) to promote constructive measures of development, to encourage research, and to cooperate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article ; and

(e) to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.

একাদশ অধ্যায়

স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চলসমূহ-সম্পর্কিত ঘোষণা

73 নম্বর ধারা ।

রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রসমূহ যারা, পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে পারেনি এমন অঞ্চলসমূহের শাসনের দায়িত্বগ্রহণ করেছে বা করছে, তারা এই নীতি গণ্য করছে যে উক্ত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের স্বার্থই প্রধান এবং বর্তমান চার্টারকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থার মধ্যে সেই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কল্যাণ

চূড়ান্তভাবে উন্নীত করার দায় পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করছে এবং তদুদ্দেশ্যে :

(a) সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের সংস্কৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন-সাপেক্ষে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষানৈতিক অগ্রগতির, তাদের প্রতি ন্যায়োচিত ব্যবহারের এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা ;

(b) প্রত্যেকটি অঞ্চলের এবং তার জনসাধারণের বিশেষ অবস্থাদি এবং তাদের অগ্রগতির পর্য্যায়ের বিভিন্নতা অনুসারে স্বায়ত্তশাসনের বিকাশ করা, সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার প্রতি যথার্থ লক্ষ্য রাখা, এবং তাদের স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের ত্বরান্বিত উন্নতিকল্পে তাদের সহায়তা করা ;

(c) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে অগ্রগামী করা ;

(d) অগ্রগতির জন্য গঠনমূলক ব্যবস্থাদির উন্নতি করা, গবেষণা উৎসাহিত করা, একে অন্যের সাথে সহযোগিতা করা, এবং উপযুক্ত সময়ে ও ক্ষেত্রে, এই ধারায় বর্ণিত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবানুনাগভাবে সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতা করা ; এবং

(e দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রযোজ্য এমন সমস্ত অঞ্চল ব্যতিরেকে যেসমস্ত অঞ্চলের জন্য তারা যথাক্রমে দায়ী সেই সমস্ত অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষানৈতিক অবস্থাদি সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত এবং কারিগরীধরণের অন্যান্য খবর মহাসচিবকে নিরাপত্তাজনিত ও সাংবিধানিক বিধিনিষেধ সাপেক্ষে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে।

Article 74.

Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighbourliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.

74 নম্বর ধারা।

রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ এও স্বীকার করছে যে এই অধ্যায় প্রযোজ্য

এমন সমস্ত অঞ্চলের প্রতি, যেমন তাদের নিজেদের খাস এলাকার প্রতি, তাদের নীতি সুপ্রতিবেশীসুলভতার সাধারণ নীতির উপর ভিত্তি করে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং বাণিজ্যিক বিষয়াদিতে বিশ্বের অবশিষ্টাংশের স্বার্থ এবং কল্যাণের প্রতি যথেষ্ট সচেতনতা সাপেক্ষেই হবে।

CHAPTER XII

International Trusteeship System

Article 75.

The United Nations shall establish under its authority an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder by subsequent individual agreements. These territories are hereinafter referred to as trust territories.

দ্বাদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা

75 নম্বর ধারা।

পরবর্তীকালে আলাদা আলাদা চুক্তি অনুসারে আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থার অধীনে আনীত অঞ্চলসমূহের প্রশাসন এবং তদারকের জন্য রাষ্ট্রসংঘ একটি আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। এসমস্ত অঞ্চলকে এরপর থেকে অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Article 76.

The basic objectives of the trusteeship system, in accordance with the Purposes of the United Nations laid down in Article 1 of the present Charter, shall be :

(a) to further international peace and security ;

(b) to promote the political, economic, social and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-

government or independence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement ;

(c) to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world ; and

(d) to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals, and also equal treatment for the latter in the administration of justice, without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80.

76 নম্বর ধারা।

বর্তমান চার্টারের 1 নম্বর ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসমূহ অনুসারে অছি ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যসমূহ হবে :

(a) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে অগ্রগামী করা ;

(b) অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষানৈতিক অগ্রগতি সাধন করা এবং প্রত্যেক অঞ্চল ও তার জনসাধারণের বিশেষ অবস্থা, সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের আকাঙ্খার বিধিনিষেধহীন প্রকাশ, এবং প্রত্যেকটি অছিচুক্তির শর্তাদিসাপেক্ষে যা' যথাযথ হবে সেই অনুসারে স্বায়ত্তশাসন অথবা স্বাধীনতার পথে তাদের ত্বরান্বিত অগ্রগতি সাধন করা ;

(c) জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা এবং ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে উৎসাহ প্রদান করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার স্বীকৃতিকে উৎসাহ প্রদান করা ; এবং

(d) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র এবং তাদের নাগরিকদের প্রতি সমব্যবহারের এবং উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের সম্পাদনকে ক্ষুণ্ণ না করে এবং 80 নম্বর ধারার বিধানাদিসাপেক্ষে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রেও তাদের প্রতি সমব্যবহারের ব্যবস্থা করা ।

Article 77.

1. The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as may be placed thereunder by means of trusteeship agreements :

(a) territories now held under mandate ;

(b) territories which may be detached from enemy state as a result of the Second World War ; and

(c) territories voluntarily placed under the system by states responsible for their administration.

2. It will be a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms.

77 নম্বর ধারা।

1. অছিব্যবস্থা নিম্নোক্ত শ্রেণীসমূহের অধীনস্থ সমস্ত অঞ্চলসমূহের প্রতি অছিচুক্তিবলে প্রযোজ্য হবে ঃ

(a) বর্তমান ম্যাণ্ডেটব্যবস্থার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ ;

(b) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে শত্রুরাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অঞ্চলসমূহ ; এবং

(c) শাসনের দায়িত্বসম্বলিত রাষ্ট্রসমূহদ্বারা স্বেচ্ছায় অছিব্যবস্থার অধীনে উপস্থাপিত অঞ্চলসমূহ ।

2. উপরিল্লিখিত শ্রেণীসমূহের অন্তর্গত কোন্ কোন্ অঞ্চল অছি-ব্যবস্থার অধীনে আনীত হবে এবং তার শর্তাবলী কি হবে তা পরবর্তী-কালের চুক্তিবলে ঠিক হবে ।

Article 78.

The trusteeship system shall not apply to territories which have become Members of the United Nations, relationship among which shall be based on respect for the principle of sovereign equality.

78 নম্বর ধারা।

এমন সমস্ত অঞ্চল, যারা রাষ্ট্রসংঘের সভ্য হয়েছে এবং যাদের মধ্যে সম্পর্ক সার্বভৌমত্বগত নীতির প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে হবে, তাদের প্রতি অছিব্যবস্থা প্রযোজ্য হবেনা ।

Article 79.

The terms of trusteeship for each territory to be placed under the trusteeship system, including any alteration or amendment shall be agreed upon by the states directly concerned, including the mandatory power in the case of territories held under mandate by a Member of the United Nations, and shall be approved as provided for in Articles 83 and 85.

79 নম্বর ধারা।

অছিব্যবস্থার অধীনে উপস্থাপিত হবে এমন প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য সকল পরিবর্তন এবং সংশোধনসহ অছির শর্তাবলী, প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সকলরাষ্ট্রকর্তৃক, ম্যাণ্ডেটব্যবস্থার অধীনস্থ অঞ্চলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য এমন ম্যাণ্ডেটধারী রাষ্ট্রসহ, স্থিরীকৃত হবে এবং 83 নম্বর ও 85 নম্বর ধারার বিধানানুসারে অনুমোদিত হবে।

Article 80.

1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 77, 79 and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.

2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

80 নম্বর ধারা।

1. অছিব্যবস্থার অধীনে উপস্থাপনাকল্পে প্রত্যেক অঞ্চল সম্পর্কে 77 নম্বর, 79 নম্বর ও 81 নম্বর ধারা অনুসারে সম্পাদিত আলাদা আলাদা অছিচুক্তিবলে স্বীকৃত বিষয়সমূহ ব্যতিরেকে, এবং যতক্ষণ না উক্ত ধরণের চুক্তিসমূহ সম্পাদিত হয়, ততক্ষণ বর্তমান অধ্যায়ের কোন কিছুই এমন-

ভাবে ধার্য্য হবেনা বা তেমন কোন কিছুই আপনি আপনি যেকোন রাষ্ট্রের অথবা যেকোন জাতির যেকোন ধরণের অধিকারকে, অথবা রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ যার শরিক এমন কোন বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার শর্তাবলীকে কোনক্রমে পরিবর্তিত করবেনা।

2. এই ধারার 1 নম্বর অনুচ্ছেদকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবেনা যাতে ম্যাণ্ডেটের অধীনস্থ অঞ্চল এবং অন্যান্য অঞ্চলসমূহকে 77 নম্বর ধারা অনুসারে অছিব্যবস্থার অধীনে উপস্থাপনাকল্পে আলোচনা এবং চুক্তি সম্পাদনকে বিলম্বিত করা অথবা স্থগিত রাখার কারণ হতে পারে।

Article 81.

The trusteeship agreement shall in each case include the terms under which the trust territory will be administered and designate the authority which will exercise the administration of the trust territory. Such authority, hereinafter called the administering authority, may be one or more states or the Organization itself.

81 নম্বর ধারা।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে অছিভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসনের শর্তাবলী এবং যে কর্তৃপক্ষ অছিভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসন পরিচালনা করবে সেই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্ণায়ন অছিচুক্তির মধ্যে থাকবে। এক বা একাধিক রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসংঘ নিজেই এধরণের কর্তৃপক্ষ, যাকে এরপর থেকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, হতে পারবে।

Article 82.

There may be designated, in any trusteeship agreement, a strategic area or areas which may include part or all of the trust territory to which the agreement applies, without prejudice to any special agreement or agreements made under Article 43.

82 নম্বর ধারা।

43 নম্বর ধারা অনুসারে সম্পাদিত বিশেষ চুক্তি বা চুক্তিসমূহের অন্তরায় না হয়ে কোন অছিভুক্ত অঞ্চলের অংশবিশেষকে বা সম্পূর্ণ এলাকাকে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বা এলাকাসমূহ বলে

উক্ত অছিভুক্ত অঞ্চলের প্রতি প্রযোজ্য অছিচুক্তির মধ্যে নির্ণায়ন করা যেতে পারবে।

Article 83.

1. All functions of the United Nations relating to strategic areas, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the Security Council.

2. The basic objectives set forth in Article 76 shall be applicable to the people of each strategic area.

3. The Security Council shall, subject to the provisions of the trusteeship agreements and without prejudice to security considerations, avail itself of the assistance of the Trusteeship Council to perform those functions of the United Nations under trusteeship system relating to political, economic, social, and educational matters in the strategic areas.

83 নম্বর ধারা।

1. অছিচুক্তিসমূহের শর্তাবলীর অনুমোদন এবং সেগুলির পরিবর্তন ও সংশোধনসহ সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত কার্য্য নিরাপত্তা পরিষদ সম্পাদন করবে।

2. সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক এলাকার অধিবাসীদের প্রাত 76 নম্বর ধারায় বর্ণিত মূল উদ্দেশ্যসমূহ প্রযোজ্য হবে।

3. অছিচুক্তিসমূহের বিধানাদি সাপেক্ষে এবং নিরাপত্তাজনিত প্রশ্নাদির অন্তরায় না হয়ে অছিব্যবস্থার অন্তর্গত সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা-নৈতিক বিষয়সমূহজনিত রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যাদি সম্পাদন করতে নিরাপত্তা পরিষদ অছি পরিষদের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

Article 84.

It shall be the duty of the administering authority to ensure that the trust territory shall play its part in the maintenance of international peace and security. To this end the administering authority may make use of volunteer forces, facilities,

and assistance from the trust territory in carrying out the obligations towards the Security Council undertaken in this regard by the administering authority, as well as for local defence and the maintenance of law and order within the trust territory.

84 নম্বর ধারা।

কোন অছিভুক্ত অঞ্চল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এর ভূমিকা যাতে পালন করে তার ব্যবস্থা করা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে। সেই উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি স্বীকৃত দায় পালনের ও স্থানীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার এবং অছিভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অছি-ভুক্ত অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সুযোগ-সুবিধা এবং সাহায্য কাজে লাগাতে পারবে।

Article 85.

1. The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not designated as strategic, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the General Assembly.

2. The Trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly, shall assist the General Assembly in carrying out these functions.

85 নম্বর ধারা।

1. অছিচুক্তিসমূহের শর্তাবলীর অনুমোদন ও সেগুলির পরিবর্তন ও সংশোধনসহ সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্ণিত নয় এমন সমস্ত অঞ্চলসমূহের প্রতি প্রযোজ্য অছিচুক্তিসমূহ সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত কার্য্য সাধারণ সভা সম্পাদন করবে।

2. সাধারণ সভার ক্ষমতাধীনে থেকে অছি পরিষদ এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করতে সাধারণ সভাকে সহায়তা করবে।

CHAPTER XIII

The Trusteeship Council

Composition

Article 86.

1. The Trusteeship Council shall consist of the following Members of the United Nations ;

(a) those Members administering trust territories ;

(b) such of those Members mentioned by name in Article 23 as are not administering trust territories ; and

(c) as many other Members elected for three-year terms by the General Assembly as may be necessary to ensure that the total number of members of the Trusteeship Council is equally divided between those Members of the United Nations which administer trust territories and those which do not.

2. Each member of the Trusteeship Council shall designate one specially qualified person to represent it therein.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অছি পরিষদ

গঠন

86 নম্বর ধারা।

1. রাষ্ট্রসংঘের নিম্নোল্লিখিত সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত হবে :

(a) অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহের প্রশাসনকারী সদস্যরাষ্ট্রসমূহ ;

(b) অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহের প্রশাসনকারী নয় অথচ 23 নম্বর ধারায় নাম ধরে উল্লিখিত সদস্যরাষ্ট্রসমূহ ; এবং

(c) সাধারণ সভাকর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যরাষ্ট্র যাতে অছি পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার মধ্যে অছিভুক্ত

অঞ্চলসমূহের প্রশাসনকারী রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা প্রশাসনকারী নয় এমন সমস্ত রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যার সমান হয়।

2. অছি পরিষদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র অছি পরিষদে নিজের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিশেষ যোগ্যতা-সম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করবে।

Functions and Powers

Article 827.

The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, may :

(a) consider reports submitted by the administering authority ;

(b) accept petitions and examine them in consultation with the administering authority ;

(c) provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering authority ; and

(d) take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.

কার্য্যসমূহ ও ক্ষমতাবলী

87 নম্বর ধারা।

1. নিজেদের কার্য্যসমূহ পালন করতে গিয়ে সাধারণ সভা এবং এর ক্ষমতাধীনে অছি পরিষদ করতে পারবে :

(a) প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকর্তৃক পেশকরা প্রতিবেদনসমূহের বিবেচনা ;

(b) অভিযোগপত্রাদি গ্রহণ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সেগুলির পরীক্ষা ;

(c) প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরিদর্শনের সময় সম্পর্কে একমত হয়ে মাঝে মাঝে বিভিন্ন অছিভুক্ত অঞ্চলের পরিদর্শনের ব্যবস্থা ;

(d) অছিচুক্তিসমূহের শর্তাবলীর সাথে সঙ্গতি রেখে এই সমস্ত এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

Article 88.

The Trusteeship Council shall formulate a questionnaire on the political, economic, social, and educational advance-

ment of the inhabitants of each trust territory, and the administering authority for each trust territory within the competence of the General Assembly shall make an annual report to the General Assembly upon the basis of such questionnaire.

৪৪ নম্বর ধারা।

প্রত্যেক অছিভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষানৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে অছি পরিষদ একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করবে এবং সাধারণ সভার দায়িত্বাধীনে প্রত্যেক অছিভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সাধারণ সভার নিকট একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবে।

Voting

Article 89.

1. Each member of the Trusteeship Council shall have one vote.

2. Decisions of the Trusteeship Council shall be made by a majority of the members present and voting.

ভোটব্যবস্থা

89 নম্বর ধারা।

1. অছি পরিষদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকবে।

2. অছি পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থিত এবং ভোটদানরত সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হবে।

Procedure

Article 90.

1. The Trusteeship Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

2. The Trusteeship Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

কার্য্যপ্রণালী

90 নম্বর ধারা।

1. নিজস্ব সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতিসহ অছি পরিষদ এর নিজের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কিত নিয়মকানুন প্রণয়ন করবে।

2. নিজস্ব সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুরোধে বৈঠক আহ্বান করার বিধানসহ স্বকীয় আইনকানুন অনুসারে অছি পরিষদ বৈঠকে মিলিত হবে।

Article 91.

The Trusteeship Council shall,.when appropriate, avail itself of the assistance of the Economic and Social Council and of the Specialized Agencies in regard to matters with which they are respectively concerned.

91 নম্বর ধারা।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কাছ থেকে তাদের নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে অছি পরিষদ যথোচিত ক্ষেত্রে সহায়তা গ্রহণ করবে।

CHAPTER XIV

The International Court of Justice

Article 92.

The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.

চতুর্দশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

92 নম্বর ধারা ।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় রাষ্ট্রসংঘের মুখ্য বিচারবিভাগীয় অঙ্গ হবে। এই বিচারালয় চার্টারের সাথে সংযোজিত বিধি অনুসারে কাজ করবে যা' স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিধির ভিত্তিতে হয়েছে এবং যা' বর্তমান চার্টারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

Article 93.

1, All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International Court of Justice.

2. A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statue of the International Court of Justice on conditions to be determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

93 নম্বর ধারা ।

1. রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র আপনাহতেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিধির শরিক ।

2. রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র প্রত্যেকটি পৃথক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ সভাকর্তৃক স্থিরীকৃত শর্তাবলী অনুসারে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিধির শরিক হতে পারবে ।

Article 94.

1. Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.

2. If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security

Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.

94 নম্বর ধারা।

1. কোন মামলায় শরিক হিসাবে থাকলে সংশ্লিষ্ট মামলায় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দেওয়া সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্র করছে।

2. কোন মামলার শরিক হিসাবে যদি কোন সভ্যরাষ্ট্র উক্ত মামলায় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দেওয়া রায়-সম্ভূত দায় পালন না করে, তবে উক্ত মামলার অন্য শরিক নিরাপত্তা পরিষদের কাছে যেতে পারে এবং নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনবোধে সুপারিশ করতে পারে অথবা উক্ত রায় বলবৎ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

Article 95.

Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future.

95 নম্বর ধারা।

রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহকর্তৃক সম্পাদিত বর্তমান কোন অথবা ভবিষ্যতে সম্পাদিত চুক্তি বলে অন্য কোন বিচারালয়ের মাধ্যমে তাদের বিবাদের সমাধানের ব্যবস্থার পথে বর্তমান চার্টারের কোন কিছুই অন্তরায় হবেনা।

Article 96.

1. The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.

2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.

96 নম্বর ধারা।

1. কোন আইনবিষয়ক প্রশ্নে উপদেশমূলক অভিমত দেওয়ার জন্য সাধারণ সভা অথবা নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে অনুরোধ করতে পারবে ।

2. রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য অঙ্গসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ সাধারণ সভাকর্তৃক যেকোন সময়ে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ সাপেক্ষে তাদের নিজ নিজ কার্য্যপরিধি উদ্ভূত আইনবিষয়ক প্রশ্নে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উপদেশমূলক অভিমতের জন্য অনুরোধ করতে পারবে।

CHAPTER XV

The Secretariat

Article 97.

The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the Chief Administrative Officer of the Organization.

পঞ্চদশ অধ্যায়

সচিবালয়

97 নম্বর ধারা।

মহাসচিব এবং রাষ্ট্রসংঘের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মচারীকে নিয়ে সচিবালয় গঠিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ সভাকর্তৃক মহাসচিব নিযুক্ত হবেন। তিনি রাষ্ট্রসংঘের মুখ্য প্রশাসনিক কর্মচারী হবেন।

Article 98.

The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council,

of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.

98 নম্বর ধারা।

সে হিসাবেই মহাসচিব সাধারণ সভার, নিরাপত্তা পরিষদের, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এবং অছি পরিষদের সমস্ত অধিবেশনে কাজ করবেন এবং এইসমস্ত অঙ্গসমূহকর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কাজও করবেন। রাষ্ট্রসংঘের কার্য্য সম্পর্কে মহাসচিব সাধারণ সভার নিকট বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

Article 99.

The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security.

99 নম্বর ধারা।

মহাসচিব যেকোন বিষয়ের প্রতি, যা' তাঁর মতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষাকে বিঘ্নিত করতে পারে, নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন।

Article 100.

1. In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials, responsible only to the Organization.

2. Each Member of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

100 নম্বর ধারা।

1. নিজেদের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মহাসচিব এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ কোন সরকারের অথবা রাষ্ট্রসংঘের বহির্ভূত কোন সংগঠনের কাছ থেকে কোন নির্দেশাদি চাইবেন না অথবা গ্রহণ করবেন না। তারা এমন কিছুই করবেন না যাতে একমাত্র রাষ্ট্রসংঘের কাছে দায়ী আন্তর্জাতিক কর্মচারী হিসাবে তাঁদের নিরপেক্ষ অবস্থার হানি হয়।

2. রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্র মহাসচিব ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের দায়িত্বসমূহের সর্বতোভাবে আন্তর্জাতিক প্রকৃতিকে সম্মান করতে এবং তাঁদের দায়িত্বপালনে তাঁদের প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা না করতে অঙ্গীকার করছে।

Article 101.

1. The staff shall be appointed by the Secretary-General under regulations established by the Assembly.

2. Appropriate staffs shall be permanently assigned to the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and, as required, to other organs of the United Nations. These staffs shall form a part of the Secretariat.

3. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.

101 নম্বর ধারা।

1. সাধারণ সভাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী অনুযায়ী কর্মচারীবৃন্দ মহাসচিবকর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

2. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে ও অছি পরিষদকে এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য অঙ্গসমূহকে যথোচিত কর্মচারীবৃন্দ স্থায়ীভাবে দেওয়া হবে। এই সমস্ত কর্মচারী সচিবালয়ভুক্ত হবেন।

3. কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণের ব্যাপারে উচ্চতম মানের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং সততার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনই মুখ্য বলে বিবেচিত হবে। সম্ভাব্য বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকা থেকে কর্মচারী নিয়োগের গুরুত্বের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখা হবে।

CHAPTER XVI

Miscellaneous Provisions

Article 102.

1. Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.

2. No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations.

ষোড়শ অধ্যায়

বিবিধ বিধান

102 নম্বর ধারা।

1. বর্তমান চার্টার বলবৎ হওয়ার পর রাষ্ট্রসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্রসমূহ-কর্তৃক সম্পাদিত প্রত্যেক সন্ধি এবং প্রত্যেক আন্তর্জাতিক চুক্তি যথাসম্ভব শীঘ্র সচিবালয়ের নিকট নিবন্ধভুক্ত করা হবে এবং তৎকর্তৃক প্রকাশিত হবে।

2. বর্তমান ধারার 1 নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে এই ধরণের কোন সন্ধি বা কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি নিবন্ধভুক্ত না হলে এর কোন শরিক ঐ সন্ধি বা চুক্তির অনুকূলে রাষ্ট্রসংঘের কোন অঙ্গের সাহায্য প্রার্থনা করতে পারবেনা।

Article 103.

In the event of conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.

103 নম্বর ধারা।

চার্টারের প্রতি রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের দায়ের সাথে তাদের দ্বারা সম্পাদিত কোন আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি তাদের দায়ের অসঙ্গতির ক্ষেত্রে চার্টারের প্রতি তাদের দায়ই বহাল থাকবে।

Article 104.

The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its Purposes.

104 নম্বর ধারা।

নিজের কার্য্যসমূহ সম্পাদনের এবং উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে প্রয়োজনীয় বৈধতার ক্ষমতাভোগ করবে।

Article 105.

1. The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its Purposes.

2. Representatives of the Members of the United Nations and officials of the Organization shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Organization.

3. The General Assembly may make recommendations with a view to determining the details of the application of paragraphs 1 and 2 of this Article or may propose conventions to the Members of the United Nations for this purpose.

105 নম্বর ধারা।

1. নিজের উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ও দায়মুক্ততা ভোগ করবে।

2. সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ এবং রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারীবৃন্দ রাষ্ট্রসংঘের সাথে জড়িত তাঁদের কার্য্যসমূহের স্বাধীন সম্পাদনার জন্য প্রয়োজনীয় একই ধরণের সুবিধাদি ও দায়মুক্ততা ভোগ করবেন।

3. বর্তমান ধারার 1 নম্বর এবং 2 নম্বর অনুচ্ছেদের প্রয়োগসম্পর্কিত

খুঁটিনাটি নির্ধারণের জন্য সাধারণ সভা সুপারিশ করতে পারবে অথবা সেজন্য রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নিকট প্রয়োজনীয় রীতি গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারবে।

CHAPTER XVII

Transitional Security Arrangements

Article 106.

Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation Declaration signed at Moscow, October 30, 1943, and France, shall in accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with other Members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

সপ্তদশ অধ্যায়

সংক্রমণগত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

106 নম্বর ধারা।

43 নম্বর ধারায় উল্লিখিত বিশেষ চুক্তিসমূহ বলবৎ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের মতে 42 নম্বর ধারায় বর্ণিত দায়িত্বাবলী পালনের কাজ আরম্ভ করায় নিরাপত্তা পরিষদকে সক্ষম করতে 1943 খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 30 তারিখে মস্কোতে স্বাক্ষরিত চতুঃশক্তি ঘোষণার অংশীদার দেশসমূহ এবং ফ্রান্স ঐ ঘোষণার 5 নম্বর অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে নিজেদের মধ্যে এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সাথে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার্থে রাষ্ট্রসংঘের হয়ে যৌথ পদক্ষেপ, অবলম্বনকল্পে আলোচনা করবে।

Article 107.

Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.

107 নম্বর ধারা।

বর্তমান চার্টারে স্বাক্ষরকারী কোন সদস্যরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রু ছিল এমন কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের জন্য দায়ী সরকার-কর্তৃক ঐ যুদ্ধের ফলে গৃহীত অথবা অনুমোদিত কোন পদক্ষেপ বর্তমান চার্টারের কোন কিছু বলে অবৈধ অথবা নিবারিত হবেনা।

CHAPTER XVIII

Amendments

Article 108.

Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two-thirds of the members of the General Assembly and ratified in accordance with their respective constitutional processes by two-thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.

অষ্টাদশ অধ্যায়

সংশোধন

108 নম্বর ধারা।

সাধারণ সভার সদস্যরাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত হলে এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহসহ রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্র-সমূহের দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রকর্তৃক তাদের নিজ নিজ সাংবিধানিক পন্থায় অনুসমর্থিত হলে বর্তমান চার্টারের সংশোধনসমূহ রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে বলবৎ হবে।

Article 109.

1. A General Conference of the Members of the United Nations for the purpose of reviewing the present Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members of the Security Council. Each Member of the United Nations shall have one vote in the conference.

2. Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two-thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council.

3. If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members of the Security Council.

109 নম্বর ধারা।

1. বর্তমান চার্টারের পর্য্যালোচনার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের একটা সাধারণ সম্মেলন সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যরাষ্ট্রের ভোট দ্বারা এবং নিরাপত্তা পরিষদের যেকোন নয়টি সদস্যরাষ্ট্রের ভোট দ্বারা নিরূপিত সময়ে এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারবে। ঐ সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকবে।

2. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহসহ রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রকর্তৃক তাদের নিজ নিজ সাংবিধানিক পন্থায় অনুসমর্থিত হলে সম্মেলনের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সুপারিশকৃত বর্তমান চার্টারের পরিবর্তন বলবৎ হবে।

3. বর্তমান চার্টার বলবৎ হওয়ার পর সাধারণ সভার দশম অধিবেশনের পূর্বে যদি এধরণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকে, তবে এধরণের সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব সাধারণ সভার ঐ অধিবেশনের কর্মসূচীতে

রাখা হবে এবং সাধারণ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাষ্ট্রসমূহের ভোটে এবং নিরাপত্তা পরিষদের যেকোন নয়টি সদস্যরাষ্ট্রের ভোটে সিদ্ধান্তক্রমে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

CHAPTER XIX

Ratification and Signature

Article 110.

1. The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

2. The ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the Organization when he has been appointed.

3. The present Charter shall come into force upon the deposit of ratifications by the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, and by a majority of the other signatory states. A protocol of the ratifications deposited shall thereupon be drawn up by the Government of the United States of America which shall communicate copies thereof to all the Signatory States.

4. The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will become original Members of the United Nations on the date of deposit of their respective ratifications.

উনবিংশ অধ্যায়
অনুসমর্থন এবং স্বাক্ষর

110 নম্বর ধারা।

1. স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহকর্তৃক তাদের নিজ নিজ সাংবিধানিক পন্থায় বর্তমান চার্টার অনুসমর্থিত হবে।

2. অনুসমর্থনসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নিকট জমা দেওয়া হবে এবং সেই সরকার স্বাক্ষরকারী সমস্ত রাষ্ট্রকে এবং নিয়োজিত হওয়ার পর রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে প্রত্যেকটি অনুসমর্থন জমা দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দেবে।

3. প্রজাতান্ত্রিক চীন, ফ্রান্স, সংযুক্ত সোভিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুসমর্থনসমূহ জমা হলে বর্তমান চার্টার বলবৎ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার জমা দেওয়া অনুসমর্থনসমূহের একটা খসড়া প্রস্তুত করবে এবং ঐ সরকার অনুসমর্থন-সমূহের খসড়ার নকল সমস্ত স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের কাছে পাঠাবে।

4. বর্তমান চার্টার বলবৎ হওয়ার পর তাতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ অনুসমর্থন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে রাষ্ট্রসংঘের আদি সদস্যরাষ্ট্র হবে।

Article 111.

The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory states.

IN FAITH WHEREOF the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter.

DONE at the city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred and forty five.

111 নম্বর ধারা।

বর্তমান চার্টার চৈনিক, ফরাসী, রুশীয়, ইংরাজী, এবং স্পেনীয় ভাষায় যার মূলপাঠ সমান প্রামাণিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মহাফেজখানায় জমা থাকবে। যথার্থভাবে প্রস্তুত করা এর প্রামাণ্য নকল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অন্যান্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের সরকারসমূহের নিকট প্রেরণ করবে।

সেই বিশ্বাসে বর্তমান চার্টারে, যা' সান্‌ফ্রান্সিসকো শহরে এক হাজার নয়শত পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ছাব্বিশতম দিবসে করা হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সরকারসমূহের প্রতিনিধিবর্গ স্বাক্ষরদান করেছেন।

অতিরিক্ত সংযোজন

পরিভাষা

Action—পদক্ষেপ।

Acts of Aggression—আগ্রাসী কার্য্যকলাপ।

Ad hoc Committee—অস্থায়ী সমিতি।

Administering Authority—প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ।

Administrative Council—প্রশাসনিক পরিষদ।

Administrative Committee on Coordination — প্রশাসনিক সমন্বয় সমিতি।

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions—প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত প্রশ্নে উপদেষ্টা সমিতি।

Advisory Opinion—উপদেশমূলক অভিমত।

Aggression—আগ্রাসী যুদ্ধ।

Alliance—মোর্চা, জোট।

Allied Powers—মিত্রশক্তিবর্গ।

Amendment—সংশোধন।

Arab League—আরব জোট।

Arbitration—সালিশী।

Archive—মহাফেজখানা।

Arms Control—অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ।

Article—ধারা।

Board of Directors—পরিচালক-মণ্ডলী।

Bond—ঋণপত্র।

Breach of Peace—শান্তিভঙ্গ।

Brussles Treaty Organization—ব্রাসেল্‌স্ সংস্থা।

Bureau—দপ্তর।

Charter of the Nuremberg Tribunal—ন্যুরেমবার্গ বিচার-সভার আইন।

Chef de Cabinet—মহাসচিবের প্রধান সহায়ক।

Chemical and Biological warfare—রাসায়নিক ও জীবাণু যুদ্ধ।

Chief Administrative Officer—মুখ্য প্রশাসনিক কর্মচারী।

Civil Liberty—নাগরিক স্বাধীনতা।

Clause—উপধারা।

Cobdenism—কবডেনীয় মতবাদ।

Codification—লিপিবদ্ধকরণ।

Colonial Power—ঔপনিবেশিক শক্তি।

Collective Security—যৌথ নিরাপত্তা।

Commission for Conventional Armaments—গতানুগতিক অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কিত কমিশন।

Commission on Narcotic Drugs—মাদক ঔষধাদি সংক্রান্ত কমিশন।

Committee on Information from Non-self-governing Territories — স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চল সম্পর্কিত তথ্যাদি সংক্রান্ত সমিতি।

Committee on Non-Governmental Organizations—বেসরকারী সংস্থাসংক্রান্ত সমিতি।

Concert—সমঝোতা।

Conciliation—অনুরঞ্জন।

Constitution—শাসনতন্ত্র, গঠনতন্ত্র।

Convention—সম্মেলন, মূল দলিল, রীতি।

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination — জাতিগত-কারণে সর্বপ্রকার ভেদনীতি দূরী-করণ সংক্রান্ত রীতি।

Corporate Capacity—যৌথ আইনানুগ ক্ষমতা।

Covenant—সনদ।

Credentials Committee—পরিচয়-পত্র সংক্রান্ত সমিতি।

Decisions on Procedural Matters — প্রণালীগত প্রশ্ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত।

Declaration Concerning Peaceful Co-existence—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত ঘোষণা।

Delegate—প্রতিনিধি।

Delegation—প্রতিনিধিদল, ক্ষমতা হস্তান্তর।

Director General—মুখ্য পরি-চালক।

Disarmament Commission—নিরস্ত্রীকরণ কমিশন।

Domestic Jurisdiction—আভ্যন্ত-রীণ এক্তিয়ার।

Drug Supervisory Board—ঔষধাদি পর্য্যবেক্ষণ সংস্থা।

Economic and Social Council (ECOSOC)—সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পরিষদ।

Enforcement Measure—শাস্তি-বলবৎমূলক ব্যবস্থা।

Enquiry—অনুসন্ধান।

Executive Assistant to the Secretary General—মহা-সচিবের প্রশাসনিক সহকারী।

Executive Board—প্রশাসন পর্ষদ্।

Executive Director—প্রশাসনিক অধিকার।

Executive and Liaison Committee—প্রশাসনিক ও যোগা-যোগকারী সমিতি।

Food and Agricultural Organization—খাদ্য ও কৃষি সংস্থা।
Functional International Organization—অরাজনৈতিক এবং কার্য্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা।

General Assembly—সাধারণ সভা।
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)—শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি।
General Committee—সাধারণ সমিতি।
General Debate—সার্বজনীন বিতর্ক।
General Postal Union—সাধারণ ডাক সংস্থা।
Genocide Convention—জাতি বা সম্প্রদায়ের বিলোপসাধন নিবারণ সম্পর্কিত রীতি।
Good Offices Commission—মধ্যস্থতা কমিশন।
Governing Body—কর্ম্মপরিষদ।
Governor—পরিচালক।
Grand Jury—পূর্ণাঙ্গ নির্ণায়ক-সভা।
Great Power—বৃহৎশক্তি।

Headquarters Agreement—সদর-দপ্তর সংক্রান্ত চুক্তি।
Human Rights — মানবিক অধিকার।

Immunity—দায়মুক্ততা।
Industrial Development Board (IDB)—শিল্পোন্নয়ন পর্ষদ্।
Inherent Right of Individual or Collective Self-Defence—একক বা যৌথ আত্মরক্ষার সহজাত অধিকার।
Inter-Agency Consultation Board—আন্ত: সংস্থা আলোচনা পর্ষদ্।
Interim Committee—অন্তর্বর্তীকালীন সমিতি।
Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (I. M. C. O.) — বাণিজ্যজাহাজ চলাচল সংক্রান্ত আন্ত: সরকারী আলোচনা সংস্থা।
International Bank for Reconstruction and Development (I.B.R.D.)—আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক।
International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.)—আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা।
International Court of Justice (I. C. J.)—আন্তর্জাতিক বিচারালয়।
International Development Association (I.D.A.)—আন্তর্জাতিক উন্নয়ণ সংস্থা।
International Finance Corpo-

ration (I. F. C.)—আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠান।

International Labour Organization (I.L.O.)—আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন।

International Law Commission (I. L. C.)—আন্তর্জাতিক আইন কমিশন।

International Meteorological Organization (I. M. O.)—আন্তর্জাতিক আবহাওয়া পূর্বাভাষ সংস্থা।

International Monetary Fund (I. M. F.)—আন্তর্জাতিক অর্থ-কোষ।

International Narcotics Board—আন্তর্জাতিক মাদক ঔষধাদি নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ্।

International Peace and Security—আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা।

Jnternational Postal Congress—আন্তর্জাতিক ডাক সম্মেলন।

International Telecommunication Union (I. T. U.)—আন্তর্জাতিক তার ও বেতার যোগাযোগ সংস্থা।

International Telegraph Union (I. T. U.)—আন্তর্জাতিক তার-বার্তা সংস্থা।

International Trusteeship System—আন্তর্জাতিক অছিব্যবস্থা।

Intervention—হস্তক্ষেপ।

Investigation—তদন্ত।

Judicial Settlement—বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণ।

League Assembly—লীগ সভা।

League Council—লীগ পরিষদ।

League of Nations—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

Managing Director—ব্যবস্থাপক পরিচালক।

Mandate Commission—ম্যাণ্ডেট কমিশন।

Mandatory Power—ম্যাণ্ডেটধারী রাষ্ট্র।

Mediation—মধ্যস্থতা।

Military Stuff Committee—সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী।

Mutual Guarantee—পারস্পরিক অঙ্গীকার।

NATO—আটলাণ্টিক চুক্তি।

Nuclear Non-Proliferation Treaty—আণবিক অস্ত্রের প্রসার নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তি।

Nuclear Test Ban Treaty—আণবিক অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধ-করণ সম্পর্কিত চুক্তি।

Obligation—দায়।

Observation Group—পরিদর্শক-মণ্ডলী।

Optional Clause—ঐচ্ছিক ধারা।

ONUC—রাষ্ট্রসংঘের কঙ্গোবাহিনী।

Organization of American States (O.A.S.)—আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা।

Overlap—অধিক্রমণ।

Pacific Settlement of International Disputes—আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি।

Pact—চুক্তি।

Palestine Conciliation Commission—প্যালেস্টাইন অনুরঞ্জন কমিশন।

Parliamentary Clerk—সংসদীয় করণিক।

Peace Observation Commission—শান্তি পরিদর্শন কমিশন।

Peace Keeping Committee—শান্তিরক্ষা সমিতি।

Peace Loving—শান্তিপ্রিয়।

Periodic—পর্য্যাবৃত্ত।

Permanent Court of International Justice (P. C. I. J.)—স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়।

Permanent Central Narcotics Board—মাদকদ্রব্যাদি সংক্রান্ত স্থায়ী কেন্দ্রীয় পর্ষদ্।

Plenipotentiary Conference—মন্ত্রীপর্য্যায়ের সম্মেলন।

Preparatory Commission—প্রস্তুতি কমিশন।

Preventive Measure—শান্তিভঙ্গ নিবারণমূলক ব্যবস্থা।

Principal Organ—মুখ্য অংগ।

Principle of Sovereign Equality—সার্বভৌমত্বগত সাম্যের নীতি।

Protectionism—সংরক্ষণ নীতি।

Provision—বিধান।

Questionnaire—প্রশ্নমালা।

Ratification—অনুসমর্থন।

Recommendation—সুপারিশ।

Regional Arrangement—আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা।

Report—প্রতিবেদন।

Right of Self-Determination—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation—আণবিক বিচ্ছুরণের ফলাফল অনুসন্ধান নিমিত্ত বিজ্ঞানী সমিতি।

Seat of the Organization—রাষ্ট্রসংঘের অধিষ্ঠানক্ষেত্র।

Secretary General—মহাসচিব।

Secretariat—সচিবালয়।

Security Council—নিরাপত্তা পরিষদ।

Session—অধিবেশন।
Specialized Agency—বিশেষজ্ঞ সংস্থা।
Solution by Negotiation—আলোচানাভিত্তিক চুক্তি।
Standing Committee—স্থায়ী সমিতি।
Statistical Commission—পরিসংখ্যান কমিশন।
Statute of the International Court of Justice—আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিধি।
Stenographer—লঘুলিপিক।
Strategic Area—সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।
Strategic Arms Limitation Talks (S. A. L. T.)—আক্রমণাত্মক অস্ত্রাদি সীমিতকরণ সম্পর্কিত আলোচনা।
Subsidiary Organ—অনুপূরক অংগ।

Technical Assistance Programme—কারিগরী সাহায্য প্রকল্প।
Term—শর্ত।
Territorial Integrity—ভূখণ্ডগত সংহতি।
Threat to Peace—শান্তির প্রতি হুমকী।
Trade and Development Board—বাণিজ্য ও উন্নয়ন পর্ষদ্।
Treaty—চুক্তি, সন্ধি।
Treasury—অর্থমন্ত্রক।
Truce Supervision Organization in Palestine—প্যালেস্টাইনের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ সংস্থা।
Trusteeship Agreement—অছি-চুক্তি।
Trusteeship Council—অছি পরিষদ।
Trust Territory—অছিভুক্ত অঞ্চল।

Understanding—বোঝাপড়া, সমঝোতা।
Under Secretary for Political and Security Council Affairs—রাজনৈতিক ও পরিষদ বিষয়ক অধস্তন সচিব।
United Nations—রাষ্ট্রসংঘ।
U. N. Charter—রাষ্ট্রসংঘের চার্টার।
U. N. Conference for Trade and Development (U.N.C.-T.A.D.)—বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ সম্মেলন।
United Nations Conference on International Organization (U.N.C.I.O.)—সম্মিলিত জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন সংক্রান্ত সম্মেলন।
United Nations Educational Scientific and Cultural

Organization (U. N. E. S.-C. O.)—রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা-নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা।

United Nations Childrens' Emergency Fund (U. N.-C. E. F)—রাষ্ট্রসংঘের শিশু সংস্থা।

United Nations Emergeney Force (U. N. E. F.)—রাষ্ট্র-সংঘের জরুরী বাহিনী।

U. N. F. I. C. Y. P.—রাষ্ট্রসংঘের সাইপ্রাস পরিদর্শন বাহিনী।

United Nations Industrial Development Organization (U. N. I. D. O.)—রাষ্ট্রসংঘের শিল্পোন্নয়ন সংস্থা।

Universal Postal Union (U.P.U.)—বিশ্বডাক যোগাযোগ সংস্থা।

Uniting for Peace Resolution—শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব (অ্যাচিসন প্রস্তাব)।

Veto—ভেটো, ভেটো ক্ষমতা।

Vote—ভোট।

Welfare Functionalism—কল্যাণ-মূলক আন্তর্জাতিকতাবাদ।

World Bank—বিশ্বব্যাঙ্ক।

World Community—বিশ্বগোষ্ঠী।

World Food Programme—বিশ্ব-খাদ্য সূচী।

World Health Organization (W.H.O.)—বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা।

World Meteorological Organization (W.M.O.)—বিশ্ব আবহাওয়া পূর্বাভাষ সংস্থা।

World Organization—বিশ্ব-সংস্থা।

Yalta Formula—ইয়াল্টা সূত্র।

অনুক্রমণিকা

সংশোধনী

পৃষ্ঠা 4	পঙ্ক্তি 4	'ডিইউ' এর পরিবর্তে ডিউয়ি
,, 12	,, 20	'মেস্কিকো' এর পরিবর্তে মেক্সিকো
,, 15	,, 7	এধরণের অর্থ নিয়ে....
,, 31	,, 24	দুই বিশ্বযুদ্ধের....
,, 73	,, 23	'পূর্ণব্যবস্তার' পরিবর্তে পুণর্ববস্থা
,, 78	,, 4	'মাপকাটির' পরিবর্তে মাপকাঠি
,, 84	,, 29	'রোঙেশিয়ার' পরিবর্তে রোডেশিয়া
,, 86	,, 21	'সচিবের' পরিবর্ত মহাসচিব
,, 123	,, 24	'1345 খৃষ্টাব্দের বৎসরগুলির' পরিবর্তে 1945 খৃষ্টাব্দের পরবর্তী বৎসরগুলি....
,, 132	,, 17	'নিরবিচ্ছিন্ন' এর পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্ন
,, 135	,, 28	'দিয়ে' এর পরিবর্তে নিয়ে
,, 142	,, 30	'নিরবিচ্ছিন্ন' এর পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্ন
,, 143	,, 19	'নিরবিচ্ছিন্ন' এর পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্ন
,, 147	,, 22	'চক্তি' এর পরিবর্তে চুক্তি
,, 190	,, 8	'ইসরাইল' এর পরিবর্তে ইজরায়েল